সংস্কৃতির ধর্ম : ধর্ম ও সংস্কৃতি

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

: পরিবেষক

পুস্তক বিপণি

২৭ বেনিয়াটোলা লেন । কলিকাতা ৭০০০০৯ .

প্রথম প্রকাশ :
১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪

প্রকাশক :

রুপো মিত্র
'সাহিত্য প্রকাশ'
৬০ জেমস লং সরণি
কলকাতা ৭০০ ০৩৪

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক :
শ্যামলকুমার সাউ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন ●

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্তের আজ পঁচাশিতম জন্মদিন। এই উপলক্ষে তাঁর একটি নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। বহু বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা নন্দগোপালবাবুর বেশ কিছুসংখ্যক মননশীল প্রবন্ধ এবং অন্যান্য ধরনের রচনা গ্রন্থাকারে এখনও সংকলিত হবার অপেক্ষায় রয়েছে। ১৯৮৮ সালে তাঁর জীবনাবসানের পর থেকেই এইসব লেখাগুলি থেকে নির্বাচন করে কয়েকটি গ্রন্থপ্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও, নানা কারণে এতদিন সেটা করে ওঠা যায়নি। তার মধ্যে আপাতত এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে সেই ত্রুটিরই সামান্য নিরসন করা সম্ভব হল।

নন্দগোপালবাবু নিজেই যে-কটি বইয়ের পরিকল্পনা করে গিয়েছিলেন, এটি তারই অন্যতম। তাঁর রবীন্দ্র-পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত বই 'বস্তুবাদীর ভারত-জিজ্ঞাসা'-র মধ্যে কিছু-কিছু বক্তব্য সূত্রাকারে উল্লিখিত হয়েছে, নন্দগোপালবাবু তার মধ্যেই কতকগুলিকে বেছে নিয়ে বিস্তৃত যেসব বিশ্লেষণ করেছিলেন—এই বইয়ের মধ্যে সেগুলিই সংকলিত আছে। সেদিক থেকে দেখলে, এটিকে 'বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা'-রই পরবর্তী পর্যায় হিসাবে গণ্য করা যায়। সংস্কৃতির মূল তত্ত্বগুলি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গেই বিভিন্ন ধর্মমত এবং সংস্কৃতিবিকাশের ধারায় তাদের অভিঘাত কতখানি, তা নিয়েও এর মধ্যে অভিনিবিষ্ট বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পরে নন্দগোপালবাবুর বস্তুবাদী চিন্তার আর একটি ফসল পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা তৃপ্তিবোধ করছি।

এই গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে আমরা নন্দবাবুর সুযোগ্য পুত্র ড. পল্লব সেনগুপ্ত এবং পুত্রপ্রতিম ড. সনৎকুমার মিত্রর কাছে নানাভাবে কৃতজ্ঞ।

: আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের আরো কিছু বই :

● গ্রন্থ-বিষয় ●

॥ সংস্কৃতির দিক্‌বলয় ॥

॥ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত এবং ভগবদ্‌গীতা : সংস্কৃতিতত্ত্বের মূল্যায়ন ॥

॥ বুদ্ধ-কনফুসিয়াস-লাউৎজে-যীশু এবং মহম্মদ : সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসুর চোখে ॥

॥ সংস্কৃতির দিক্‌বলয় ॥

।। এক ।। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও আনুষঙ্গিক

সংস্কৃতি কথাটা যত বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, সংস্কৃতি বস্তুটাকে তত পরিষ্কার করে সবাই হৃদয়ঙ্গম করেন কিনা সন্দেহ। সাধারণত দেখি নৃত্য, গীত ও নাট্যাভিনয় ইত্যাদিকেই সংস্কৃতি বলে ধরা হয়। তাই সভাসমিতিতে আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাদি হবার পর অনেক সময় উদ্যোক্তারা বলেন, এবার আমরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুরু করছি। তারপরেই হয় গান বাজনা ও নৃত্য আরম্ভ, নয় নাটক মঞ্চস্থ। এ থেকেই অনেকের ধারণা হতে পারে যে, এই শেষোক্ত ব্যাপারগুলোই বুঝি সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত। বলাই বাহুল্য নৃত্য গীত ও অভিনয় সংস্কৃতিরাজ্যেরই জিনিষ। কিন্তু শুধু এরাই সংস্কৃতি নয়। সাহিত্য, চিত্রকলা, দর্শন, ধর্মপ্রত্যয়, অঙ্গসজ্জা, গৃহসজ্জা, আহারপ্রণালী, এক কথায় জীবনের যা কিছু প্রকাশ সবই সংস্কৃতি পদবাচ্য। অর্থাৎ সংস্কৃতির সংজ্ঞাটা ব্যাপক।

কাজেই সংস্কৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝব? কি সে কথা, তা বলার জন্যেই এই লেখার অবতারণা। কিন্তু তার আগে বলে রাখি যে সংস্কৃতির প্রতিশব্দ রূপে কৃষ্টি শব্দটা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা ধিকৃত, হলেও, আসলে কিন্তু ব্যঞ্জনাগত অর্থে দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কৃষ্টি হল কৃষ্ ধাতুনিষ্পন্ন একটি শব্দ এবং কর্ষণা বা চাষকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে ওর একটি রূপকার্থ তৈরি হয়েছে, যা হল চিত্তভূমি বা চিন্তাক্ষেত্রে আবাদ করে ভাব ও কল্পনার ফসল ফলানোর দ্যোতক। তাহলেই দাঁড়াল যে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলাকারুর রাজ্যে যা কিছু সৃষ্টি করে তাই হল তার কৃষ্টি। এবং এই সৃষ্টির কাজে অধ্যয়ন, অনুশীলন ও চিন্তন দরকার হয় বলেই, সংস্কৃতিকেও কৃষি-কার্যের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে পুরানো সমাজে। অর্থাৎ কালচার ও এগ্রিকালচার আদিতে একই উৎস থেকে উঠে পরে আলাদা হয়ে গেছে। এখানে কথা উঠতে পারে, তাহলে সভ্যতা বস্তুটা কি? সংক্ষেপে বলছি। আমরা জানি যাযাবর আরণ্যক মানুষ প্রথম যখন গোষ্ঠবদ্ধ হয়ে এক একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বাস ও চাষ সুরু করে, তখনই জন্মায় তার মনে সম্পর্ক আর সম্পত্তির বোধ এবং এই দুই বোধের প্রেরণা থেকেই তৈরি হয় তার সমাজ, যার স্থিতি ও সংহতির জন্যে গড়ে ওঠে নগর, বন্দর, দুর্গ,

পথঘাট, আত্মপ্রকাশ করে শাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষাদীক্ষা। দীর্ঘ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে অনেক ভুল ভ্রান্তির সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি করে ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে প্রকাশমান হয়েছে জিনিষগুলো, আর এতেও সন্দেহ নেই যে তা হয়েছে মানুষের সহজাত মনন শক্তির প্রেরণাতেই। তবু এই রূপান্তরের শিকড় যে সেই আদিম চাষের জমিতেই নিবদ্ধ ছিল, এ বোঝা যায়। অর্থাৎ এগ্রিকালচারই যে সভ্যতার গোড়ার ভিত্তি, এটা মানতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কালচারও কি তাই? তাও কি লাঙলের কাল থেকেই উঠেছে?

এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে সভ্যতা কি করে জন্মাল, তা আর একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। আদিকালের মানুষ যখন চার হাত পায়ে চলা ছেড়ে ক্রমে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, তখনই মস্তিষ্কের বিস্তার হয়ে তার মধ্যে হয় বুদ্ধির বিকাশ, আর হাত দুটো চলার ঝকমারি থেকে মুক্ত হয়ে অর্জন করে ধরা, ছোঁড়া ও ভাঙাগড়ার সামর্থ্য। এই মাথার বুদ্ধি ও হাতের শক্তি একত্র হয়েই করে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন। প্রকৃতির কাছে আদি মানুষ যেখানেই বাধা পেয়েছে, সেখানেই বুদ্ধি-প্রয়োগ করে সে করেছে তার থেকে ত্রাণের উপায় আবিষ্কার এবং আপন অপূর্ণতা পূরণের জন্যে করেছে রকমারি উপকরণ তৈরি। ঘর গড়তে, অস্ত্রশস্ত্র বানাতে, পোষাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্য-পানীয় আহরণ করতে পদে পদে সহায়তা করে এই দুটি শক্তিই জান্তবতা থেকে উন্নীত করে মানুষকে নিয়ে এসেছে সভ্যতার স্তরে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে সভ্যতা বলতে বোঝায় আদি মানুষের অসহায়তা থেকে উপায় ও উপকরণে সমৃদ্ধ আধুনিকতার পথে এগিয়ে আসার সোপান-পরম্পরা।

কিন্তু সংস্কৃতি জন্মাল কি করে? কি করে, আন্দাজ করা যাক: আরণ্যক জীবনেই মানুষ দেখেছে পাখী গান করে, ময়ূর ও হরিণ অঙ্গভঙ্গী করে নাচে, সকালে সন্ধ্যায় আকাশে রঙ বদলায়, গাছপালা এক এক ঋতুতে ধরে এক এক চেহারা। এ দেখেই আপন গলার আওয়াজকে সুরে সমৃদ্ধ করে গান সৃষ্টি করেছে সে। আপন দেহকে ছন্দায়িত করে করেছে বিচিত্র নৃত্যভঙ্গী উদ্ভাবন। পাহাড়ের গায়ে, কাঠের পাটায়, হাড়ের ওপর রকমারি দৃশ্য ও মূর্তি এঁকেছে, তাতে রঙ ফলিয়েছে। ক্রমে তার মধ্যে জেগেছে গভীরতর চেতনা, জেগেছে আপন ভাষাকে অর্থবহ শব্দে গ্রথিত করার কৌশল। সে ভেবেছে, জগৎটা কেমন করে হল, জীবনটা কি, কোন শক্তি এ দুইকে চালাচ্ছে, প্রকৃতির সঙ্গে কি সম্পর্ক এই জীবনের, জীবন যেখানে শেষ হয় সেখানেই কি সব শেষ, আগের মানুষরা কোথায় যায়···নানা ভাবনা উঠেছে তার মনে। এ সব থেকেই তৈরি হয়েছে ঈশ্বর, আত্মা, মোক্ষ এবং পাপপুণ্য-সংক্রান্ত রকমারি প্রত্যয়। এই সব প্রত্যয়কে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস থেকে তৈরি হয়েছে সাহিত্য ইতিহাস দর্শন। প্রত্যয়কে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে পরের ধাপে জন্মেছে বিজ্ঞান। এই হল সংস্কৃতির উৎপত্তি ও অভিব্যক্তির

গোড়ার ধাপের কয়েকটা কথা।

অর্থাৎ মানুষের জীবন-সরোবরে একই ডাঁটায় দুটি পদ্ম ফুটেছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ; এবং দুইয়েরই উদ্ভবের মূলে আছে প্রকাণ্ড একটা তাগিদ। মানুষ খাওয়া পরা, বাঁচা, বংশবৃদ্ধি করা ও নিরাপদে থাকার তাগিদে করেছে সভ্যতার সৃষ্টি, যার মূল মন্ত্র হল গতি আর উৎপাদন। আর নিজের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা ও আবেগকে প্রকাশ করার তাগিদে গড়েছে সংস্কৃতি, যার লক্ষ্য হল অলঙ্করণ এবং চিন্তা ও আনন্দ পরিবেষণ। এর একটা অন্যটাকে ছুঁয়ে আছে ঠিকই, তবু দুটো হুবহু এক জিনিষ নয়। সভ্যতার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে আমাদের জৈব অস্তিত্বের হাজারো রকম চাহিদা ও প্রয়োজন। সংস্কৃতি ব্যক্ত করে আমাদের ভেতরকার ভাবময় সত্তাটি। তাই একটা হল স্থূল, অন্যটার আছে উজ্জ্বল আশ্চর্য একটি দিব্য রূপও।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে মানুষ ঘরবাড়ী করে থাকার জন্যে, পোষাক পরিচ্ছদ বানায় পরার জন্যে কিন্তু ঘরের দেওয়ালে চিত্রকর্ম করে বা বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান করে কি জন্যে? নিশ্চয় কোন জৈব প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নয়। শেষোক্ত জিনিষগুলোর মধ্যে দিয়ে ফোটে তার রুচি, সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পজ্ঞান। লজ্জা নিবারণ করা ও শীতগ্রীষ্ম 'প্রতিরোধই অবশ্য পরিচ্ছদের প্রাথমিক লক্ষ্য, কিন্তু কিন্তু পোষাকের পারিপাট্যে প্রকাশ পায় ঐ একই সৌন্দর্য দৃষ্টি ও শিল্পরুচি। এমনি হল সব জিনিষই। অর্থাৎ বাস্তব প্রয়োজন এবং অন্তর্নিহিত রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান, তার মানে সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পর হাত ধরাধরি করেই চলেছে চিরদিন এবং এ দুইয়ের মিলিত অভিব্যক্তিই হল মানুষের ইতিহাস। এই কারণেই একটাকে অনেক সময় অন্যটা থেকে পৃথক করে দেখতে পারি না আমরা। কিন্তু দেখা দরকার। যে শক্তিতে মানুষ নগর বন্দর যানবাহন ও যন্ত্রপাতি করেছে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অঙ্কিত করেছে আপন সামর্থ্যের স্বাক্ষর, আবার যে শক্তিতে জীবনের জটিল রহস্য গ্রন্থি উন্মোচন করেছে, প্রকৃতির গোপন ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের রুদ্ধ দুয়ার খুলেছে, জড়ের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ নির্ণয় করেছে, এ দুইয়ের পিছনে থেকে কোন প্রেরণা কাজ করে চলেছে, তা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। এ-দুই কি দুটি পৃথক শক্তি, না একই শক্তির স্বতন্ত্র দুটি বিভাগ? বলা প্রয়োজন যে এ-প্রশ্নের সমাধান খুব সহজ নয়। একটা সেতু বা একখানি মহাকাশযান যে ধরণের জিনিষ, একটা কবিতা বা একখানি ছবি অবশ্যই সে ধরণের জিনিষ নয়। কিন্তু যে মন এ-দুই পর্যায়ের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান হচ্ছে, তা ত একই। সুতরাং ঐ *dichotomy* বা একই উৎসের দুরোখা কলার সিদ্ধান্তটাই খাঁটি বলে নেওয়া ভাল। অন্তত তাতে উপলব্ধি সহজ হবে।

অসভ্য আরণ্যক মানুষ ঘরবাড়ী করেছে, সেতু বানিয়েছে, গাড়ী নৌকা গড়েছে, চাষ করেছে, তাঁত বুনেছে, জীবজন্তু পুষেছে…এইভাবেই এক পা এক পা করে সে সভ্যতার পথে হয়েছে অগ্রসর। আবার ঐ অসভ্য মানুষই নেচেছে, গান গেয়েছে,

ছবি এঁকেছে, ছড়া বেঁধেছে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও পত্তন করেছে আস্তে আস্তে। প্রথমটার উদ্দীপনা জুগিয়েছে তার দৈহিক অস্তিত্বের রকমারি চাহিদা। দ্বিতীয়টার উদ্দীপনা এসেছে তার ভেতর থেকে। তার গুহাশ্রিত অনুভূতি, কল্পনা ও ভাবাবেগগুলো আপনা-আপনিই প্রকাশের পথ করে নিয়েছে। আদিম সমাজে এ-দুই ধারার প্রকাশকে তফাৎ করে দেখা হত না। তাই ফসল কাটা হক, ঘর বানান হক, বিয়ে হক, পূজা ও পশুবলি হক, সব ব্যাপারেই তাদের ছিল নৃত্যগীত, ছিল আলপনা ও চিত্রকর্ম। অনেক সময় একই লোক দুই-তিন বিভাগে হাত লাগাত। চাষীই হত বাজিয়ে, কারিগরই হত গায়ক, পুরোহিতই হত চিত্রকর। সভ্যতার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমবিভাগ যেমন এসেছে, তেমনি এসেছে কর্ম অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগও।

আজ দার্শনিক, কবি, চিত্রকর. গায়ক, নর্তক, সবাই নিজ নিজ কৃতি অনুযায়ী এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বৃত্তিধারী। যেমন চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার বা শিক্ষকও এক একটি সুচিহ্নিত শ্রেণী। একই মানুষের মধ্যে আজো একাধিক বৃত্তির যোগ্যতা অবশ্যই থাকতে পারে এবং অনেক সময় থাকেও। তবু বর্গীকরণের ক্ষেত্রে আমরা মানুষকে চিনি তার প্রধান বৃত্তিটি ধরেই। এর কারণ বাস্তব কর্মক্ষেত্র আর সাংস্কৃতিক কর্মক্ষেত্রকে আজ আমরা আলাদা করে নিয়েছি। কবির জগৎ আর কারিগরের জগৎ, চিকিৎসকের কর্মক্ষেত্র আর শিক্ষাব্রতীর কর্মক্ষেত্র আজ মোটেই এক নয়। দুইয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম একটা আত্মিক সম্পর্ক কোথাও থাকলেও থাকতে পারে হয়ত, কিন্তু বোধ ও বৃত্তির বিবর্তনে আজ এরা ভিন্ন ভিন্ন মেরুতেই এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমাদের মনের মধ্যে জেগে রয়েছে সেই সাবেকী আমলের মিশ্র ধারণা, যখন পুরোহিতই শিক্ষক এবং চিকিৎসক ছিল, স্থপতি বা কারিগরই ছিল গায়ক, বাজিয়ে কিবা চিত্রকর। এর ফলেই সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের মনের মুল্লুকে আজো অনেকটা হরগৌরীর আদর্শের মত একে অন্য থেকে অচ্ছেদ্য হয়েই রয়েছে।

কিন্তু সে যাই হক সভ্যতা না সংস্কৃতি, কোনটা মানুষকে বড় করেছে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক প্রকাশ হয়েছে কোনটায়? মানুষ আজ মহাকাশে বিচরণ করছে, চাঁদে পদচিহ্ন এঁকে এসেছে, পরমাণুপুঞ্জের বিভাজন থেকে অসীম সম্ভাবনীয়তা-সম্পন্ন শক্তির উদ্বোধন ঘটাচ্ছে, জড় ও চেতনের মধ্যে করছে আত্মীয়তার সেতু-বন্ধন, জরা মৃত্যুকে চলেছে জয় করতে, চলেছে দেশ কালের দূরত্ব মুছে দিয়ে সর্বমানবিক একীকরণের পথ প্রশস্ত করতে ...এ ত সভ্যতারই দান। কিন্তু শুধুই কি সভ্যতার? আদিকালের অনগ্রসর কপিধর্মী মানুষের এই যে ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা, এই যে বৈচিত্র্য, বৈভব, ব্যাপ্তি ও সামর্থ্যের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা, এটা সম্ভব হয়েছে কি করে? সমান্তরালভাবে বস্তুবলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনন শক্তিও বিকশিত হয়েছে বলেই ত? মানুষ যদি শুধুই ক্ষমতার অধিকারী হত, শুধুই অজস্র উপায় ও

উপকরণ যদি আসত তার আয়ত্তে, তাহলে বড় হত কি মানুষ? মূল্য হত কি কিছু তার সভ্যতার? শ্রী ও স্বস্তি আসত কি তার কোন সংগঠনে?

না। সুরুচি, সৌন্দর্য-জ্ঞান, নৈতিক শুভবুদ্ধি, উচিতানুচিতের মূল্য নির্ণয়, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দায়িত্ববোধ···এগুলোই মানুষকে মহত্বে অভিষিক্ত করেছে। আত্মরক্ষা, বিঘ্ন নিরাকরণ, ও বংশবৃদ্ধির মত সহজাত জৈব প্রবণতা নয় এগুলো। আবার বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের তাড়নায় বিচারবুদ্ধি-সম্ভূত উদ্ভাবনও নয় এরা। এগুলো মানুষের ক্রমাস্ফুরিত উপলব্ধি এবং কাল বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই এরা এসে অধিকার করেছে মানুষের চিত্তবৃত্তিকে। আর এদের দ্যোতনাতেই মানুষ শিল্পী হয়েছে, হয়েছে কবি দার্শনিক লোকনেতা ও সংস্কারক। এ-দিকটা যদি না খুলত মানুষের, তাহলে মানুষ শত সহস্র আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের সঞ্চয় নিয়েও একটা উন্নত পর্যায়ের গোরিলা হত মাত্র! মানুষ হত না। এই মননশক্তির ঔজ্জ্বল্যই জন্তু থেকে মানুষের উদ্বর্তন ঘটিয়েছে। কথা উঠতে পারে, সভ্যতার স্তরবিন্যাসই তলা থেকে উস্কেছে মানুষের এই অন্তর্গূঢ় দ্বিতীয় সত্তাকে। সুতরাং সংস্কৃতি সভ্যতারই প্রতিফলিত দ্যুতি। এ-কথায় আপত্তি নেই, বলাই বাহুল্য।

তাহলেই দাঁড়াচ্ছে যে, সংস্কৃতির বীজ অঙ্কুরিত হয় মনন বা দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে। তাই বিচিত্ররূপে ফোটে কলাকারুর মধ্যে, ফোটে মানবিক সম্পর্ক নির্ধারণের মধ্যে, জগৎচেতনার মধ্যে, আবার ভালমন্দের মূল্য নির্ধারণের মধ্যেও। অর্থাৎ সভ্যতা হল মানুষের শক্তি, সংস্কৃতি তার ঐশ্বর্য, সভ্যতা তার জীবনে আনে প্রসার, সংস্কৃতি দেয় শ্রী। দুটোর সমমাত্রিক অভিব্যক্তি হলে তবেই তা থেকে হয় সুষমান্বিত সমাজের উদ্ভব। একদা সে জিনিষ হয়েছিল প্রাচীন মিশরে, ভারতবর্ষে, চীনে এবং গ্রীস, রোম ও আরব্য দুনিয়ায়। এই দেশগুলিতে মানুষ যেমন অত্যুন্নত সভ্যতার অধিকারী হয়েছিল, তেমনি আশ্চর্য সংস্কৃতির আলো বিচ্ছুরিত হয়েছিল তার মৃত্তিকা থেকে। আজো পৃথিবী মৌলিক বহু জ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার জন্যে ঋণী এই পুরানো দেশগুলির কাছে! দুর্ভাগ্য যে মধ্যযুগ থেকেই সভ্যতার অধিনেতারা রাজনীতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের তাঁবেদার করে ফেলেছেন সংস্কৃতিকে। আর তখন থেকেই মূল্য-বোধের ক্ষেত্রে দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে ভেদের গণ্ডিটা বিরাট থেকে বিরাটতর হতে সুরু করে।

ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ খ্রীষ্টীয় ঐসলামিক বিচিত্র পদবীর মূল্যবোধ বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন আশ্রয় করে হাওয়ায় ছড়াতে থাকে এবং একদিকে তা যেমন সাহিত্যে শিল্পে ও জীবন চর্যায় অনতিক্রম্য স্বাতন্ত্র্যের ছাপ আঁকতে সুরু করে, অন্যদিকে তেমনি মানব নীতির ক্ষেত্রেও তা বিভেদের খাড়া দেওয়াল তুলে মানুষকে তার সার্বভৌম একত্বের উত্তরাধিকারভ্রষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগে যায়। তার মানে সংস্কৃতির প্রাণধর্ম ভুলে মধ্যযুগে মানুষ সভ্যতার স্ফীতি নিয়েই গর্বিত হয়ে ওঠে। এই স্ফীতির দম্ভ ইউরোপে

ক্রুজেডের যুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে, ভারতে পেয়েছে ছবৌ উৎসাদনের ও নব্যহিন্দু পুনরভ্যুত্থানের নামে কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করের হিংস্র অভিযানে। এরপরে রেনেসাঁস ইউরোপকে যেমন গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতি-চেতনায় নূতন করে নাড়া দেয় তেমনি অস্ত্রবলে অনগ্রসর প্রাচ্য পৃথিবীতে সাম্রাজ্য গড়তেও উস্কানি দেয়। তার মানে সংস্কৃতি ও সভ্যতা চলে যায় পরস্পর-বিরোধী পথে। ভারতে, চীনে এবং আরব্য দুনিয়ায় এই দস্যুতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রাম হয়নি, এ সময় হয়েছে আত্মরক্ষার কূর্মবৃত্তি এবং ধর্ম আন্দোলনের মাধ্যমে গোঁড়ামির চর্চা করে মানুষ এখানেও করেছে সংস্কৃতির আকাশকে পর্যাপ্ত মূঢ়তা ও কুসংস্কারে আবিল।

মধ্যযুগের শেষ পর্বে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সম্মিলিত মূল্যবোধ থেকে নূতন জীবন-চেতনা তৈরি হত যদি ভারতবর্ষে, তাহলে অন্য রকম হয়ত হত এদেশের ইতিহাস। সেই নূতন জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব হয়েছিল এদেশে ইংরেজাধিকারের পরে। ইংরেজের এবং ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপের জীবন ও মননকে আত্মসাৎ করে ভারতবাসী কিছুটা নূতন ভাবে গড়ে ওঠে উনিশ শতকে, যার ফলে কোনদিন ছিল না এমন কতকগুলো নূতন চিন্তা, আদর্শ ও ভাব এদেশের মানসিকতায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। তা প্রবল শক্তিতে অনুরঞ্জিত করে আমাদের সামাজিক ধরন-ধারণকে, আবার আমাদের কলাকৃষ্টিকেও। এখানেই হয় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত রূপান্তর যা বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ মুসলিম···ভারত-ইতিহাসের সবকটি অধ্যায়েই যথাসম্ভব পারম্পর্য রক্ষা করে চলেছিল। কি সেই চিন্তা ও আদর্শগুলো? প্রথমত দেশপ্রেম, দ্বিতীয়ত নরনারীর অধিকারে সাম্য, তৃতীয়ত বিজ্ঞান ও বস্তুভিত্তিক জীবনচেতনা। এ তিনই ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজজ্ঞান ও আমাদের মানবতা-সম্পর্কীয় ধারণার মূল ভিত্তিকে সবেগে নাড়া দিয়েছে।

অদৃষ্ট, জন্মান্তর ও মোক্ষ এই ত্রিস্তম্ভে স্থাপিত ভারতীয় জীবনপ্রত্যয় প্রতীচ্যের বস্তুমুখিনতার আশ্রয়ে নিরীশ্বর ও নিরাত্ম বস্তুবাদে বিবর্তিত হতে থাকে বিশ শতকে, সেও এই আদি প্রেরণারই বিলম্বিত ক্রিয়া। কাজেই বিশুদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতি কি এবং কতটুকু তা বোধহয় আজ আর নির্ধারণের পথ নেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে, অতীতে ও বর্তমানে মেলামেশা হয়ে একটা যাহোক কিছু হয়ে উঠেছে জিনিযটা এবং তাই তার অভিব্যক্তির আকাশ আদিগন্ত প্রসারিত।

৷ দুই ৷ সংস্কৃতি ভাবনা : আরো প্রসঙ্গ

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যার উপলক্ষে আমরা দেখেছি মানুষের প্রাত্যহিক জৈব অস্তিত্বকে নির্বিঘ্ন, সমৃদ্ধ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্যতা। কৃষিকার্য, শিল্প বাণিজ্য, যানবাহন, নগরবিন্যাস, স্থাপত্য, কারুকর্ম, শিক্ষা, চিকিৎসা এক কথায় বৈষয়িক জীবনের জন্যে যা-কিছু অত্যাবশ্যক, তাই নিয়েই সভ্যতার সৃষ্টি। মানুষের লৌকিক বা ব্যবহারিক জীবনের গণ্ডিতেই তার স্থিতি ও পরিব্যাপ্তি। এক দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক দেশ ও জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় সমালোচনা করে যখন আমরা আপেক্ষিক ছোটত্ব ও বড়ত্ব নির্ধারণ করি, তখন এই ব্যবহারিক জীবনের সমুন্নতি ও বিস্তারের দিকটাই সর্বাগ্রে আকর্ষণ করে আমাদের মনোযোগ।

সংস্কৃতি এ থেকে স্বতন্ত্র জিনিষ। তা ব্যক্ত করে আমাদের জগৎ ও জীবন সম্পর্কীয় বোধকে। আমাদের কামনা, কল্পনা, আশা, আদর্শ ও অনুভূতি যা সৃষ্টি করে, তার সংহত রূপই সংস্কৃতি। সেটাই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, নৃত্যগীত, চিত্রকলা, এক কথায় বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যমূলক যা কিছু কাজ, তাই সংস্কৃতি। আবার জীবনপ্রত্যয়, সমাজ-চিন্তা, নীতিজ্ঞান, রুচিবোধ, সৎকৃত্য, অর্থাৎ যা কিছু মানবিক কর্মকাণ্ডের নিয়ামক, তাই সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতির স্থিতি ও পুষ্টি আমাদের ভাবজীবনে। তাহলে সংস্কৃতি কি সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এবং দুইয়ের মধ্যে দূরতম কোন সম্পর্কও নেই ? তা নয় মোটেই। সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুই ঘোড়া পাশাপাশি টেনে নিয়ে চলেছে মানব-প্রগতির রথ এবং একটি অন্যটিকে প্রভাবিতও করছে পদে পদেই। আর দুইয়ের সমমাত্রিক বিকাশকেই আমরা ধরি উন্নতির শীর্ষবিন্দু বলে।

একথা নিশ্চয় ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না যে আদিম আরণ্যক মানুষ যখন সম্পর্ক আর সম্পত্তি এই দুই বোধে অধিষ্ঠিত হয়ে জোটবদ্ধ হয়েছিল, তখনই জন্মেছিল সমাজ; এবং সমাজের সংহত শক্তিই একদিকে নূতন নূতন উপকরণের সম্পদে যেমন জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল, অন্যদিকে তেমনি সেই জীবনে ফুটিয়েছিল রকমারি সুষমাও। এর প্রথমটা সভ্যতা আর দ্বিতীয়টা সংস্কৃতি এবং একই সমাজের মাতৃগর্ভে জন্মেছিল দুটিতে। এর একটাকে বাদ

দিলে অন্যটা খঞ্জ। যদিও শেষ বিচারে সংস্কৃতির আসন সভ্যতার উপরে। কেন, বলছি।

অসীম বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির মধ্যেও যদি কোন জাতি সংস্কৃতিহীন হয়, তাহলে সে হয় বিবেকহীন দৈত্যের মত। দুনিয়ার পক্ষে সে হয় ত্রাস ও ধ্বংসের কারণ। কিন্তু বাঁচে না। সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির অধিকারী কোন জাতি যদি সভ্যতায় অপোক্ত হয়, তাহলে নখদন্তময় পৃথিবীতে সে পারে না হয়ত আত্মরক্ষা করতে। কিন্তু তবু তার বিনাশ হয় না।

প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া একদিন বিরাট সভ্যতার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, কারুকর্মে, লেখনকলায়, যুদ্ধবিগ্রহে, নৌকৃতিত্বে এদের সমসাময়িক পৃথিবীতে (খৃঃ পূঃ ৫০০০ অব্দ নাগাদ) ছিল প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। কিন্তু কালের ধাক্কায় ধুয়ে মুছে কোথায় হারিয়ে গেছে তাদের নামের চিহ্ন। মিশরের ওপর দিয়ে বহে গেছে গ্রীক, রোমান, আরবীয় অভিযানের প্লাবন। পিরামিড হয়ত ভেসে যায়নি, কিন্তু 'যাঁরা পিরামিড বানিয়েছিলেন সেই আখনাটন, টুটেন-খামেনরা কোথায়? কোথায় হামুরাবি, নেবুকাডনেজার-শ্রেণীর সেই সব অমিত শক্তিধর শাসকরা, যাঁরা একদিন আসিরিয়া, নেনেভ ও ব্যাবিলনের মানুষদের বিপর্যস্ত করে রাখতেন? মাত্র কিছু কিছু প্রত্নবিদদের উদ্যম, আজ মাটি খুঁড়ে পোড়া ইটে খোদাই করা বাণমুখো হরফ বের করেছে যা থেকে জানতে পারি আমরা তাঁদের নামধাম, বিবরণ। কিন্তু তাঁরা কই?

এরই পাশাপাশি দেখুন প্রাচীন ইরান, ইজরাইল, গ্রীস ও রোমকে। প্রাচীন ইরানের আদি বাসিন্দা অগ্নিউপাসক পার্সীরা কবেই জন্মভূমি থেকে সমূলে উৎখাত হয়েছেন, সে মাটিতে নেই তাঁদের নামগন্ধও আর। তবু তাঁদের আদিগ্রন্থ আবেস্তা এবং দ্যুতিময় পরমেশ্বর অহুর মজদার ভাবরূপ ধারণ করে অটুট রয়েছেন আজো। আজো ভারতের ক্ষুদ্রতম জাতিগোষ্ঠী রূপে তাঁরা জ্ঞান বিজ্ঞানে ও ধ্যান ধারণায় সমুন্নত শ্রেণী হয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছেন। ইহুদীরা ইজরাইল থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর দিকে দিকে। কয়েক হাজার বছর পরে মাত্র সেদিন স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন তাঁরা। কিন্তু কি বিরাট শক্তিতে রক্ষা করেছেন হিব্রু ভাষা, তালমুদ গ্রন্থ এবং তাঁদের নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। আজো তার জ্যোতি অম্লান রয়েছে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের ইতিহাসে শুধু নয়, ভূগোলেও হয়ে গেছে আমূল ওলটপালট। ধর্মে কর্মে আচারে সংস্কারে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, অন্য জাতি হয়ে গেছেন তাঁরা আজ। কিন্তু গ্রীকোরোমক সংস্কৃতির যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা মরেনি। ইউরোপের দর্শনে ও মননে তা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে অদ্যাবধি।

এ থেকে আমরা কি দেখাতে চাইছি ? এই নয় কি যে, সংস্কৃতিহীন সভ্যতা মোটেই বাঁচে না ; পক্ষান্তরে সংস্কৃতির শক্তি প্রবল হলে সহস্র ভাঙাগড়া ও লক্ষ বিবর্তনের মধ্যেও সত্য বস্তুটুকু টিঁকে যায় ? ভারতবর্ষ এবং চীনের জীবন থেকেও একই সত্য প্রতিপন্ন করা যায়। কত ভাঙাগড়া চলে গেছে দুইয়ের ওপর দিয়ে। কিন্তু কংফুৎসের জীবননীতি ও লাউসের তাও-তত্ত্ব আজও আঁকড়ে আছে চীন। তার পুরানো জীবন-প্রত্যয়, সমাজদর্শন ও মানবাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী, লোকচর্যা, খাদ্যবিধি আজও তাকে শক্তি জোগাচ্ছে। হিন্দু বৌদ্ধ ঐসলামিক ও খ্রীষ্টীয় এই চতুর্বর্গ প্রভাবের মধ্যেও ভারতবর্ষ তার নিজস্ব স্বাধিকার প্রায় কিছুই বর্জন করেনি। ভালমন্দের প্রশ্ন এখানে বিচার্য নয়। আমরা দেখাতে চাইছি সংস্কৃতির সামর্থ্য যতটা কালজয়ী, সভ্যতার ক্ষেত্রে তা মোটেই নয়। এই সূত্রে আরবের কথাটাই ভাবুন না। প্রাক্-মহম্মদ কোরেশদের আরব সমুন্নত ছিল গণিত, আলকেমি, দর্শন ও কাব্যকলায়। ইসলামের অভিঘাতে তা বেমালুম লোপ পেয়ে গেছে। আরবের কোথাও নয়, স্পেনে হয়ত তার ছিটেফোঁটা আজো বেঁচে আছে চেহারা বদল করে। চীন ও ভারতের সঙ্গে এইখানেই তার পার্থক্য।

এখন প্রশ্ন উঠবে, তাহলে গ্রীস রোম চীন ও ভারতের সংস্কৃতি বড় ছিল, আর সভ্যতা কি অপোক্ত ছিল ? তা না হলে তারা বাইরের অভিঘাতে ভেঙে পড়ল কেন ? কেন পারল না শক্ত প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে ? এ-একটি মৌলিক প্রশ্ন। এর সদুত্তর ইতিহাসবিদরাই দেবেন। তবে দেখা যায় কোন সভ্যতা যেই স্থিতিশীল হয়, অমনি তার সংস্কৃতি দিকে দিকে ডালপালা ছড়িয়ে তার জীবনে নিয়ে আসে একটা আত্ম-তৃপ্ত সহজতার মনোভাব, যা বর্বর হিংস্রতার অভিযানকে রুখতে পারে না কোন সময়ই। গ্রীকোরোমক বা চৈনিক বা ভারতীয় সভ্যতা, কিংবা ইহুদী বা পারসিক বা আরব্য সভ্যতা যাঁদের হাতে বার বার মার খেয়েছে, তাঁরা সবাই হিংস্রতর প্রস্তুতি ও উন্নততর মারণাস্ত্র নিয়ে হানা দিয়েছিলেন এবং প্রজ্ঞা, জীবননীতি ও কর্মাদর্শে অনুন্নত হয়েও উন্নতদের উপর জয়ী হয়েছিলেন, শুধু বস্তুশক্তির উপর নির্ভর করে অভিযান চালিয়েছিলেন বলেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখুন এক আরব ছাড়া কারো স্বধর্মই ষোল আনা বিলুপ্ত হয়নি। এইখানেই হল সংস্কৃতির শক্তি। তা মার খেয়েও জয়ী হয়।

কিন্তু কতকগুলো কথা বোধহয় একটু জড়িয়ে বলা হয়েছে। পার্সী ও ইহুদীরা স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়েও স্বকীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বলিষ্ঠ পৌরুষে রক্ষা করেছেন। গ্রীস, রোম, ও আরবের মানুষেরা স্বভূমিতে স্থিত থেকেই পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, অন্য দেশ বা অন্য জাতি যদিও তার প্রভাবে শক্তিমান

হয়েছেন। আর ভারতবর্ষ ও চীনের মানুষেরা স্বভূমিতে থেকেই স্বকীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সসম্মানে বহন করতে পেরেছেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অজস্র ভাঙন এবং বিবর্তন মাথা পেতে নিয়েও। এঁদের পরস্পরের মধ্যে মিল ও গরমিলগুলো কোথায় তা আশা করি বিচারশীল পাঠকদের বোঝাতে হবে না। এ-থেকে তাহলে প্রকারান্তরে একথাই কি দাঁড়াল না যে বাইরে দুর্বল মনে হলেও যাকে অন্তর্নিহিত শক্তি বলে, তার নিরিখে চীন ও ভারত মানব ইতিহাসে প্রায় তুলনারহিত?

কেন এ কথা বলছি? বলছি এ জন্যে যে, প্রাচ্য দুনিযার এই দুই দেশের ওপর দিয়ে যত আক্রমণ অভিযানের ঢেউ গেছে, অত যায়নি কারুর ওপর দিয়ে। তবু এরা নিজস্বতার ছাপ যতটুকু বজায় রাখতে পেরেছে তা পারেনি আর কোন দেশই—মিশর আসিরিয়া ব্যাবিলনের কথা ত আগেই বলেছি। দক্ষিণ আমেরিকার ইনকা আজটেক প্রভৃতি সভ্যতা কেমন ছিল? স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজ অধ্যুষিত আজকের লাতিন মুল্লুকগুলোর দিকে তাকিয়ে তা বোঝা যায় কি? রোম, গ্রীস ও আরবের পুনরুল্লেখ না করে শুধু প্রশ্ন তুলব যে তারা অন্যকে প্রভাবিত করলেও নিজেরা সর্বস্ব খোয়াল কেন? তুলনায় সমালোচনা করে পারস্পরিক সংস্কৃতির মূল্য যাচাই করলে হয়ত পাওয়া যাবে তার উত্তর। অন্তত খুঁজে দেখা যেতে পারে। বিশ্বসংস্কৃতির সামগ্রিক খতিয়ান মেলে ধরে সে বিচারের চেষ্টা করেছিলেন দিদেরো, লেকী, লসন, স্পেংলার, উইল ডুরাণ্ট, টয়েনবী। কিন্তু লক্ষণীয় যে সবাই তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতিকেই বড়ত্বের মার্কা দিয়েছেন।

এ শুধু অসত্য নয়, অতথ্যও। মানবেতিহাসকে যদি একটি অখণ্ড প্রবাহ বলে ধরা হয়, তাহলে তার প্রথমার্ধে আমরা দেখি, প্রাচ্য চড়াও হয়েছে প্রতীচ্যে এবং ইচ্ছায় হক অনিচ্ছায় হক প্রতীচ্য সভ্যতা পদে পদে অনুরঞ্জিত হয়েছে তার রঙে। দ্বিতীয়ার্ধে এর আবার উল্টোটা। প্রতীচ্য এসে চেপেছে প্রাচ্যে এবং পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করেছে প্রাচ্য জীবন ও সমাজ গঠনের ওপর। কাজেই আজকের প্রাচ্যকে যদি ইউরোপের মন্ত্রশিষ্য বা উত্তরপুরুষ বলা হয়, তাহলে ইউরোপের পূর্বপুরুষ রূপে প্রাচ্যের যে ভূমিকা সেটার কথাও সমভাবে ব্যক্ত করা দরকার নয় কি? মনে রাখতে হবে, পারসিকরা, হুণরা, সারাসেনরা প্রবল শক্তিতে একদিন হানা দিয়েছিলেন ইউরোপে বিভিন্ন দেশে। তারপর চাকা উল্টাল। ইউরোপ হানা দিল প্রাচ্যে। পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজরা এশিয়া আফ্রিকায় বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য গড়লেন, থাবা বাড়ালেন আমেরিকা মহাদেশেও।

আজকের প্রাচ্যে ইউরোপীয়দের দানের পরিমাণ এতই স্বপ্রকাশ যে তার ব্যাখ্যা দরকার হয় না বিশেষ। কিন্তু আজকের ইউরোপে প্রাচ্যের দান কি এবং কতটা, তাও খুঁজলে বের করা যায় বৈকি। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ঈশ্বর ও

আত্মানুসারী আস্তিক্য দর্শন এবং পঞ্চভূতাশ্রিত লোকায়ত দর্শন চীন, ভারত ও আরব হয়েই গ্রীকোরোমক দুনিয়ায় ব্যাপ্ত হয়নি কি? ইউরোপীয় সমাজবিধি, জীবননীতি ও লোকমঙ্গলাত্মক বিবিধ প্রচেষ্টার মূলে যেমন ভারতীয় বৈদিক এবং বৌদ্ধ প্রভাবের নিঃশব্দ পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যায়, নৌবাত্রায় এবং শিল্পশৈলীতে যেমন আবিষ্কার করা যায় মধ্যপ্রাচ্যের, বিশেষ করে আরবের, অনতিক্রম্য প্রভাব, তেমনি বলবিদ্যা, খবিদ্যা, বারুদ, বয়ন ও মুদ্রণে দেখতে পাওয়া যায় মুঙ্গল, সোজা করে বললে চীনা সভ্যতার সুস্পষ্ট হাতের ছাপ। এগুলো গলাধঃকরণ ও পরিপাক করেই ইউরোপ বড় হয়েছে। কিন্তু ঋণ গোপনে তার সতর্কতার অন্ত নেই।

৩

ভারতবর্ষ এবং চীন কিন্তু তা বলে গ্রীকোরোমক, খ্রীষ্টীয় বা সারাসেনীয় আদর্শে কোন-দিন সাম্রাজ্য বিস্তার করেনি। জানি, একথায় তর্ক উঠবে। বালী, জাভা, সুমাত্রা, ও কম্বোজে ভারতবর্ষীয়দের যেসব উপনিবেশ তৈরি হয়েছিল, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় শৈলেন্দ্র রাজাদের যে শাসনাধিকার ব্যাপ্ত হয়েছিল, তা তাহলে কি—এ প্রশ্ন তুলবেন অনেকে। আবার কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া থেকে সিয়াম ও বর্মা পর্যন্ত যে চীনের প্রভাবাধীন দুনিয়া গড়ে উঠে উঠেছিল, তাই বা কি তাহলে? আমাদের ধারণা সশস্ত্র আত্মবিস্তার নয় এগুলো। কোন লিখিত প্রমাণ ত নেই-ই, লোকশ্রুতি বা উপকথাতেও মিলবে না তার সাক্ষ্য। অন্তত ওলন্দাজরা যেভাবে ইন্দোনেশিয়া গ্রাস করেছিলেন, ফরাসীরা দখল করেছিলেন আনাম ও কম্বোজ, কিংবা ইংরেজরা করেছিলেন ভারত, বর্মা ও সিংহলকে, সে ভাবে চীন এবং ভারত তার পরিপার্শ্বের দেশগুলিকে তাঁবেদার বানায়নি। সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি থেকে স্থিতি, তা থেকে অভ্যুদয়ই ভাবা যেতে পারে একে। বলপ্রয়োগ হয়ে থাকলেও তা হয়েছে নগণ্য পরিমাণে।

এও নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে ভারত ও চীনের নীতি এবং কৃতির স্বাতন্ত্র্য, যা আর কারো সঙ্গেই মেলে না। অর্থাৎ ফের আসছে সেই সংস্কৃতির কথাই যা আপন রঙে অনুরঞ্জিত করেই দূরকে কাছে আনে, পরকে বাঁধে আত্মীয়তার বন্ধনে। ইউরোপ অনেক জিনিষই পেয়েছে প্রাচ্যের কাছে, খোদ খ্রীস্টধর্মই তাকে প্রাচ্যের দান, তবু এই জিনিষটা শিখতে পারেনি। তাই পৃথিবীর সর্বত্র সে গেছে অভিজেতা রূপে, চেপে থেকেছে অধিশাস্তা রূপে। একাত্ম হয়ে যেতে পারেনি মানুষের জীবন ও মননের সঙ্গে। সেই জন্যেই দিন আসে যখন, তাকে বহিষ্কৃত হয়ে আসতে হয় পরভূমি থেকে।

কিন্তু আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে এসেছি। আবার সংস্কৃতির কথাতেই ফিরে যাই। ভারত ও চীনের সাংস্কৃতিক মহত্বের কথা বারবার বলেছি। প্রশ্ন হতে পারে, কি সেই মহত্বের গোড়ার কথা, যা খ্রীষ্টীয়, সারাসেনীয় বা ঐসলামিক সংস্কৃতির মধ্যে মিলবে না?

প্রশ্নটি জটিল এবং এর উত্তরও সহজ নয়। কিন্তু বাজিয়ে দেখতে ক্ষতি কি? রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, গান্ধী, রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ ভারত-ব্যাখ্যাতারা এবং লিন উটাং, হু সি মো, তাই উ তুন প্রমুখ চীনা-তত্ত্ববিদ্‌রা এই কথাই বুঝিয়েছেন মানুষকে যে প্রাচ্য জীবনচিন্তা চিরদিন শান্তির স্বপক্ষে। যুদ্ধবিগ্রহ, রক্তপাত আমাদের আদর্শ নয়। সাম্রাজ্যিক ও বাণিজ্যিক সম্প্রসার অপেক্ষা প্রীতির পরিব্যাপ্তিই আমরা বেশী কাম্য ভেবেছি মানব সম্পর্কের উদ্বর্তনে। বিবেক, বৈরাগ্য ও ঈশ্বরাভিমুখী আত্মসমর্পণের মনোভাব আমাদের সহজাত এবং আমাদের ধ্যানধারণা, কলা কৃষ্টি ও শিল্পচিন্তার মধ্য দিয়েই এই ধারা নিঃশব্দে প্রবাহিত।

প্রতীচ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক মূল্য নির্ধারণের এটাই প্রধান মাপকাঠি এবং এই নিরিখ ধরে বিচার করেই পণ্ডিতেরা বলেন যে, আমরা মূলত ভাববাদী, আর ওঁরা বস্তুবাদী। বলেন, হাজার হাজার বছর ধরে কতকগুলি ধ্রুব বোধ ও শ্রেয় চিন্তার বাতাবরণে আত্মগোপন করে এবং দ্রুত ধাবমান কালের আবর্তনকে আমল না দিয়েই যথাসম্ভব অনড় থাকতে চেষ্টিত রয়েছি আমরা। তার ফলে গতির ক্ষেত্রে পরাভূত হলেও, স্থিতির ক্ষেত্রে আমরা অজেয় থেকে গেছি। এই স্থিতির ফলে আমাদের জাতীয় প্রবণতা, স্বধর্ম ও জীবনচর্যার কাঠামোতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন ঘটেনি আজ পর্যন্ত। পূর্বাপর অবিচ্ছিন্ন ধারা ধরেই জীবনের পথ হেঁটে চলেছি আমরা। ইসলাম ও খ্রীস্টবাদ ভাঙতে পারেনি এর ছাঁচকে, পারেনি বিজ্ঞানভিত্তিক একালীন শিক্ষাদীক্ষাও। তবে সাম্যবাদ হয়ত কোন দিন পারবে, বলেছেন রাসেল। চীনে পেরেছে, ভারতেও না পারার কোনো কারণ নেই।

অর্থাৎ এই বিজ্ঞ মনীষীদের ব্যাখ্যানুসারে আত্মিক বিবেক ও আধ্যাত্মিক নির্লিপ্ততাই হল প্রাচ্যদেশীয়, বিশেষ করে চৈনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। তাঁদের মতে এই দৃষ্টই সুফী চিস্তিদের, খ্রীস্টান ক্যাথলিকদের এবং জাপানী জেন বৌদ্ধদের মধ্যেও অল্পাধিক প্রতিফলিত হয়েছে, যদিও খাঁটি ইসলাম, প্রোটেস্টাণ্ট খ্রীস্টবাদ এবং জাপানী শিন্তোবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের প্রবণতাকেই পরিপুষ্ট করেছে। এই যে একটি ধ্রুব প্রত্যয়কে একাগ্র নিষ্ঠায় ধরে থাকা, এর চেহারাটা বাইরে থেকে ভীরুতা ও রক্ষণশীলতার মত দেখালেও আসলে এ-একটা জীবন্ত বস্তু, যা শাশ্বতের স্পর্শধন্য, এই কথাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে। ভারত ও চীন কালের সমস্ত সংঘাতকে অতিক্রম করেও বেঁচে আছে, যা পারেনি গ্রীস, রোম, আরব, আর যা পেরেছে ভৌগোলিক সংস্থিতি হারিয়েও ইজরাইল ও ইরান, সে এরই জোরে—এই হল তাঁর এবং আরো অনেকের বক্তব্য।

আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থন এই ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি সন্দেহ নেই, তবু চীনা ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যান এত সরল মনে হয় না আমার। কেন বলছি।

চীন কি খুব একটা বিবেক-বৈরাগ্যবাদী-ঈশ্বরপরায়ণ মানুষের দেশ ছিল কোন কালেই? কংফুৎস তাকে দিয়েছেন যে কঠোর নৈতিক অনুশাসনে সমৃদ্ধ বাস্তব কর্তব্যের ছক, তা ত ষোল আনা ঐহিক বা বৈষয়িক। ঈশ্বর, আত্মা বা মোক্ষের কোন কথাই ত তাতে নেই। লাউৎস দিয়েছেন তাও তত্ত্ব, তা কর্তব্যের সঙ্গে প্রেমকে, সাংসারিকতার সঙ্গে আত্মজ্ঞানকে যুক্ত করেছে ঠিকই, কিন্তু একবারও তা ঈশ্বরের দিকে বা জীবন্মুক্তির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলেনি মানুষকে। চীন যে ঈশ্বর, যাগযজ্ঞ ও পুরোহিত-বিবর্জিত মহাযানী বৌদ্ধমতকে অত সহজে মেনেছিল, সে তার এই মানসিকতার বাস্তবমুখী ধরনটার জন্যেই, আর আজ যে সাম্যবাদকে সহজে পরিপাক করতে পেরেছে সেও এই জন্যেই। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা নয়, বাস্তবতাই তাকে কালজয়ী করেছে।

ভারতবর্ষ এ-হিসাবে চীনের চেয়ে ঢের বেশী আধ্যাত্মিক এবং তথাকথিত বিবেক বৈরাগ্যের দাপটও এখানে বেশি। তবু বলতে বাধা নেই যে ভারততত্ত্ববিদদের ব্যাখ্যাও যথেষ্ট একপেশে। এদেশেও মঘোলীপুত্র গোসাল, কেশকম্বলী ও চার্বাক জন্মেছিলেন, যাঁরা দিয়েছিলেন পাঞ্চভৌতিক উপাদানাশ্রিত জগৎ ও জীবনবোধের তত্ত্ব এবং নিরীশ্বর বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মধ্যে দিযে ও তান্ত্রিক আলকেমিস্টদের চিন্তার মধ্যে দিয়ে দৃঢ় বাস্তবাশ্রিত একটি জীবনপ্রত্যয়ও তলায় তলায় অনুস্যূত ছিল গোটা দেশেই। যুগে যুগে বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য, ঐসলামিক ও খ্রীস্টীয় ভাবতরঙ্গ প্রতিহত করেও তা জাতীয় সত্তার আদি মেরুদণ্ডকে বরাবর খাড়া রেখেছে। সাম্যবাদকে দুহাত বাড়িয়ে নেবার জন্যে আজ আগ্রহী হয়েছে ভারতও এই বাস্তব জ্ঞানের অনুপ্রেরণাতেই, কারণ এর মধ্যে নিহিত আছে জাতির অন্তর্লগ্ন প্রবণতা। একদিকে মানবাত্মবাদী বিশ্ববোধ, অন্যদিকে বাস্তব সত্যজ্ঞান সমন্বিত জীবনবোধ, এ দুই-ই হল ভারতের বৈশিষ্ট্য।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতেতিহাসের, অর্থাৎ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। তাহলে যেমন ঈশ্বর, আত্মা, অদৃষ্ট ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ধারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত সাবেকী ব্যাখ্যার রূপ বদল হবে, তেমনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, নরের মধ্যে নারায়ণ জাতীয় বাগাড়ম্বরেরও আয়ু শেষ হবে। কিন্তু সেই ব্যাখ্যাতা কোথায়?

॥ তিন ॥ সংস্কৃতি ও সাধারণ মানুষ

ইতিহাস তৈরি করেন কারা? একটা সময় ছিল যখন রাজবৃত্তই ইতিহাস নামে পরিচিত ছিল। রাজা ও রাজপুরুষদের এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষিত পুরোহিত, যাজক পণ্ডিত ও বণিকদের কার্যকলাপই স্থান পেত ইতিহাসে। কোনো যুগের শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য ও সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের বিচার হত এঁদের অবস্থার দিকে চোখ রেখে। কিন্তু ইতিহাসের এই নিরিখ আজ বদলেছে। আজ বুঝতে পেরেছি আমরা, দুধের ওপর সরের মতো ভেসে থাকা এই যে সুবিধাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়, এঁরা এক একটা দেশের কতটা অংশ অধিকার করে থাকেন? নিশ্চিতই খুব কম অংশ। ধরা যাক মোট জনসংখ্যার বিশভাগের এক ভাগ। বাদ বাকি যাঁরা জনসাধারণের অন্তর্ভুক্ত, চাষী, কারিগর, দেহশ্রমী মজুর প্রমুখ, ইতিহাস তাঁদের সম্বন্ধে নীরব। তাহলে কি মনে করতে হবে তাঁরা ওপরতলা থেকে গড়িয়ে পড়া শান্তি ও স্বাচ্ছল্যরই অংশীদার হতেন অতীতে এবং সামাজিকতায় রাজনীতির অধিকার বণ্টনে তাঁদের সম্বন্ধে কিছুমাত্র কার্পণ্য করা হত না? জনসাধারণকে সুখী করেই নায়ক শাসক ও সংস্কৃতিবেত্তারা সুখী হতেন? গরমিল যা হয়েছে তা হয়েছে একালে!

বলা দরকার যে কোনো দেশের ইতিহাসই এই সহজ সিদ্ধান্তের পোষকতা করে না। ভারতবর্ষের কথাই ধরুন। রামায়ণে দেখি, শম্বুক নামক শূদ্র তপস্যা করছেন; তাঁর এই 'অনাচারে' দেশে দুর্ভিক্ষ ও অজন্মা দেখা দিয়েছে শুনে রামচন্দ্র গিয়ে স্বহস্তে তার মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। মহাভারতে দেখি, নিষাদপুত্র একলব্য কৌরব পাণ্ডব রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দূর থেকে দেখে দেখেই ওস্তাদ ধানুকী হয়ে উঠলেন এবং দ্রোণাচার্যকে পরোক্ষে এ শিক্ষাদানের জন্যে গুরু বলে প্রণতি নিবেদন করতে এলেন। দ্রোণ তখন কি করলেন? গুরুদক্ষিণা হিসাবে তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি কেটে নিলেন। এসব থেকেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে উচ্চ বর্গের জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধ্যানধারণার অধিকার নীচু পদবীর মানুষদের জন্যে অতীতে অস্বীকৃত ছিল। মনু ত খোলাখুলিই বলেছেন, শূদ্রের কানে দৈবাৎ যদি বেদমন্ত্র ঢোকে তাহলে সেই কানে গরম সিসে ঢেলে দেবেন। শূদ্রের কোনো

সামাজিক মর্যাদা কবুল করেননি তিনি। তিনি বলেছেন, তাঁদের ছেলেপুলের নাম নৃপতি ভূপতি রাজচন্দ্র হতে পারবে না কোনো কারণেই। অবশ্যই তাঁদের নাম হবে দীনদাস পদরেণু বা এমনি কিছু।

অথচ শূদ্র পুরুষের মেহনৎ এবং শূদ্র নারীর ইজ্জৎ দু-হাতে ভাঙিয়েই তৈরি হয়েছে বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্যের ইমারত। নদী পার হবার সময় গুহক চণ্ডালকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছেন রামচন্দ্র। ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধাকে জনহীন দ্বীপে টেনে নিয়ে গেছেন পরাশর মুনি এবং বেদব্যাসের মাতৃত্ব গ্রহণে বাধ্য করেছেন সেই নিষ্পাপ কুমারীকে। ভারতবর্ষে জনতার বৃহত্তম অংশ উচ্চ ত্রিবর্ণের পদানত থেকে হাজার হাজার বছর শুধু লাঞ্ছনাই ভোগ করেছেন। অথচ মুখে সগর্বে প্রচার করা হয়েছে যে জীব মাত্রেই শিব; নর মানেই নারায়ণ। এই যে প্রত্যয় ও অভ্যাসের বিরোধ, এই যে গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষার জন্যে ন্যায়নীতি ও মানসিক সুবিচারের অপহ্নব হয়েছে ভারতবর্ষে, এর পিছনে আছে অনতিক্রম্য ঐতিহাসিক কারণ-পরম্পরা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একেবারে আজ পর্যন্ত এই কারণগুলিই চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে আমাদের সমুদয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে।

কি এই কারণগুলি, একটু যাচিয়ে দেখা যাক। সবাই জানেন, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন যা পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায়, তার সুরু খ্রী: পূ: পাঁচ হাজার অব্দ হওয়া অসম্ভব নয়। আর বৈদিক আর্য সভ্যতা যা ভারতে এসেছিল বাইরে থেকে তা এসেছিল খ্রী: পূ: পৌনে দু-হাজার অব্দ নাগাদ। বৈদিক আর্যদের মোটামুটি পরিচয় পেয়েছি বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। কিন্তু কারা ছিলেন এই মহেঞ্জোদড়োবাসীরা? দেখা যাচ্ছে শিব শক্তি তাঁদের আরাধ্য ছিলেন। তাঁরা ছিলেন উন্নত নাগরিক সভ্যতার স্রষ্টা এবং যদিও পোড়ামাটির শীলমোহরে উৎকীর্ণ তাঁদের বর্ণমালা পড়া যায়নি, তবু বোঝা যায় তাঁরাই ভারতের আদি তন্ত্রাচারী দ্রাবিড় গোষ্ঠী এবং তাঁদের দমিত করেই আর্যরা ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করেছেন। সুসভ্য নাগরিক সভ্যতার অধিকারী মানুষ এঁরা, যাযাবর আর্য অভিঘাত সহ্য করতে পারেননি। যাঁরা আগন্তুকদের বশ্যতা স্বীকার করেছেন তাঁরা হয়েছেন শূদ্র বা দাস, আর যাঁরা অরণ্যে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন তাঁরাই ভারতের নানা অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেছেন।

আগেই বলেছি শূদ্র দাসদের শ্রম ভাঙিয়েই তৈরি হয়েছে আর্য প্রভুদের বনিয়াদ, অথচ অস্বীকৃত হয়েছে তাঁদের ন্যূনতম মানবিক অধিকারটুকুও। বিশ্বামিত্র ও গৃৎসমদ গোষ্ঠীর বিদ্রোহ, চার্বাক ও কেশকম্বলীর বস্তুবাদী দর্শন, বুদ্ধ ও মহাবীরের বেদ, ব্রাহ্মণ এবং যাগযজ্ঞবিরোধী ধর্মীয় অভ্যুত্থান ···এই নিগৃহীত শূদ্রদেরই আত্মরক্ষার সংগ্রাম।

বৌদ্ধদের অভ্যুদয়ে সাময়িকভাবে জয় হয়েছিল এঁদের। কিন্তু শঙ্কর ও কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবে আবার সনাতনী হিন্দুদেরই হাতের মুঠি শক্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম অবক্ষয়িত হয়ে শূদ্ররা নেমে যান অন্ত্যজের পর্যায়ে। ইসলাম এলে অবনমিত হিন্দুরা মুসলমান হন দলে দলে, সে কি অকারণেই? ইংরেজ এসে জোর করে সকলকে খ্রীস্টান করলে হয়ত এক রকমের সমাধান হত। কিন্তু দুই শ্রেণীকে জীইয়ে রেখেই ভেদনীতির খেলা খেলেছেন তাঁরা। তারই অনিবার্য ফল হল ভারত বিভাগ এবং আজকের যাবতীয় সংকট ও সমস্যার আদি সূত্র রয়েছে তার মধ্যেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের অধিকার হরণের দণ্ড আমরা পেয়েছি, এখনো পাচ্ছি ভালো-ভাবেই। তবু সতর্ক হয়েছি কি আমরা?

২.

শুধু ভারতবর্ষের কথা বলছি বলে এ ধারণা করলে ভুল হবে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ জনসাধারণ সম্বন্ধে পর্যাপ্ত উদারতার পরিচয় দিয়েছে। প্লেতো এবং আরিস্ততল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে নিম্নবর্গীয় বা অন্ত্যজরা কোনো অবস্থাতেই উচ্চবর্গীয় অভিজাতদের সমান অধিকার পেতে পারেন না; এমন শিক্ষা সাধারণ মানুষ পাবেন না, যাতে তাঁদের মধ্যে আত্মাধিকার সম্বন্ধে চেতনা জাগে; কারণ তা জাগলে আর তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবেন না কারো; ওপরতলায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংগঠন ধ্বসে পড়বে মুহূর্তেই। গ্রীকদের হাত থেকে রোমানদের হাতে গিয়েও ইউরোপের উঁচু মহলে এই মানসিকতা অব্যাহত ছিল। স্লেভ লেবার বা ক্রীতদাসের শ্রমেই তাঁরা বিরাট সভ্যতার 'ইমারত' গড়েছেন। কিন্তু তার মধ্যে ঢোকার অধিকার পাননি ক্রীতদাসরা। আসলে ক্রীতদাস কারা? অধিকৃত দেশের শ্রমকারী মানুষরা এবং পরাজিত শত্রুর ফৌজের সিপাহীরাই ত! গ্রীকোরোমক সভ্যতায় তাঁরা উপেক্ষিত, যদিও সেনেকা, লুক্রেশিয়াস, প্লিনি তাঁদের হয়ে বলেছেন অল্পসল্প সুশ্রাব্য কথাও।

রোমশাসিত মধ্যপ্রাচ্যে যীশুখ্রীস্ট উঠে যেদিন উপরতলার একাধিকারের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়ালেন এবং প্রচার করলেন সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী, সেদিন কৃষক, কারিগর ও বঞ্চিত ভূমিদাসরাই প্রথম সদলবলে এসে জড়ো হয়েছিলেন তাঁর পতাকার নীচে। তাঁদের সংহত করেই পিটার ও পল রোমে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিলেন। তারপর সম্রাট কনস্টানটাইন একদিন ভেবে চিন্তে খ্রীস্টান হলেন এবং রাজধর্ম রূপে খ্রীস্টধর্ম ব্যাপ্ত হল গোটা ইউরোপে। সেখানেই খতম হল তার সাম্যবাদী রূপ এবং গির্জাধ্যক্ষ এবং সামন্তশ্রেণীর মিলিত চাপে নিগৃহীত হতে শুরু করলেন সাধারণ মানুষরা, ঠিক যে ভাবে বিপ্র যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠীর কবলে পড়ে একদিন বিপর্যয় এগিয়ে এসেছিল বৌদ্ধধর্মের। মধ্য-যুগের অসংখ্য অভ্যুত্থান থেকে ফরাসী বিদ্রোহ, রুশ বিদ্রোহ পর্যন্ত ইউরোপে বঞ্চিত

সাধারণ মানুষরা লড়েছেন অধিকার রক্ষার সংগ্রামে। তাকে বিপথগামী করার জন্যে সাম্রাজ্যলিপ্সা ও উগ্রস্বাজাত্যবোধ দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছে দুনিয়ায়। ঝাড়ে বংশে বিপন্ন হয়েছেন মূলত সাধারণ মানুষরাই, তবু ইউরোপে তাঁরা ন্যূনতম মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, যা সম্ভব হয়নি এশিয়ায়।

ইউরোপে সর্বনিম্ন সোপানেও শিক্ষার ব্যাপ্তি হয়েছে, তার ফলে প্রাথমিক রকম ব্যক্তিচেতনার স্ফুরণ হয়েছে সমাজে। আন্তর্ভোজন ও আন্তর্বিবাহের ব্যাপ্তি হয়েছে এরই পরিণতি রূপে এবং দেশের যা সার্বিক জীবনদর্শন বা সাংস্কৃতিক প্রবণতা, তার অধিকার পেয়েছেন কমবেশী সব মানুষেরাই। সবাই শেক্সপীয়ার, মিল্টন, ভলতেয়ার, গ্যেটে পড়েন, দেকার্ত, স্পিনোজা, কান্ট, হেগেল বোঝেন, ডারউইন, হার্বার্ট স্পেন্সার, আইনস্টাইন, ফ্রয়েডে প্রাপ্তাধিকার সকলেই এমন কথা বলছি না। কিন্তু লিখন-পঠনক্ষম অনেকেই এবং সবাই স্বাবলম্বী ও আত্মরক্ষা বিষয়ে অবহিত। আর সেইজন্যেই সমষ্টিগত ভাবে তাঁদের দেশ ও সমাজ অনেক বেশী শক্তিশালী ও সুগঠিত। এই জায়গায় পৌঁছতে পারেনি এশিয়ার কোনো দেশ, সাধারণ মানুষের অনগ্রসরতাই দায়ী এজন্যে। সাধারণ মানুষকে স্বেচ্ছায় রাস্তা ছেড়ে দেয়নি ইউরোপও। কিন্তু সাধারণকে নেতৃত্ব দেবার জন্যে সেখানে জননেতা উঠেছেন অঢেল। এশিয়ায় ক্রমওয়েল, হ্যামডেনরা ওঠেননি কোনোদিনই। ওঠেননি বিশ্বকোষবাদী বা চার্টিস্টদের মতো গণসংগ্রামীরাও। তাই যখন যিনি প্রভু, জনতা তাঁর কাছেই বশ্যতা স্বীকার করেছে।

ভারতবর্ষে কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূদের অভিভাবকতায় তৈরি হয়েছে যে ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও শৈল্পিক বোধের বাতাবরণ, তাতে অলক্ষিতেই অনুপ্রবিষ্ট থেকে গেছে শোষণভিত্তিক সমাজবিন্যাসের আদর্শ। লক্ষণীয় যে, এই কাঠামো বাঁচানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে রকমারি হাতিয়ার। সাধু মোহন্তের মহিমান্বিত জীবনকাহিনী, অদৃষ্ট ও কর্মফলে প্রত্যয়, যোগ বিভূতি বা ম্যাজিকের ভেলকী···আর তা না হলে শান্তি, সাম্য ও অহিংসার নামে স্থিতাবস্থার পক্ষে ওকালতি। এগুলোই হল এশিয়ার 'সৎ' সংস্কৃতির স্বরূপ এবং এর প্রতিই সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে অন্ধ আনুগত্য জানাতে। এ-জিনিস আজ আর সম্ভব নয় ইউরোপে, বোধহয় নয় আমেরিকাতেও। এই ভাবে যূপবদ্ধ পশুর মতো আত্মসমর্পণ কিছুতেই করবেন না সেখানের সাধারণ মানুষরা। প্রথমত ধর্ম, ঈশ্বর, অদৃষ্ট ও মোক্ষে প্রত্যয় নেই তাঁদের অনেকেরই। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিত্বের খর্বতাকে তাঁরা অস্তিত্বের অসম্মান বলেও মনে করেন। তাই চলতি বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে সেখানে মানুষ রুখে দাঁড়ান একটু ব্যতিক্রম দেখলেই। এশিয়ায় জনসাধারণের সহিষ্ণুতা অসাড় মহিষের কাঁধের মতো! সেই কাঁধে পা রেখে তাই যিনি যখন সুযোগ পান, তিনিই চেপে বসেন মাথায়। বহু হাজার বছর ধরে তৈরি জমি যে, না হবে কেন বলুন!

পশ্চিমে ইরান ও আরব রাষ্ট্রমণ্ডলী এবং পূর্বে বর্মা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাবলী যেদিকেই তাকান, অবস্থাটা একই দেখা যাবে এশিয়ায়। পার্থক্য মিলবে শুধু জাপানে আর চীনে। জাপান ধর্মে এখনো হয়ত শিন্তো পন্থা ও জেন বৌদ্ধধর্মকে বর্জন করেনি, কিন্তু আর সব ক্ষেত্রেই ইউরো-মার্কিন ছাঁচ গলাধঃকরণ করে এশিয়াগত বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে পরিহার করেছে। এই জন্যেই লক্ষণীয় যে জাপান সাধারণ মানুষকে সামুরাইদের ভুমিদাস ও চাকরানভোগী সিপাহীদশা থেকে মুক্ত করে স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে। চীন কংফুৎসের নীতিবাদ ও লাউৎসের তাওবাদের আওতা কাটিয়ে মার্কসবাদের ছকে দেশকে নূতন করে গড়েছে। জনতাই হয়েছে সেখানে জনসরকারের ভিত্তি এবং নিশ্চিতই হয়েছে তাদের মধ্যে নূতন ব্যক্তিত্ববোধের উদ্বোধন। তবে সমষ্টিবাদী শাসন-কাঠামোতে ওটা যতটুকু বা যেভাবে হতে পারে তাই হয়েছে। অর্থাৎ এশিয়ার সাবেকী স্বধর্ম থেকে স্খলিত হয়ে সাম্যবাদী চীন ও ধনতন্ত্রবাদী জাপান নূতনতর জীবনদর্শনের দীক্ষা নিয়েছে। ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশ তা পারেনি, তাই সে সব স্থানে শ্রেণী সংঘাত অনিবার্য ও অপরিহার্য হয়ে উঠছে দিনে দিনে।

৩.

ভারতের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, আবার সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসছি। ভারতবর্ষে জ্ঞান বিজ্ঞান এবং কলাকৃষ্টির উৎকর্ষ অতীতে যথেষ্টই হয়েছে সন্দেহ নেই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসা, ব্যাকরণ, অলংকারতত্ত্ব, কাব্য, নাটক—নানা বিভাগে যেমন মানুষের মেধা ব্যাপ্তি লাভ করছে, তেমনি স্থাপত্যে, কারুকর্মে, সঙ্গীতে, সুন্দর সুরুচিসম্মত জীবন-চর্চায় ভারতীয় মানুষ যে উচ্চতায় পৌছেছিলেন, চীন, গ্রীস ও আরব রাষ্ট্রমণ্ডলী বোধহয় ততটা যেতে পারেনি। কিন্তু এই যে সংস্কৃতির পরিমণ্ডল, এর গণ্ডী কতটুকু ছিল? নিঃসন্দেহে অতিক্ষুদ্র। এর নীচে ছিলেন যে সাধারণ মানুষেরা, তাঁরা এই আলো থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অজ্ঞানতায় ডুবে থেকেছেন এবং ভূত প্রেত সাপ বাঘের পূজো করেছেন; ওঝা, সাপুড়ে, অবধূতদের নির্দেশে ওঠাবসা করেছেন। দেবতার নামে, কুসংস্কারের বশে প্রাণ নিতে ও দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেননি। এই পিছনের সারিতে পড়ে থাকা মানুষদের উদ্ধারের কোনো চিন্তাই দেখা যায় না আমাদের কোনো সমাজশাস্ত্রীদের কেতাবে।

সর্বপ্রথম বৌদ্ধরাই এঁদের দিকে তাকিয়েছিলেন। দেশে শিক্ষাসত্র, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, অতিথিশালা, অনেক কিছুই করেছিলেন তাঁরা সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্যে। জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আসবে বলেই নিজেদের বক্তব্য তাঁরা

লিখেছিলেন জনগণের মুখের ভাষা পালি ও প্রাকৃতে। কিন্তু উচ্চকোটির মানুষেরা বৌদ্ধধর্মের ধার ভোঁতা করে দিলেন তার মধ্যে দলে দলে ঢুকে পড়েই। অভিজাত গোষ্ঠীরই প্রাধান্য হল বৌদ্ধ ভারতেও এবং জনসাধারণের স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে গেল। তারপর উগ্র হিন্দুয়ানির আঘাতে তাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করলেন শঙ্করাচার্য। এক-দিনের অস্পৃশ্যেরা আবার সেই অস্পৃশ্যই হলেন। আউল, বাউল, কর্তাভজা ইত্যাদি নানা সমাজচ্যুত গোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রকাশ করে জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারভ্রষ্ট হলেন। আর না হয় ইসলাম গ্রহণ করে একেবারেই বাইরে চলে গেলেন সমাজের। ইসলামেও সার্বিক গোষ্ঠীসমন্বয় হয়নি ভারতবর্ষের মাটিতে। মোমিন, নিকারী, পটুয়া ইত্যাদি নানা শ্রেণী আছেন যাঁদের বিশুদ্ধ আল্লাবাদী মুসলমানরা পাঙক্তেয় মনে করেন না। তাঁদের সমাজেও ঐ ভূমিদাস, সিপাহী ও শ্রমকারী সাধারণ মানুষরা অধিকারভ্রষ্ট সর্বহারা আতরাফ রূপেই থেকেছেন। এখনো আছেন।

এইজন্যেই ভারতীয় সমাজের একটি একাত্মিক চেহারা চোখে পড়ে না কারোর। চরম অগ্রগামী ও পরম পশ্চাৎপদ মানুষ একই সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে ভারতবর্ষে। প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ থেকে এর ধারা অব্যাহত। আজকের সমাজে তাকালেও আমরা দেখি, আকাশছোঁয়া বিরাট বিরাট প্রাসাদ আর কুঁড়েঘর পাশাপাশি রয়েছে। একই সঙ্গে বিমান বেতার ও মোটর চলছে, আবার ঠেলাগাড়ী গোরুর গাড়ীও চলছে। নিওনের বাতিও জ্বলছে, আবার জ্বলছে তেলের কুপিও। জীবনচর্যাতেও একই রকম স্ববিরোধ। কিছু মানুষ শুদ্ধপ্রজ্ঞা এবং বিচারবুদ্ধির অনুগামী হয়ে সাবেকী আচার অভ্যাস সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন, কিছু আবার অন্ধ সাবেকিয়ানা দু-হাতে আঁকড়ে পড়ে আছেন। তাই কোনো সংস্কার বা সৎক্রিয়াই সমষ্টিকভাবে করা সম্ভব হয় না এ সমাজে। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, জাতিভেদ অপসারণ, নারীর অবরোধ মোচন, স্বেচ্ছাবিবাহ অনুমোদন, যে কোনো গঠনাত্মক কাজেই সমর্থন যা পাওয়া গেছে, বাধা এসেছে তার চতুর্গুণ। সামাজিক পটভূমি অপরিবর্তিত থাকাই এর কারণ এবং অনড় সমাজ সংস্থা থাকার কারণ হল শিক্ষা ও সংস্কৃতির সার্বিক দ্বারোদ্ঘাটন না করা।

এক সময় তথাকথিত ভদ্রলোকদের গোষ্ঠীস্বার্থকেই দেশের স্বার্থ বলে ভাবা হত, তাই সেদিন উন্নতি বলতে মূলত এই সম্প্রদায়ের উন্নতিই বোঝাত। নীচের ধাপে অবস্থিতদের দিকে তাকানই হত না। এর কারণ ধরেই নেওয়া হত, নীচের সোপানে জন্ম যাঁদের তাঁরা স্বভাবতই নীচু। বড়ত্বের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নেই তাঁদের। ছোট আর কবে বড় হয়, আর জোর করে বড় বানানো হলে কবে ভালো হয়, এই কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ইন্দিরা'র সূচনায়। মনের কথা আজও আমাদের তাই, যদিও মুখে বলি না তা। আসলে বংশানুক্রম ও জন্মগত কৌলীন্যকে

এদেশে শাশ্বত সত্য বলে ভাবা হয়েছে যেমন, তেমনই শ্রেণীগত প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে ধর্মাধিকার, প্রশাসন ও বণিকচক্রের মধ্যে পেতে রাখা হয়েছে একটি অপ্রত্যক্ষ চক্রান্তের জালও। শাস্ত্রের ও ধর্মের, জন্ম ও কর্মফলের, স্বর্গ ও অপবর্গের দোহাই দিয়ে এই কাঠামোকে সর্বকালের জন্যে অনতিক্রম্য করে রাখারই চেষ্টা হয়েছে। এই কাঠামো ভাঙার জন্যে দরকার ছিল যে বিপ্লবের তা আমাদের ইতিহাসে কোনোদিন হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে এখানে-ওখানে যেটুকু বিপ্লবের প্রস্তুতি হয়েছে, প্রচণ্ড প্রতিবিপ্লবের ঢেউ এসে তাকে পণ্ড করে দিয়েছে। তাই অনেক কিছু যুগায়ত ধারণা ও বিশ্বাসের মধ্যেই আজও আমরা খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার বছরের মন এবং কর্ম-পদ্ধতিকে ছাড়তে পারিনি।

চার্বাক ও কেশকম্বলীর বরাবর মনুর, বৌদ্ধ ও জৈনদের বরাবর কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করের, প্রাচীন ধর্মধ্বজীদের বরাবর চৈতন্য নানকের, ব্রাহ্মদের বরাবর রামকৃষ্ণ সমাজের, সশস্ত্র বিদ্রোহীদের বরাবর কংগ্রেসের এবং কম্যুনিস্টদের বরাবর প্রতিক্রিয়াপন্থী জাতীয়তাবাদীদের অভ্যুদয় আমাদের ইতিহাসে অবিচ্ছিন্ন ধারায় হয়ে চলছে। ক্রিয়ার সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া, প্রগতির সঙ্গেই পশ্চাৎগতি, লোকমঙ্গলের সঙ্গেই লোকদমন··· আমাদের ইতিহাসে যেন কার্যকারণের অনিবার্যতায় ঘটেছে। কিন্তু কেন? তার কারণ আমরা ব্রহ্ম ও মানব কল্যাণের নামে যতই গলাবাজি করি, কার্যত মানুষকে আমরা ভালোবাসিনি। আমাদের সংস্কৃতির প্রবণতাই সমষ্টি মানুষের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াবার পক্ষে। এই জন্যেই ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমরা চিরদিনই নিই গোঁজা-মিলের আশ্রয়। যাকে বিপ্লব বলি, তা কখনো বিদ্রোহ কখনো প্রতিবিপ্লব এবং যাকে সংগঠন ও লোকমঙ্গল বলি, তা কখনো উদার মানবতা, কখনো সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ। খাঁটি জিনিস নয় কোনোটাই। এই খাঁটি জিনিস উঠবে, যেদিন মাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষ এই চক্রান্তজাল ছিন্ন করে নূতন দিনের উদ্বোধন করবেন : গড়ে তুলতে পারবেন প্রাণবন্ত সংস্কৃতি।

। চার । সংস্কৃতি : বিজ্ঞান বনাম ধর্ম

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ধাপে বাষ্প ও বিদ্যুতের শক্তি যখন মানুষের আয়ত্তে এল এবং এই অসীম শক্তি গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করে মানুষ শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগান্তর ঘটাল, তখনই বোঝা গেল, ঐশ্বর্য জিনিষটা সৃষ্টি করা যায়, আবার সৃষ্টি করা যায় দারিদ্র্যও। অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধানটা চলে আসছে বরাবর, সেটা মানুষের সৃষ্টি, তথাকথিত কর্মফলের ক্রিয়া নয়। এক প্রান্তে অপরিমিত ধনস্ফীতি এবং আর এক প্রান্তে অসীম বঞ্চনাই পুরানো ভবিতব্যবাদের ইমারতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত হানল।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় এর পর উঠলেন ডারউইন ও লামার্ক এবং তাঁরা প্রমাণ করলেন যে, অজৈব বস্তু থেকেই ক্রমবিকাশের ধারায় একদিন আদিম জীবন উঠেছে। আর সেই জীবনই ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে বিচিত্র সব প্রাণীপর্যায় সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য, প্রাণ ও জৈবচেতনাকে অনির্বচনীয় বলে মনে করা হয়েছে চিরদিন এবং যা অনির্বচনীয়, তা-ই বিশ্বের স্রষ্টা বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ডারউইনীয় অভিব্যক্তিবাদ ঘা দিল এই সহজ প্রত্যয়ের মূলেও।

আত্মা ও অদৃষ্ট এই দুই পৈঠায় দু-পা রেখে খাড়া ছিল যে সাবেকী সংস্কৃতি, তা স্বাভাবিক কারণেই নড়বড়ে হয়ে গেল এর পরে। কতকলোক বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা আশ্রয় করে হলেন নাস্তিক এবং যাগ-যজ্ঞ, ধ্যান, পূজা-প্রার্থনা, স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি যা-কিছু ধর্মানুমোদিত অনুষ্ঠান স্বীকৃত হয়েছে মানব সমাজে, তার বিরোধী মত প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁরা বললেন, প্রকৃতিই প্রাণের উৎস এবং জৈব কারণে প্রাণ একদিন দেহে রূপায়িত হয়, আর এক দিন দেহসংশ্রব থেকে ভ্রষ্ট হয়। অতএব প্রাণের কোনো সৃষ্টিকর্তা আছেন ভেবে যেমন তাঁকে খুশি করার প্রয়োজন নেই, তেমনি সেই দেহের আশ্রয় হারালে আত্মার কোন সৎ বা অসৎ গতি হয় এইসব ভেবেও দুশ্চিন্তা করার সঙ্গত হেতু নেই।

তাহলে জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? তাঁরা বললেন হিতবাদ, যাতে নিজের হিত হয় অথচ অন্যের অহিত হয়না, তাই শ্রেয়এবং কোন অপার্থিব কারণে নয়, নিছক

পার্থিব কারণেই এটা গ্রহণীয়। অন্যের অহিত আমি করি যদি, আমার অহিতও সাধিত হবে তার দ্বারা। এই ভাবে অন্যায় ও অনৌচিত্যের পরিধিই বেড়ে যাবে। তাই আপন কল্যাণেই অন্যের কল্যাণ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার মানুষের।

উনবিংশ শতাব্দীর সেরা মানুষরা অনেকেই এই মতে বিশ্বাসবান হয়ে ওঠেন। বলা বাহুল্য, এই মতের ব্যাপ্তি সমস্ত সভ্য দেশেই ধর্মমন্দিরের বনিয়াদে অল্প-বিস্তর ধাক্কা লাগাল। অর্থাৎ ধর্মের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল বিজ্ঞান। তার ফল হল দুটো ; আধ্যাত্মিক কল্যাণের পিছনে না দৌড়ে মানুষ উদ্বুদ্ধ হল সমাজের কল্যাণে মনোযোগী হতে এবং পার্থিব জীবনের সহায়ক নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে। গত শতাব্দীতে যে নূতন করে দুনিয়ায় মানবতাবাদ প্রসার লাভ করেছিল, তার,প্রধান কারণ বোধ হয় মানুষের মনের নজর ধর্ম থেকে সমাজের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেই। বিজ্ঞান এই ভাবে শুধু গতি ও উৎপাদনের রাজ্যেই যুগান্তর আনেনি, এনেছে মানুষের প্রত্যয় ও মননশীলতার রাজ্যেও।

অবশ্য একথার মানে এই নয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রগতি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই সমভাবে স্পর্শ বা প্রভাবিত করেছে। তা করে নি। খুব ছোট একটা গণ্ডীর মধ্যেই হয়েছে তার ব্যাপ্তি। তার একটা কারণ এই নয়া সংস্কৃতির মর্মে প্রবেশের মত পর্যাপ্ত শিক্ষা বিস্তার কোন দেশেই হয় নি। আর একটা কারণ এবং সেটাই বোধ হয় বৃহত্তর, যে নয়া বিজ্ঞানের অমিত শক্তিকে মুনাফার্জনে নিযুক্ত করে যাঁরা ভৌমিক প্রভুত্ব থেকে ধনপতিত্ব ও শিল্পপতিত্বেএগিয়ে এসেছেন একটু একটু করে, তাঁরা সর্বগ্রাস ও অসম বণ্টনকে চিরাচরিত প্রথা হিসাবে জীইয়ে রাখার উপায় হিসাবে অশিক্ষা এবং ধর্মান্ধতাকে সাগ্রহে পোষকতাই করেছেন। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে দেখি, একদিকে হিতবাদ, বিজ্ঞানবাদ, নব্য মানবতাবাদ যেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি নূতন আকারে সুসংস্কৃত পরিমার্জিত ধর্ম আন্দোলনও মাথা তুলেছে তার প্রতিক্রিয়া রূপে। ইংলণ্ডে Oxford Movement এবং আমাদের দেশে ব্রাহ্ম সমাজ ও রামকৃষ্ণ সমাজ দেখা দিয়েছে এই একই ঐতিহাসিক কারণ পরম্পরায়।

তা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির কিছুটা প্রতিফলন হয়েছে সমাজের সর্বনিম্ন সোপান পর্যন্ত। রেলগাড়ী, ষ্টিমার, উড়োজাহাজ, তারবার্তা, বিজলী বাতি ইত্যাদি যেমনি একের পর এক দেখা দিয়েছে চোখের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন থেকে অলীক ও আজগুবি বিশ্বাস একটু একটু করে খসে পড়তে শুরু করেছে। কথাই আছে, ভূতপ্রেত পালিয়েছে মানুষ যেদিন ইলেকট্রিক আলো জ্বেলেছে, আর ঠাকুর দেবতা পালিয়েছে যেদিন জঙ্গল কেটে শহর বসিয়েছে। তার মানে অন্ধকারই ছিল ব্যাধি, মহামারী ও অকালমৃত্যুর হেতু। এ-দুই যখন থেকে যেতে আরম্ভ করেছে,

তখন থেকেই ধরতে হবে নূতন যুগের সূচনা এবং আজ পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশেই সমাজজীবনের সকল স্তরকে স্পর্শ করেছে এটুকু বিজ্ঞান প্রগতি।

জেনে হক, না জেনে হক, ইচ্ছায় হক, অনিচ্ছায় হক, নূতন যুগের উৎপাদন সব ব্যবস্থা, যানবাহন, খাদ্য, পানীয়, ঔষধ, যোগাযোগ-মাধ্যমকে মেনে নিতে হয়েছে আজ মানুষকেই। অর্থাৎ বিজ্ঞানকে দিতে হয়েছে আংশিক স্বীকৃতি। কিন্তু সেই পরিমাণ পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন করতে পারেন নি অধিকাংশ মানুষই, সেকাল একাল কোনো কালের সংস্কৃতির, যাতে দুটোর মধ্যে তুলনায় আলোচনা করে কোনো একটার আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা নিরূপণ সম্ভব। তাই বারো-আনা সেকালের সঙ্গে চার-আনা একালের জোড়াতালি দিয়েই দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। তাই কঠিন অসুখে আধুনিক ধারার চিকিৎসাও চলছে, দেবতার চরণামৃত পানও চলছে। আমাদের দেশে এই জগাখিচুড়ী একটু বেশি দেখা যাবে হয়ত। কিন্তু এ অবস্থা কোনো না কোনো আকারে দেখা যাবে তথাকথিত নানা অগ্রগামী দেশেও। এর কারণ কোথাওই অদ্যাবধি ষোল-আনা বৈজ্ঞানিকতার পত্তন হয় নি, ধর্মের আমূল উৎসাদন হয় নি। হবে কি করে? ধর্মের বয়স কয়েক হাজার বছর, আর নব্য বিজ্ঞান ত মাত্র সেদিনের শিশু!

বস্তুবাদী দর্শনের ইতিহাস লেখক অধ্যাপক সেরিংগার বলেছেন, শিক্ষিত ও বিচারশীল মানুষের মনেও যে ধর্ম জিনিষটা অদ্যাবধি টিঁকে আছে, অন্তত মরি মরি করেও মরেনি, তার মুখ্য কারণ বিজ্ঞানের রাজ্যে মানুষ আজো একটা বড় বাধা জয় করতে পারেনি। সে প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেনি তার বীক্ষণাগারে, পুনরুজ্জীবিতও করতে পারেনি সত্যিকার মৃতকে। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর রহস্যই জীইয়ে রেখেছে ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বর আছেন বলেই, তাঁকে কেন্দ্র করে প্রচারিত নৈতিক ও সামাজিক বিধি-বিধানগুলিও চলিত রয়েছে। এই রহস্যের যবনিকা যদি কোনোদিন উন্মোচিত হয়, তাহলে সেদিনই পুরানো ঈশ্বরাত্মিক ধর্মবোধ সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়বে। আর তা যে আগামী কোনো দিন হবেই, তার আভাসই কি পাওয়া যাচ্ছে না আজকের মননশীল মানুষের সন্ধিৎসায়?

সেরিংগারের এই দুঃসাহসিক মতের মূল্য যাচাই করা আমার কাজ নয়। তবে ঘোষণাটির মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরার জিনিষ একটুও নেই, এমন কথা হয়ত কেউ বলবেন না। কারণ দেখতে পাচ্ছি গ্রন্থি পরিবর্তন করে মানুষকে দীর্ঘ দিন বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে বলছেন বিশেষজ্ঞেরা এবং বানরগ্রন্থি মানবদেহে সংযোজনের পরীক্ষাও চলছে। এ পরীক্ষার ফলাফল যাই হক, কতকগুলি ওষুধ এবং শল্য চিকিৎসার উন্নতির ফলে এখনি অকালমৃত্যু ঢের কমেছে পৃথিবী থেকে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, কলেরা, রক্ত-আমাশয়, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদি রোগে চিকিৎসা হলে এখন আর মানুষ মরে না। যক্ষ্মা অনেকটা এবং ক্যান্সারের

কিছুটাও আজ মানুষের আয়ত্তে এসেছে। হৃদরোগ এবং রক্তচাপও এমনকি, এইডস নিয়ন্ত্রণের লক্ষণীয় চেষ্টা চলেছে পৃথিবীতে। এসবের ফলেই দেখা যাচ্ছে, সত্তর আশী পর্যন্ত মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা আজ খুব একটা দুঃসাধ্য কিছু নয়। মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডে শল্যকর্ম এবং গ্রন্থি পরিবর্তন ব্যাপক ভাবে চলিত হলে, একশো বছর পর্যন্ত বাঁচা হয়ত অতি সহজ ব্যাপার হবে প্রতি মানুষের জীবনে। বলা যেতে পারে, এগুলি বিজ্ঞানের ব্যাধি ও জরা জয়ের সংগ্রাম। পুরোপুরি মৃত্যুবিজয়ের সংগ্রামও সুরু হয়েছে, যার পরীক্ষা হয়েছে সদ্যমৃত কুকুরের দেহে প্রাণ সঞ্চার করার প্রায় সফল প্রাথমিক প্রয়াসে।

একদিকে যেমন মৃত্যুর বিরুদ্ধে চলছে যুদ্ধ, অন্যদিকে তেমনি জন্মের আদি রহস্য উদ্ঘাটনেরও পর্যাপ্ত চেষ্টা চলেছে। এক শতাব্দী আগেই বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, বস্তু বা অজৈব পদার্থ থেকেই প্রাণের উৎপত্তি এবং সে প্রাণ ঈশ্বরানুগ্রহে নয়, ক্রমবিকাশের ধারায় অভিব্যক্ত হতে হতেই বর্তমান অবস্থায় এসেছে। প্রাণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে প্রটোপ্লাজম-এর তত্ত্বকেও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তাঁরা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই সন্ধানকেই আরো ঢের দূর এগিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান। রুশ প্রাণতত্ত্ব গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ ওপারিন বলেছিলেন, প্রাণ বস্তুটা একটা মিশ্র জাতের রাসায়নিক পদার্থ এবং কতকগুলি অজৈব উপাদান একত্র মিলেই এই সজীব ও সচল পদার্থটি সৃষ্টি হয়েছে। সেই মূল উপাদানগুলির সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন কৃত্রিম উপায়ে মানুষের বীক্ষণাগারেই কোনদিন প্রাণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রাণের অনুরূপ স্পন্দন তিনি কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের সম্মেলন থেকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলেও দাবী করেছেন।

এই গবেষণার পূর্ণ সফলতার দিকে জিজ্ঞাসু মানুষরা যে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকবেন, এ ত বলাই বাহুল্য। কিন্তু সৃষ্টির পিছনে স্রষ্টার অচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে মানুষের যে চির-কালের প্রত্যয়, এর ফলে তা কি আর টিঁকবে? আর তা যদি না টেঁকে, তাহলে কি করে টিঁকবে আত্মা, অদৃষ্ট ও জন্মান্তরের প্রত্যয়? কাজেই ভূমিকম্পে যেমন করে বিরাট প্রসাদ ধ্বসে পড়ে, ঠিক তেমনি করেই ধ্বসে পড়বে হয়ত সুপ্রাচীন আধ্যাত্মি-কতার সৌধ, বিজ্ঞানের বিপুল বাহু-আস্ফালনের ফলে। অন্তত এমন আশঙ্কা করার যথেষ্টই হেতু আছে। আসলে আধ্যাত্মিকতার জন্ম হয়েছিল কি করে? জগৎ ও জীবনের বেশীর ভাগ রহস্য মানুষ যেদিন বুঝতে পারেনি, সেদিন সে কল্পনায় তৈরি করেছিল অমিত শক্তিধর দেবতাদের এবং জৈব পিতা-মাতার অনুকল্প রূপে তাঁদের প্রতীক তৈরি করে পূজা ও স্তবস্তুতিতে তুষ্ট করতে চেয়েছিল তাঁদেরকে। এই থেকেই গড়ে উঠেছিল রকমারি সামাজিক ও নৈতিক আচার সংস্কার। ক্রমে যত বুদ্ধির স্ফুরণ হয়েছে মানুষের, ততই বিচিত্র দেবতার সমাবেশে গঠিত এক আদি দেবতার ধারণা জেগেছে তার মনে। আর শ্বাস, প্রাণায়াম, যোগ ও তপশ্চর্যার বিচিত্র জটিল-

পথেই তাঁকে জানা ও বোঝার উদ্যম হয়েছে দেশে দেশে।

আদি যুগের এই সরল বিশ্বাসই সভ্যতার ক্রমোন্নতির যুগে অনুমোদিত প্রত্যয়ে পরিণত হয়েছে এবং তার প্রতি আনুগত্য সমাজ ও রাষ্ট্র সমর্থন করেছে এই কারণে যে, তার দ্বারা বর্তমান ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখা সুবিধাজনক হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এবং তা তুলেছেন প্রাচীন দিনেই চার্বাকপন্থীরা, বৌদ্ধ নৈয়ায়িকরা, গ্রীক এগনষ্টিকরা, আরব আলকেমিস্ট ও ইহুদী তাত্ত্বিকরা। বার বার নাড়া দিয়েছেন তাঁরা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির কাঠামোকে। তাঁরা বলেছেন, জড় থেকেই প্রাণের উদ্বর্তন এবং প্রাণেরই জড়ে প্রত্যাবর্তন মৃত্যুতে। এই সিদ্ধান্তেরই ফলিত নিরীক্ষা শুরু হয়েছে আজ। বিজ্ঞান আজ অনেক রুদ্ধ দরজা খুলেছে জ্ঞানের। দেশ-কালের সীমা প্রায় মুছে এনেছে। পথ উন্মুক্ত করেছে গ্রহান্তর যাত্রার। জড়ের ভেতর থেকে অসীম শক্তিশালী পরমাণুকে বের করে বিভাজন করেছে। কাজেই জন্ম-মৃত্যুকেও কোনো দিন হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে সে, এমন সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই? বলা দরকার, সেদিন আজকের এই চলতি ধর্মগুলো থাকবে না, তার জায়গায় আসবে মহান মানবতা ও সত্যবোধ সম্পন্ন এক সার্বভৌম বন্ধন ; আর তাই হবে সেদিনের ধর্ম।

জেন্দ আবেস্তা আলোকরূপী আহুর মাজদা বা মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন তমোময় শয়তানকে, যার নাম আরহিমান। পৃথিবীতে এই দুই শক্তির নিরন্তর যুদ্ধ চলছে, আর তার ফলেই পাপপুণ্য ও শুভাশুভের স্রোত অফুরন্ত গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। আবেস্তা বলছেন, এই আরহিমানের অশিব আকর্ষণ সবলে অতিক্রম করে আহুর মাজদার দিব্য দ্যুতিতে অবগাহনই হল জীব-জীবনের শ্রেয় লক্ষ্য।

শিব-অশিবের এই দ্বৈত প্রতিনিধিত্বের ধারণা থেকেই এসেছে ঈশ্বর ও শয়তানের পরিকল্পনা এবং ইহুদী খ্রীস্টীয় ও ঐসলামিক ধর্মশাস্ত্রে তারা যথাক্রমে পুণ্য ও পাপের নিয়ামকরূপে স্বীকৃতির আসন দখল করে নিয়েছে। যা-কিছু সৎ মহৎ ও কল্যাণপ্রদ, তারই পিছনে আছে ঈশ্বরের দ্যোতনা, যা-কিছু অশুচি অসুন্দর ও দুঃখদায়ক, তাই শয়তানের চক্রান্তসম্ভূত…এই ভাবেই বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছেন তাঁরা সংসারের ভালমন্দকে।

খ্রীস্টানধর্ম অনুসারে কি করে পাপ প্রথম মানুষকে স্পর্শ করল তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে বাইবেলের পুরানো বিধান অংশে। দেখা যাচ্ছে শয়তানের প্ররোচনায় জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়ে আদি জননী ইভ অনুভব করলেন যে তিনি নারী এবং আদমের সঙ্গে সর্বাংশে তিনি সমরূপা নন। এই বোধ বা উপলব্ধির প্রথম ধাপ হল তাঁর অনাবৃত দেহ ঢাকতে চাওয়া। অর্থাৎ আদি জ্ঞানই হল যৌনচেতনা, যা জৈব অস্তিত্বের আদ্যাশক্তি স্বরূপ এবং লক্ষণীয় যে খ্রীস্টীয় নীতিবাদ তাকেই পাপের বীজরূপে গণ্য করেছে।

ইহুদীরাও আদম ইভের কাহিনীটি গ্রাহ্য করেন, করেন মুসলীমরাও। অর্থাৎ বাইবেলের পুরানো বিধানের জেনেসিস বা সৃষ্টিতত্ত্বটি ওঁদের সবারই ধর্মপ্রত্যয়ের সাধারণ ভিত্তি। তাই আদি পিতামাতার যে জৈব মিলন থেকে মানব জাতির উৎপত্তি হল, তাকেই ওঁরা পৃথিবীতে প্রথম পাপের পত্তন বলে গণ্য করেছেন। এই 'পাপ' পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে মানুষের জগতে এবং এই মূল উৎস থেকে লৌকিক সংসারের অন্যান্য পাপ শক্তি সঞ্চয় করেছে। কারণ পাপের যিনি নাকি নিয়ামক বা প্রিজাইডিং ফ্যাক্টর, ঈশ্বরের মতই তিনিও সদাই জাগ্রত।

ইহুদী ধর্মের কর্মকাণ্ড বা আচরণ-বিধি বর্ণিত হয়েছে যে তালমুদ গ্রন্থে, তার গেহানা অধ্যায়ে বলা হয়েছে কাম বা কামনাই হল গেহানার [অর্থাৎ গুণাহের] গোড়ার সোপান এবং পুণ্যবানকে এই কামনার বেড়াজাল এড়িয়েই যেতে হবে তৌহিদ অর্থাৎ মোক্ষের পথে। তার মানে যৌনতৃষ্ণা হল শয়তানের ক্রিয়া এবং কাম সংহারই হল শীলে ও শৌচে প্রতিষ্ঠিত হবার উপায়। সে জায়গায় পৌছলে তবেই জীবের মুক্তি। নইলে শয়তান তাকে চিরদিনই নরক যন্ত্রণা ভোগ করাবে।

এই যৌন-সংহারের দর্শন খ্রীস্টান ও মুসলীম ধর্মশাস্ত্রীরাও কবুল করেছেন। অপাপবিদ্ধ কুমারীর গর্ভে ঈশ্বরপুত্র ইমানুয়েলের যীশুরূপে জন্মানর মূল এখানে। আবার যীশুর অটুট কৌমার্য ব্রত বা ভাউ অব সেলিবেসীর মূলও এইখানে। কোরান শরীফের ভাষ্য হাদিসগ্রন্থেও বলা হযেছে কোরবানি হল আসলে কামকে [কামনার বিষয়কে] পরমাত্মার কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে নিজে নিরাসক্তি অভ্যাস করা।

অর্থাৎ হিন্দুদের মতো ব্রহ্মচর্য বা যৌন-সংহারের আদর্শ ইহুদী খ্রীস্টান ও মুসলীম ধর্মশাস্ত্রেও সম্মানার্হ হয়েছে। আর ব্যাপক অর্থে কাম বা কামনার গণ্ডী যত বড়ই হক, আসলে তার জন্ম যে যৌন চেতনার মাটি থেকে এবং উর্ধ্বায়িত হযে এই কামনাই যে শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূর্তিতে প্রকাশ পায়, আর বিপথচালিত কামনাই যে বিচিত্র অনাচার কদাচারের আকারে ফুটে বের হয, একথাও হিন্দুরাই একা বলেনি। বলেছে প্রাচ্যভূমির আরো তিনটি ধর্মই। কামবিজয়ী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মহিমান্বিত স্বীকৃতিও দিযেছে তিন ধর্মই।

কিন্তু পাপপুণ্যের দু-তরফা প্রতিনিধি হিন্দুধর্ম চিন্তায় স্থান পায়নি। হিন্দুর ঈশ্বর আলোক স্বরূপ ও মঙ্গলময় বটে, অর্থাৎ তিনি আহুর মাজদা, কিন্তু তমোগুণাশ্রিত শয়তান বা আরহিমানের সঙ্গে বিরামবিহীন সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তাঁকে জগৎ ও জীবপ্রবাহ চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। তিনি মঙ্গলই দিচ্ছেন, কল্যাণের দ্যুতিই বিকিরণ করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে এত অশুভ বা অকল্যাণ হচ্ছে কেন? হচ্ছে মানুষের স্বকীয় প্রবণতায়। এই প্রবণতার পিছনে কোন দৈবী বা দানবীশক্তির প্ররোচনা নেই।

এর জায়গায় হিন্দুজীবন চিন্তায় আছে আর একটি জিনিস। তা হল কর্মফল ও অদৃষ্ট-সম্বন্ধীয় ধারণা। হিন্দুরা বলেন পূর্ব-পূর্ব জন্মে কৃত অন্যায় বা পাপের ফলেই মানুষ অবিরাম জন্মগ্রহণ করছে এবং প্রতি জন্মে কর্মক্ষয় করে চলেছে। যেখানে কর্মের সমাপ্তি সেখানেই জন্মেরও সমাপ্তি। কিন্তু এক জন্মের পাপ ক্ষয় হবার আগেই আবার জমা হচ্ছে আর এক জন্মের পাপ এবং প্রাপ্য হচ্ছে তার জন্যে নূতন দণ্ড। কাজেই পাপ আর ক্ষয় হচ্ছে না কোনদিনই!

এই যে অন্তহীন পাপের প্রত্যয় অনড় হয়ে চেপে আছে হিন্দুর জীবনবোধের

গোড়ায়, খ্রীস্টানদের আদি পাপ [বা আদি পিতামাতার পাপ] থেকে এর তফাৎ এইটুকু যে এ হল অনাদি পাপ এবং এই পাপ থেকে মানুষের ত্রাণ নেই। জন্ম-জন্মান্তরেও এই পথে মানুষকে পরিভ্রমণ করতেই হবে। এছাড়া দুরাত্মাদের জন্যে আছে নরকবাসের ব্যবস্থা। বোধহয় এক জন্ম থেকে জন্মান্তরে যাবার পথে মাঝখানের সময়টুকুতেই কর্মানুসারে মানুষ নরক ভোগ করে, তারপর কিছুটা কর্মক্ষয় হলে আবার জন্মায়!

লক্ষণীয় যে, স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে বিশ্বাস এক-এক ধর্মে এক-এক রকম। খ্রীষ্টীয় মতে স্বর্গ হল ঈশ্বরের রাজধানী, সেখানে তিনি র‍্যাফেল মাইকেল গ্যাব্রিয়েল প্রমুখ দূতদের নিয়ে বাস করেন। এই দূতদেরই অন্যতম ছিল লুসিফার। সে ঈশ্বরের প্রতাপে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তার দণ্ড হিসাবেই ঈশ্বর তাকে নিক্ষেপ করলেন নরকের অগ্নিকুণ্ডে এবং সেখানে এসে সে হল নরকরাজ স্যাটান, যার কাহিনী মিলটনের মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে নষ্ট করে প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরকে জব্দ করার জন্যে সাপ সেজে এই শয়তানই এসেছিল ইডেন উদ্যানে আদম ইভের সামনে, আর ইভকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছিল, একথা গোড়াতেই বলেছি। এই জ্ঞানবৃক্ষের ফলরূপী আপেল এবং সর্পরূপী শয়তানের রূপকে কি বলা হচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েডপন্থী বিজ্ঞানীরা বলেছেন, সাপ হচ্ছে জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক, আর আপেল সন্তানরূপী ভ্রূণের। এ দুই চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে কিশোরী ইভের যৌবনপ্রাপ্তি ও যৌন জীবনারম্ভের বার্তাই বলা হয়েছে।

একে পাপ হিসাবে দাঁড় করান হয়েছে শুধু ব্রহ্মচর্যকে মহিমান্বিত করে দেখানর জন্যেই নয়, ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীস্টকে মানবত্রাতারূপে চিত্রিত করার জন্যেও। বিশ্বের সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে যে স্বর্গ হারিয়েছিলেন আদি পিতা-মাতা—আদম ও ইভ, মানুষ আবার তা ফিরে পেল। তার মানে সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য ও আত্মত্যাগই হল মোক্ষের উপায় এবং যীশুর ক্রুশে মৃত্যু তারই স্মারক, তাই একে বলা হয়েছে স্বর্গ পুনরুদ্ধার করা।

হিন্দুর সঙ্গে খ্রীস্টান ও মুসলমানের স্বর্গ নরক সম্পর্কীয় ধারণায় যে একটা ভিত্তিমূলক পার্থক্য আছে তা ভুলে গেলে চলবে না। খ্রীস্টান ও মুসলমানরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী নন, তাঁদের আছে প্রলয় ও কল্পারম্ভ সম্পর্কীয় ধারণা। তাঁরা বলেন চলতি দুনিয়ার সব মানুষই মৃত্যুর পর কবরে শুয়ে যুগের পর যুগ ধরে বিচারের জন্যে প্রতীক্ষা করবেন, তারপর বাজবে রোজ কেয়ামতের ভেরী এবং সবাই উঠে দাঁড়াবেন ঈশ্বরের সামনে। পুণ্যবানরা যাবেন স্বর্গে আর পাপীরা নরকে। পুরানো পৃথিবী ধ্বংস হবে, আবার দেখা দেবে নতুন সৃষ্টি, প্রতি পাঁচ লক্ষ বছরে এই ব্যাপার হবে একবার করে।

এই স্বর্গ ও নরক দুই-ই অনন্ত এবং এখান থেকে প্রস্থিতদের আর ছুটি পাবার বা মুক্ত হবার সম্ভাবনা নেই। নরকে ইবলিস বা শয়তান পাপীদের নিরন্তর যন্ত্রণা দেবে এবং সাপ ও গোসাপ সেজে পৃথিবীতে এসে সে অবিরাম পাপের আবাদ চালাতে ও মানুষকে নরকের পথে আকর্ষণ করতে থাকবে [সাপের সঙ্গে পাপের এই অচ্ছেদ্য সম্পর্কের আসল তাৎপর্য কি, তা ত আগেই বলেছি]। আর স্বর্গে পুণ্যাত্মারা থাকবেন অসীম আরামে। সুরা সাকি নর্তকীর নাকি ছড়াছড়ি সেখানে! এই সাকি বস্তুটা বাংলা সাহিত্যে সখীর চেহারা ধরলেও আসলে তা কিন্তু মদ্যবাহী সুদর্শন বালক।

হিন্দুদের স্বর্গ নরক দুই-ই আসলে এক ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। দেবতারা সবাই ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে আগুন জল ঝড় জন্ম মৃত্যু—যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপারের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। এর মধ্যে মৃত্যুর অধিদেবতা হলেন যম, নরকটা তাঁরই এক্তিয়ার-ভুক্ত। কিন্তু তিনি তাই বলে তার চরম উপরওয়ালা নন, তিনিও পরমেশ্বরের অধীন। তাছাড়া তিনি ন্যায়স্বরূপ, তাই পাপের অধিশাস্তা, পৃষ্ঠপোষক নন। বৌদ্ধধর্মে মার নামে অবশ্য এক পাপ-পুরুষের উল্লেখ আছে। সে অনেকটা শয়তানের প্রতিরূপ।

হিন্দুর আর খ্রীস্টান মুসলমানের স্বর্গ নরক, চেহারায় অবশ্য অনেকটা এক রকমই। দান্তের কাব্যে খ্রীস্টানী নরকের যে ছবি দেখা যায়, প্রায় ঐ একই ছবি এঁকেছেন হিন্দুও মুসলমানরাও। স্বর্গের আরাম আয়েসের ধারণাও তিন পক্ষেরই অনেকটা অভিন্ন। হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরা সুরা ও ঐহিক আমোদের ছড়াছড়ি। তবে ঋষিগণ পিতৃগণ এবং দেবগণের জন্যেও তার মধ্যেই পদোচিত পৃথক পৃথক স্তর আছে, যেখানে শুদ্ধাত্মারা ছাড়া আর কেউ ঢুকতেই পান না।

যাই হক আদি পাপ সম্পর্কীয় ধারণার মধ্যে পাপের মূল সংক্রান্ত ভাবনার অনুষঙ্গে হিন্দুদের বক্তব্যটা বোধহয় আর একটু পরিষ্কার করে বোঝাতে হবে। যৌন সম্পর্কটাই পাপ, অতএব জীবনটা আগাগোড়া পাপেরই প্রতিফলন এমন কথা হয়ত হিন্দুরা বলেন না। কিন্তু জন্মান মানেই পাপময় ভববন্ধনে বন্দী হওয়া, অর্থাৎ স্বর্গ থেকে স্খলিত হওয়া, একথা তাঁরাও বলেন। সেভাবেই সদ্যোজাত শিশুর কান্নাকে ব্যাখ্যা করেন তাঁরা। ঐ বন্ধনজনিত শোকের প্রথম অভিব্যক্তি বলে। তাই শমদম প্রভৃতির সাহায্যে ইন্দ্রিয়বোধকে স্তম্ভিত করে ব্রহ্মলাভকে তাঁরা বলেন ঐ বন্ধন থেকে মুক্তির উপায়।

এই শমদম প্রভৃতি গুণের অনুশীলন বলতে যে মূলত বোঝায় যৌন-সংহার, এ ত আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। কিন্তু যে বৃত্তি থেকে জীবনের উদ্ভব, তার বিরুদ্ধে এই এই জেহাদ কেন? কেন তাকে উচ্ছেদ করাকেই নৈতিক শুচিতার সপ্তম স্বর্গে উন্নীত হওয়ার রাস্তা বলে বোঝান? এই কেনোর উত্তরে হিন্দুরাও দিয়েছেন সেই একই জবাব যা দিয়েছেন ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ও মুসলীম ধর্মশাস্ত্রীরা। সে ব্যাখ্যা হল

এই যে কাম বা কামনাই হল বন্ধনের গোড়া, তা না কাটতে পারলে রাস্তা নেই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।

অবশ্য হিন্দুধর্মের সুবৃহৎ পরিমণ্ডলে শুধু যৌন সংহারের নির্দেশই নেই, তার বিপরীত আদর্শও আছে এবং তাও সমভাবে মোক্ষের সহায়ক বলে চিহ্নিত হয়েছে। বিষ দিয়ে বিষ ক্ষয় করার মত যথেচ্ছ ইন্দ্রিয়াচারের দ্বারাই নির্বেদের স্তরে পৌঁছানর কথা বলেছেন তান্ত্রিকরা। এঁদের খ্রীস্টান ও মুসলিম সহধর্মীও আছেন আলকেমিস্ট এবং মারফতী প্রভৃতি, যাঁদের দাপট মধ্যযুগে বড কম ছিল না। এখনো এইসব সম্প্রদায় একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি দুনিয়া থেকে।

আমাদের শাক্ত শৈব বৈষ্ণব বাউল সাঁই নানা ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে এই ধারা সমাজের সকল স্তরে। গৌরীপট্টে সন্যস্ত সাধনরূপী শিবকে দেখিয়ে শাক্ত ও শৈবেরা বলেন, পুরুষ-প্রকৃতির মিলনই হল সৃষ্টির গোড়ার কথা এবং যা গোড়ার কথা, শেষের কথাও তাই। অতএব জিনিসটা ঘৃণার নয়, পূজারই। বৈষ্ণবরা পুরুষার্থরূপী কৃষ্ণ ও হ্লাদিনী শক্তিরূপিনী রাধার মিলনকে ঐ একই সিদ্ধান্তের পরিপোষক বলেন। বাউল ও কর্তাভজাদের বক্তব্য আরো স্পষ্ট এবং তাঁদের মধ্যে আবার নারীবেশধারী বালক প্রকৃতিও দেখা যায়।

সুতরাং কথা এই দাঁড়াল যে কামকে উচ্ছেদ করা এবং নৈতিক শুদ্ধতায় পৌছান যেমন সব ধর্মেই বিধি হিসাবে প্রচারিত হয়েছে, তেমনি সব ধর্মেই আবার বল্‌গাহীন অবাধ যৌনাচারকে ধর্মের আবরণে ঢাকারও চেষ্টা হয়েছে। একটার প্রতিক্রিয়ায় অন্যটার উৎপত্তি সন্দেহ নেই। কোনটা আগে, কোনটা পরে তা বলা সহজ নয়। তবে অনুমান করা যেতে পারে যে আদিম সমাজের বেপরোয়া যৌন স্বাধীনতা এবং শাস্ত্র ও ধর্মের নামে তাকে শিষ্ট আচাররূপে চালানোর প্রয়াসকেই পরবর্তীকালে বাঁধার চেষ্টা হয়েছে যৌন নিরোধের অনুশাসন প্রচার করে।

হিন্দু তান্ত্রিক সহজিয়া অবধূত প্রভৃতির মত খ্রীষ্টীয় পুঁথিপত্র বা কোরান-হাদিসের দোহাইয়ে রকমারি বিকট যৌনাচারকে ধর্মীয় আচরণরূপে অনুসরণ করতেন খ্রীস্টান এবং মুসলমানদের কোনো কোনো শাখাও। সময়ের ধর্মে এইসব সম্প্রদায় আজ প্রায় বিলোপের পথে। গাঁয়ে ঘরে নিরক্ষর সমাজের মধ্যে লুকিয়ে ছাপিয়ে এখনো অল্প-সল্প আবাদ চললেও, এসব সম্বন্ধে আস্থাসম্পন্ন মানুষ আজ দুর্লভ বললেই চলে। তবে উল্টোটা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাস এবং মোক্ষ সম্বন্ধে মহিমান্বিত ধারণা পোষণ করেন এখনো অনেক শিক্ষিত মানুষই। কিছু কিছু বই কেতাবও হামেশাই প্রকাশিত হয়।

তবে সাধারণভাবে ধর্মের ক্রমিক অবক্ষয় হেতু পাপপুণ্যের সাবেকী হিসাব আজ সারা দুনিয়াতেই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এখানকার মানুষ রাজনীতিক ও সামাজিক অপরাধে বিশ্বাসবান, কিন্তু ধর্মীয় অপরাধ তাঁর কাছে অর্থহীন। তাই অদৃষ্ট

জন্মান্তর রোজকেয়ামত শয়তান স্বর্গ নরক সবকিছু নিয়ে যে পুরাতন প্রত্যয়ের ইমারত খাড়া ছিল এতকাল, তা আস্তে-আস্তে ধ্বসে পড়েছে। এখন ওসব মূলত প্রত্নবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এদের আসন আরো পিছুতে হঠে যাবে। ঈশ্বরকে আজও হয়ত বরবাদ করেনি মানুষ। কিন্তু তাঁর রং ক্রমশই ফিকে হয়ে আসছে নাকি অনেকের চোখে?

॥ ছয় ॥ হিন্দুধর্ম : ইতিহাসে এবং আচার-বিশ্বাসে

হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রধান ছটি ধর্মের অন্যতম হলেও, অন্যান্য ধর্ম যেমন কোন একটা সময়ে একজন মহাজন কর্তৃক প্রবর্তিত, আর তাদের আচার সংস্কার এবং আদেশ নির্দেশ যেমন কোনো একখানি বা দু-খানিমাত্র বইয়ে সীমাবদ্ধ, হিন্দুধর্ম তেমনটি নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজাপ্রতীক, প্রত্যয় ও রীতিনীতির সমর্থক মানুষরা যূথবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করেছেন একটি সাধারণ ধর্মীয় সংজ্ঞা, যার নাম হিন্দুধর্ম।

তাই হিন্দুর মধ্যে যেমন আস্তিক আছেন, তেমনি আছেন নাস্তিক। যেমন আকারবাদীরা আছেন, তেমনি আছেন নিরাকারবাদীরাও। একেশ্বরবাদী, বহুদেববাদী, মাতৃ-উপাসক, পিতৃ-উপাসক, পূর্বপুরুষ-উপাসক, নিসর্গ-উপাসক, বিচিত্র শ্রেণীর হিন্দু আছেন। আর তাঁদের আচার-অনুষ্ঠানেও দেখা যায় রকমারি বিশ্বাস ও অভ্যাসের বৈচিত্র্য। গৃহী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বামাচারী আমিষাশী নিরামিষাশী—অজস্র মত পথ ও আদর্শের মানুষই সমষ্টিগতভাবে হিন্দু অভিধায় পরিচিত। একই ধর্মীয় পরিচিতির মধ্যে এত রকম পরস্পরবিরোধী ধারার মানুষ দেখা যায় না অন্যধর্মে। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মের মত হিন্দুধর্মে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিবিধ কৃত্যের বিধান থাকলেও এবং করণীয় ও নিষিদ্ধের সুদীর্ঘ কর্মবিধি তালিকাভুক্ত থাকলেও, তা এমন অনতিক্রম্য করে রাখা হয়নি, যা লঙ্ঘনে কারো হিন্দুত্ব খারিজ হবে, যেমনটি হয় খ্রীস্টধর্মে বা ইসলামে।

হিন্দুধর্মের এই অত্যাশ্চর্য গ্রহণীশক্তি ও ঔদার্যই তাকে জাতীয় ইতিহাসের এত উত্থানপতন ও ভাঙাগড়ার মধ্যেও বাঁচিয়ে রেখেছে। গ্রীকো-রোমক ইউরোপের আদি হিদেন-ধর্ম খ্রীস্টধর্মের প্রাদুর্ভাবে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত পুরানো দেবদেবী ও পূজাপদ্ধতি ইসলামের প্রতাপে নির্মূলিত হয়েছে। ইজরাইল থেকে ইহুদীরা যাযাবর রূপে দুনিয়ার দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ে কোন মতে তালমুদ গ্রন্থের কিছুটা এবং তাঁদের জেহোবা-আরাধনা বাঁচিয়ে রেখেছেন। আদি ইরাণীদের যে অংশটি ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন শুধু তাঁদের মধ্যেই বেঁচে আছে আবেস্তা ও মজদা-আরাধনা। রা-উপাসক মিশরীরা আগে গ্রীকদের, তারপর রোমকদের ধর্ম

নিয়েছিলেন, তারপর কবলিত হয়েছিলেন ইসলামের দ্বারা। এখন তাঁরা আরবী গোষ্ঠীভুক্ত মুসলমান রূপে পরিচিত। হিন্দুধর্ম কিন্তু বৌদ্ধ জৈন ইসলাম ও খ্রীস্টান এই চতুর্বর্গ ধর্মীয় অভিঘাতের মধ্যেই আত্মরক্ষা করেছে।

শুধু কি তাই? উপরোক্ত চারটি ধর্মের নিষ্কর্ষ বা শ্রেয়োবস্তু সমন্বয়ী-দৃষ্টির আলোয় আত্মসাৎ করে নিয়েই হিন্দুধর্ম কালের যাত্রায় অগ্রসর হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সেবা ও সন্ন্যাসের আদর্শ এবং কর্মফল ও নির্বাণের তত্ত্ব যেমন হিন্দুধর্মের অন্তর্লোকে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তান্ত্রিকতা ও বৌদ্ধধর্মের সংমিশ্রণে আস্তে-আস্তে তেমনি সহজযান বা সহজিয়াবাদ জন্মেছে, আর এঁদের হাতে স্বয়ং বুদ্ধই রূপান্তরিত হয়েছেন ধর্মঠাকুরে। জৈনদের অনেকান্তবাদও প্রভাবিত করেছে হিন্দুধর্মকে। বিশেষ করে দিগম্বরদের দেহবন্ধন বিমুক্তির আদর্শটি নিয়েছেন নাগা সন্ন্যাসীরা। ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের ভক্তিবাদ ও ইউনিটেরিয়ানদের ব্রহ্মবাদ আংশিক অনুপ্রেরণা দিয়েছে ব্রাহ্ম-সমাজকে। আর ইসলামবাদী সুফীদের জ্ঞানপন্থা ও ভক্তিপন্থা এবং মোতাজেলদের বোধ ও বিবেকের দর্শনই রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখকে দিয়েছে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উদ্দীপনা। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে তা সত্ত্বেও হিন্দুধর্ম ষোলআনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। হিন্দুত্বের স্বাধিকার তার অব্যাহতই থেকেছে। এটাও হিন্দুধর্মের প্রাণশক্তিরই নির্দেশক।

এই জন্যেই গোঁড়া নৈষ্ঠিকরা বলেন হিন্দুধর্ম হল সনাতন ধর্ম। অর্থাৎ তার নাকি আরম্ভও নেই, শেষও নেই! তা চিরকাল থেকে আছে, থাকবেও চিরকাল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এটা বিচারশীল ব্যক্তির কাছে সমর্থনীয় নয়। যে কোন পার্থিব বস্তুর মতই হিন্দুধর্মেরও একটা আরম্ভ আছে এবং যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে। সুতরাং ও-কথা অতিশয়োক্তি ছাড়া কিছুই নয়। তবে ওই কথাটার মধ্যেই নিহিত আছে হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাস। আসলে হিন্দু কথাটাই যে ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু নয়, এ নিশ্চয় সন্ধানী মানুষরা জানেন। অনুমান করা হয় মধ্য এশিয়ার ভলগা তীর থেকে বৈদিক আর্যেরা এসে বসতি গেড়েছিলেন সিন্ধুতীরে এবং এখান থেকেই ব্যাপ্ত হয়েছিলেন তাঁরা সারা ভারতে। এই সিন্ধুকে গ্রীকরা বলেছিলেন ইণ্ডাস. তা থেকে জাতির নাম হয়েছিল ইণ্ডু, আর দেশের নাম ইণ্ডিয়া। আরবদের রসনায় ইণ্ডু হয়েছে হিন্দু এবং এদেশকে তাঁরা বলেছেন হিন্দুস্তান। অতএব দেখা যাচ্ছে হিন্দুর জাতীয় অভিধাটিই ইয়াবন বা যবন, অর্থাৎ, বহিরাগতদের দেওয়া।

কিন্তু তাঁদের নিজস্ব দেশজ নাম কি ছিল? কি ছিল সেটাই প্রশ্ন এবং সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে প্রত্ন-নৃতত্ত্বের মাটিতে। একদা ইতিহাসের পুঁথিতে বলা হত যে আর্যদের আবির্ভাবের আগে ভারতবর্ষ ছিল নিষাদ, পুলিন্দ, শবর, খস, অর্থাৎ কোল, মুণ্ডা, গোণ্ড, সাঁওতাল প্রমুখ অনগ্রসর গোষ্ঠীর অধ্যুষিত ভূমি। আর্যরাই তাতে ধর্ম-কর্ম ও আচার-সংস্কার এনেছেন। দেশ ও মানুষকে সভ্য করেছেন। একথা যে সর্বৈব

ভিত্তিহীন তা প্রমাণিত হয়েছে মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা ও লোথালে [গুজরাট] প্রাত্নিক খননের পর। এই জায়গাগুলিতে পাওয়া গেছে প্রাক্‌বৈদিক যে সভ্যতার নিদর্শন তার বয়স খ্রীঃ পূঃ ৫ হাজার বছর হলেও হতে পারে। পক্ষান্তরে বৈদিক সভ্যতা কোন মতেই খ্রীঃ পূঃ ২ হাজার বছরের উর্ধ্বে যায় না। কিন্তু মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা শুধু বয়সেই বৈদিক সভ্যতার জ্যেষ্ঠ নয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন-চর্যাতেও শ্রেষ্ঠ। বৈদিক সভ্যতা ছিল মূলত কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ সভ্যতা, তাই তার কোন প্রাত্নিক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় নি, আর মহেঞ্জোদড়ো ছিল সুসমৃদ্ধ নাগরিক সভ্যতা। তাই খননের মুখে তার পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু কি ছিল এই মহেঞ্জোদড়োবাসীদের জাতীয় অভিধা এবং ধর্মীয় আশ্রয়? বিভিন্ন বিচারে তাঁদের দ্রাবিড় বলা হচ্ছে এবং প্রাপ্ত দেবপ্রতীকগুলিতে যেহেতু পাওয়া যাচ্ছে পশুপতি শিব ও অম্বা ভবানীর মূর্তি, তাই ধরা হচ্ছে তাঁরা ছিলেন আদিতে শৈব-শাক্ত ধর্মাবলম্বী। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে আগম ও নিগম দুই শাখায় বিভক্ত তন্ত্রগুলি গোড়ায় ছিল এঁদেরই ধর্মগ্রন্থ এবং অথর্বই এঁদের বেদ। বেদকে যাঁরা ত্রয়ী বলেছেন, তাঁরা অথর্বকে বাদ দিয়েছেন। আর যাঁরা চতুর্বেদের পক্ষে, তাঁরাও অনেকে যজুর্বেদকে শুক্ল এবং কৃষ্ণ দুভাগে ভাগ করেছেন। অর্থাৎ অথর্বের স্বীকৃতি অনেক পরে হয়েছে, বোধ হয় অনার্য [অর্থাৎ প্রাগার্য] দ্রাবিড়দেরও যখন সমাজে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তখন। সেটা কবে হয়েছে এবং কি করে হয়েছে সেটাই অতঃপর বিচার্য। মহেঞ্জোদড়ো ধ্বংস হয়েছিল কারো-কারো মতে সিন্ধুনদের বন্যায়। কিন্তু আর এক পক্ষের মতে বহিরাগত আর্যদের আক্রমণে, কেননা তাঁদের ঘোড়া ছিল ও তাঁরা লোহার ব্যবহার জানতেন। মূল কারণ বোধহয় ওই দুয়ের সমাপতন।

আর্যে-প্রাগার্যে দীর্ঘস্থায়ী একটা যুদ্ধ যে হয়েছিল ভারতবর্ষে এবং পরাভূত প্রাগার্যদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত আর্যদের যে হয়েছিল একটা সমঝোতা, এটা সিদ্ধান্ত করা হয়ত অসঙ্গত নয়। এই সমঝোতা থেকেই আর্য-প্রাগার্যের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছিল হিন্দুধর্ম এবং মনে করলে ক্ষতি নেই যে দেবকীনন্দন বাসুদেব, যাঁকে পুরাণে কৃষ্ণ বলা হয়েছে, এই কাজে নেতৃত্ব করেই লোকাবতার রূপে পূজ্য হয়েছিলেন। আর্যাবর্তের সভ্যতা দক্ষিণে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রাম, আর আর্যে ও আর্যেতরে মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন কৃষ্ণ। তাই তাঁরা এদেশে পুরাণপুরুষ বা ঈশ্বরকল্প ব্যক্তিরূপে পূজায়তনে স্থান পেয়েছেন, শাস্ত্রেও কীর্তিত হয়েছেন। এই সংমিশ্রণের ফলেই আর্যদের বিবিধ নিসর্গদেবতা ও তাঁদের আদিকারণ ব্রহ্মকে আড়াল করে শিবশক্তি ও কৃষ্ণের আরাধনা হিন্দু পূজায়তনে সগৌরবে প্রবেশাধিকার লাভ হয়েছে। বেদোপনিষদের ওপর প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে তন্ত্র এবং পুরাণের। আর বেদবিধির প্রতিকূলে স্মৃতির সার্বিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজে।

তত্ত্বজ্ঞানের কথা উঠলে অবশ্য আমরা উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করি। কিন্তু ঘরে বসে পূজা করি শিব, শক্তি ও কৃষ্ণ থেকে সুরু করে শীতলা, ষষ্ঠী. মনসা পর্যন্ত রকমারি দেবদেবীর। দোহাই পাড়ি সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য, যোগসাধনা ও পরামুক্তির। মহিমান্বিত ব্যাখ্যা দিই সাধু মোহন্তদের জীবন ও কার্যকলাপের। কিন্তু কার্যত নিজেরা প্রচণ্ডভাবে সংসার করি এবং কোন রকম অনাচার অনৌচিত্যেই কার্পণ্য করি না। মুখে সর্বজীবে ব্রহ্ম, জীবই শিব, নরই নারায়ণ আওড়াতে আমাদের উৎসাহের অন্ত থাকে না। কিন্তু বাস্তব জাতিভেদের কদর্যতাকে মেরেও মারতে পারিনি আজও। আজও অস্পৃশ্যতাকে আঁকড়ে আছি অনেকেই আমরা। এই যে চিন্তায় ও অভ্যাসে, প্রত্যয়ে ও প্রতিষ্ঠানে বিরোধ আমাদের, এব সবটুকুকেই আমবা হিন্দুয়ানির অংশ মনে করি এবং কোনটাকেই বর্জনীয় ভাবি না। কাজেই বিশুদ্ধ হিন্দুত্ব যে কি তা বোঝা এবং বোঝান সত্যিই কঠিন।

খাদ্য পানীয়, আচার অভ্যাস, বিশ্বাস সংস্কার, যে কোন লৌকিক ব্যাপার নিয়েই এই রকম স্ববিরোধিতর শত-শত দৃষ্টান্ত হাতে পাওয়া যাবে। এক জনের কাছে যা শ্রেয় পন্থা, আর এক জনের কাছে তা গুরুতর প্রত্যবায়। একজন যাকে বলে সদাচার, অন্যের কাছে তা কুৎসিত কদাচার। কেউ নারীসঙ্গপরিহারকে আত্মিককল্যাণের শ্রেষ্ঠ উপায় বলেন, অন্যজন বীভৎস কামাচারের আনুগত্য করেন তাকেই মোক্ষানুসন্ধানের উপায় ভেবে। কোন সম্প্রদায় অহিংসার সহায়ক জ্ঞানে পিঁপড়ের গর্তে চিনি দেন, কোন সম্প্রদায় মহা উৎসাহে জীববলি দিয়ে দেবকার্য করেন: আগে নরবলিও দিতেন। বিবাহে, অন্ত্যেষ্টিকর্মে, বৈধব্যে, এক-এক জাতিগোষ্ঠীর রীতিনীতি এক-এক রকম। কেন এমনটা দেখা যায় হিন্দুদের মধ্যে? যায়, তার কারণ নানা সময়ে নানা নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-সংস্কারসম্পন্ন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ একত্র মিশেই হিন্দুত্বের বনিয়াদ তৈরি করেছেন। তার মানে হিন্দুধর্মের পর্যাপ্ত গ্রহণীশক্তি সকলকেই নিয়েছে, কারোকে বাদ দেয়নি; আর, সব কিছুকেই হিন্দুত্বের সনদ দিয়েছে।

এই আলোচনায় শুধু আর্য ও প্রাগার্য সংমিশ্রণের কথাই বলা হয়েছে। প্রধান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী অবশ্য এ দুটিই, যা হিন্দুদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যে সংমিশ্রিত হয়েছে নানা আদিবাসী গোষ্ঠীও, যার ফলে অস্ট্রো-কোল, ভোট-চীন গোষ্ঠী এবং নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর নানান প্রত্যয়, প্রতীক ও আচার-অভ্যাস নিঃশব্দে হিন্দুত্বের পোষাকে আত্মগোপন করেছে। সাপ, বাঘ ও কুমীরের পুজো, হলুদ, তেল, সিঁদুর, মাছ, পান, সুপুরি ও নারকেলকে মঙ্গলোপচার রূপে ব্যবহার, অথবা জাতকর্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি, হলকর্ষণ, প্রভৃতি নানাকৃত্যের সঙ্গে জড়িত অসংখ্য স্ত্রীআচারের প্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, এগুলো রকমারি আদিম অভ্যাসের অনুবৃত্তি ছাড়া

কিছু নয় এবং এগুলো এসেছে বিবিধ আরণ্যক গোষ্ঠীর কাছ থেকেই, যাঁদের পূর্বপুরুষরা একদিন নিষাদ, কিরাত ও পুলিন্দ নামে অভিহিত ছিলেন। আজ তাঁরা হিন্দু রূপে বেদ বেদান্তের দোহাই দেন, অথচ পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসও ছাড়তে পারেননি, অনেকক্ষেত্রেই।

এই যে বিচিত্র জটিলতার গোলকধাঁধা, এর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের কাঠামো। নানাদিকদেশাগত জাতিগোষ্ঠীর মানুষকে একত্র করেই ধীরে-ধীরে এর প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ নাগাদ। তাই এতে গোড়া থেকেই গড়ে ওঠেনি কোন রকম একাত্মতা। মাথার ওপর শুধু বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞের একটা ধোঁয়াটে প্রভুত্ব দাঁড় করান হয়েছিল, যদিও তার নীচে ছিল হাজারো রকম আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি। এই প্রভুত্ব নস্যাৎ করে আচারভিত্তিক নিরীশ্বর দুটি ধর্ম স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন মহাবীর ও বুদ্ধ যথাক্রমে [খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দে]! কিন্তু পারেন নি। বুদ্ধের আদিধর্ম আবিল হতে-হতে শেষপর্যন্ত হিন্দুধর্মের মধ্যেই বন্দী হয়ে গেছে। আর মহাবীরের ধর্ম ক্রমশ হিন্দু সনাতন ধর্মের কাছাকাছি এসে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। পরে মনু খ্রীঃ ১ম শতকে একাত্মিক একটি ছাঁচ তৈরির চেষ্টা করেছেন হিন্দুধর্মের। আর একটি বস্তুবাদী ছাঁচ দেবার চেষ্টা করেছেন চার্বাক ও কেশকম্বলী। কোনটাই সফল হয় নি। সফল হয়নি কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে বর্ণ-হিন্দুদের কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াসও। কিন্তু সব কিছুরই একটু-না-একটু অংশ এতে জড়াজড়ি হয়ে গেছে হিন্দুত্বের সঙ্গে।

তারপর ইসলাম এসে [১২শ শতক] ধূলিসাৎ করার চেষ্টা করেছে হিন্দুধর্মের ইমারত। পীড়নে প্রলোভনে এবং বর্ণহিন্দুদের প্রতি প্রতিহিংসাবশে বেদের আমল থেকেই যাঁরা শূদ্রদাস ও অস্পৃশ্য রূপে অশেষ নিগ্রহ ভোগ করেছেন, সেই অবনমিত হিন্দুরা দলে-দলে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। একই ব্যাপার ঘটেছে খ্রীস্টানদের [১৮শ শতক] আগমনেও। পরিণামও দুইয়েরই এক হয়েছে। মুসলমান ও খ্রীস্টানরূপে সংখ্যাল্পশ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে দেশবাসীর মধ্যেই। আর দুই ধর্মের তাত্ত্বিক ঐশ্বর্য [সমধর্মিতার জন্যে অথবা নূতনত্বের জন্যে] ধীরে-ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে হিন্দুধর্মে। কাজেই হিন্দুধর্ম বলতে নির্দিষ্ট একটা ধর্মও বোঝায় না, হিন্দু-আচার বলতে নির্দিষ্ট কোন জীবন-প্রত্যয়, আচরণ-বিধি বা পূজা-পদ্ধতির একত্বও বোঝায় না। বিদেশীর পক্ষে তাই এ ধর্মের তত্ত্ব ও ফলিত কোন অংশই সহজবোধ্য নয়। রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ যাঁরা বাইরের দিকে চোখ রেখে হিন্দু ভিউ অব লাইফ, হ্যাণ্ডবুক অব হিন্দু কালচার পর্যায়ের বই লেখেন, তাঁদের পরিক্রমা নিতান্তই ওপর-ওপর। ম্যালিনাউসকী, ফ্রেজাররা এদেশে হন নি, দুর্ভাগ্যটা আমাদেরই।

□

॥ রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত-এবং-ভগবদ্‌গীতা : সংস্কৃতিতত্ত্বের মূল্যায়নে ॥

।। এক ।। রামায়ণ-বিতর্ক

রামচন্দ্র বলে সত্যিই কেউ ছিলেন কিনা, সত্যি-সত্যিই সীতাহরণ, লঙ্কা-অবরোধ ও রাম-রাবণে যুদ্ধ হয়েছিল কিনা, বাল্মীকি সত্যিই কোন কবির নাম কিনা, তাঁর নামে প্রচলিত রামায়ণ তাঁরই লেখা ও যথেষ্টই প্রাচীন কিনা এবং রামায়ণ মৌলিক গ্রন্থ অথবা স্বদেশী বিদেশী বিবিধ গ্রন্থের প্রভাবে রচিত কিনা, এসব তর্ক খুব নূতন নয়। উনিশ শতকের ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌রা প্রথম এই সব তর্ক তোলেন। বিশ শতক পর্যন্ত চলে তারই ঢেউ। তারপর ভারতীয় পণ্ডিতরাও ক্রমশ আগ্রহী হযেছেন বিষয়টি সম্বন্ধে এবং বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। ইদানীং প্রসঙ্গটি আবার নূতন করে গুরুত্ব লাভ করেছে এবং উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম বাংলায় এক দিকে যেমন প্রত্নেতিহাসের আলোয়, অন্য দিকে তেমনি দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের নিরিখে প্রশ্নটির মূল্যও যাচাই হচ্ছে। শুভবুদ্ধি-প্রসূত আলোচনাও অনেক হচ্ছে, আবার অনেক হচ্ছে গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি প্রণোদিত বাকবিতণ্ডাও। এ অবস্থায় সহজ বুদ্ধির সিদ্ধান্ত পেশ করা মুস্কিল যদিও, তবু সে চেষ্টাই করা যাচ্ছে এই পরিচ্ছেদে বিভিন্নভাবে। গিলবার্ট মারো গ্রীক সাহিত্যের সম্পাদন ও অনুবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন কোন বিষয়ে মত-ভেদ, কোন-কোন বিষয়ে মতৈক্য এবং সর্ব বিষয়ে উদার সহনশীলতাই হল প্রাচীন সাহিত্যের কাল, প্রকৃতি ও গুণাগুণ বিচারের অনন্ত মাপকাঠি। তা থেকে স্খলিত হলে শুধু তর্কই ফেনায়িত হবে, সমাধানে পৌছান যাবে না।

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে রচনার দিক থেকে কোনটি বেশী প্রাচীন এবং এই দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে সত্যকার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, তা নিয়ে বিদেশী ভারততত্ত্ববিদ্‌রা ইতিপূর্বে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন। সম্প্রতি বিষয়টি দেশেও ইতিহাসবিদ্ এবং প্রত্নতাত্ত্বিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রচলিত হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী রাম ত্রেতায় এবং কৃষ্ণ দ্বাপরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং রামকথা কৃষ্ণকথার আগেই শাস্ত্রাকারে প্রচারিত হয়েছিল। তাছাড়া মহাভারতে রামায়ণের কোন-কোন প্রসঙ্গ উল্লিখিতও হতে দেখা যায়। সুতরাং তাঁদের মতে রামায়ণই প্রাচীনতর। কিন্তু ভাষার বিচারে রামায়ণের রচনারীতি যত প্রাঞ্জল, মহাভারতের তা নয়। রামায়ণে

বর্ণিত সমাজের নৈতিক মানদণ্ড যত উন্নত ও পরিচ্ছন্ন মহাভারতের তাও নয়। কাজেই অনেকে মনে করেন রামায়ণের ঘটনা মহাভারতের পূর্ববর্তী হলেও, রচনা পরবর্তী কালের। অবশ্য এ সম্বন্ধে ভিন্ন মতও আছে। কোন-কোন পণ্ডিত বলেছেন, রামায়ণের আদিতে ছিল অন্য রকম চেহারা, সম্ভবত তা লেখাও হয়েছিল কোন অধুনালুপ্ত ভাষায়। তারপর উত্তর ভারতে যখন রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার রূপে পূজিত হতে সুরু করেছেন, তখনই রামায়ণ সংস্কৃতান্বিত হয়েছে এবং সেটা হয়েছে ঢের পরে। তাই তার ভাষায় এসেছে এতখানি সারল্য। বস্তুত এ নিছক আনুমানিক সিদ্ধান্ত এবং এর সমর্থনে কোন জোরালো যুক্তি উপস্থিত করা কঠিন। তবে আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে রামায়ণের ঘটনা যে মহাভারতের আগে ঘটেছিল, তা কিছুটা ধারণা করা যায়। যদিও এর রচনা কোন সময়ের এবং সমগ্র সপ্তকাণ্ডের রচয়িতা বাল্মীকিই কিনা, তা নিশ্চিত করে বলা মুস্কিল। স্বয়ং বাল্মীকি রামায়ণের আখ্যানাংশের সঙ্গে যে রকম ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তাতেই শেষোক্ত সন্দেহটি বদ্ধমূল হয়।

মোটের ওপর প্রত্নেতিহাসবিদ্‌রা মনে করেন বৈদিক আর্যেরা মধ্য এশিয়ার ভল্গা তীরবর্তী কোন অঞ্চল থেকে ভারতে এসে প্রথম সিন্ধু উপত্যকা ও পাঞ্জাবে উপনিবেশ গড়েন। সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে সমগ্র উত্তরাপথ অধিকার করেন, তারপর বিন্ধ্য বলয় অতিক্রম করে হানা দেন দাক্ষিণাত্যে এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উপনীত হন সিংহলে। আর্য ভারতের সেই দক্ষিণাভিমুখী অভিযানে হয়ত নেতৃত্ব করেছিলেন প্রাগৈতিহাসিক কোন এক নরপতি, যাঁর নাম রাম এবং তাঁরই মহিমা কীর্তিত হয়েছে রামায়ণে। এ ঘটনা ঘটে থাকতে পারে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দে। মহাভারতের ঘটনা নিশ্চিতই এর পরে ঘটেছে। আর্যেরা যখন সারা দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন তাঁদের মধ্যে ভৌমিক ও রাজনীতিক প্রভুত্ব নিয়ে বেধেছে স্বার্থসংঘাত, যা ফেনায়িত হয়েছে কুরুক্ষেত্রের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে। এই যুদ্ধে অবক্ষয়িত ক্ষাত্র শক্তিকে আত্মস্থ করে এবং আর্য-অনার্যে সংহতি স্থাপন করে হিন্দু ভারতের ভিত্তি স্থাপন করেন হয়ত রামেরই মত প্রাগৈতিহাসিক কোন নেতা, যাঁর নাম কৃষ্ণ, যাঁকে দেবকীনন্দন বাসুদেব বলা হয়েছে উপনিষদে এবং যাঁর বাল্য বর্ণিত হয়েছে ভাগবতে। যৌবন মহাভারতে, আর সমাপ্তি খিল হরিবংশে। কৃষ্ণের অভ্যুদয় হয়ত ঘটেছে রামের দুই শতাধিক বছর পরে। অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতের আদি কাঠামোতে বেশ কিছুটা ইতিহাসের মালমশলা আছেই, যা উপকথা, গালগল্প ও কবি কল্পনার ডালপালায় আচ্ছন্ন হয়ে ধরেছে পরবর্তী কালে দুটি বৃহৎ মহাকাব্যের রূপ। আসলে অতীতের দুই কীর্তিমান বীর বলেই রাম ও কৃষ্ণ অভিহিত হয়েছেন ঈশ্বরপুরুষ নামে। তারপর ক্রমশ ভক্তিবাদের প্রভাবে তাঁদের স্থান হয়েছে পূজায়তনে এবং সীতারাম ও রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি ধ্যানে ও কাব্যে গানে প্রকীর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। অবশ্য রাধা ও কৃষ্ণকে

আশ্রয় করে পরে যেমন জন্মেছে গৌড়ীয় প্রেমভক্তি দর্শন, সীতা ও রামকে নিয়ে তা কিন্তু হয় নি।

রামতত্ত্ব বলে তাই কোন তত্ত্ব নেই।

রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা এবং তাদের সম্ভাবিত সময়ে কাল নিয়ে যথাক্রমে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা থেকে কি সিদ্ধান্ত দাঁড়াবে, তা পূর্বাহ্ণে অনুমান করে লাভ নেই। সহজ বুদ্ধি বিচারে এখনো পর্যন্ত যতটুকু বলা সম্ভব, আপাতত আমি শুধু সেই কথাই বলেছি। ইলিয়াড এবং ওডিসির বিষয়বস্তু নিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতরাও অনুরূপ ভাবেই ভাবনা চিন্তা করেছেন।

তাঁরা বলেন, গ্রীক ও ট্রোজানদের মধ্যে যে একটা যুদ্ধ হয়, আর সেই যুদ্ধে যে ট্রয় বিধ্বস্ত হয়, এটুকু নিশ্চিতই ঐতিহাসিক ঘটনা, যেমন কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে ইউলিসিজের পর্যটন বিবরণেরও। খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দ নাগাদ এই সব ঘটনাই হয়ত হোমর নামক কোন কবির হাতে লোকগাথায় রূপান্তরিত হয়, যা পরবর্তী কবিদের দ্বারা পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের ফলে বর্তমান মহাকাব্য দুটির আকার পেয়েছে। অবশ্য ইতিহাস বলতে এখানে মূল আখ্যায়িকার কঙ্কালটুকুই বুঝতে হবে। অলৌকিক উদ্ভট বা অবিশ্বাস্য যা কিছু ব্যাপার বৃত্তান্ত-স্থান পেয়েছে কাব্যে, তা সত্যি নয়। প্রাচীন ভারতে বিমান ছিল, বেতার ছিল, পারমাণবিক অস্ত্র ছিল, ভূগর্ভবাহী লৌহবর্ত্ম ছিল, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ছিল, দশমুণ্ডধারী মানুষ ও কথা-বলা বানর ছিল, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী থেকে এই সব যাঁরা আবিষ্কার করেন, কিংবা যাঁরা মনে করেন অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিচলিত হয়েছেন, স্বয়ং ভগবান তাঁকে চাঙ্গা করার জন্যে তখন সত্যিই আঠার অধ্যায় গীতা শুনিয়েছিলেন, তাঁদের ইতিহাস বিচারের মাপকাঠি বাস্তবভিত্তিক নয়।

আমি বলছি সেই ইতিহাসের কথা, যা প্রকৃত মানববৃত্ত এবং ষোলআনা বিজ্ঞান-সম্মত। রামায়ণ ও মহাভারত নিছক কাব্যকাহিনী নয়, প্রাণবন্ত ইতিহাস এই নিরিখ অনুসারেই।

২.

রামায়ণ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যখন উত্তর ও মধ্য ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসবিদ্‌রা ভীষণভাবে মাথা ঘামান সুরু করেছেন, কুরুক্ষেত্র হস্তিনাপুর অযোধ্যা ও মিথিলা প্রভৃতির সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে খোঁড়াখুঁড়ি চলছে বিপুল উৎসাহে, ঠিক তখনি কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামায়ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এতে তিনি তিনটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত পেশ করেন একে একে। তাঁর সিদ্ধান্তগুলি হল যথাক্রমে এই রকম : রামায়ণ গ্রন্থটি আদিতে

বাল্মীকির লেখা নয়, তার লেখক চ্যবন। রামায়ণ মূলত পালি দশরথ জাতক ও জৈন রামকথা অনুসরণে লেখা। উপরন্তু তার সঙ্গে হোমরের ইলিয়াড মহাকাব্য তুলনীয়। সর্বশেষ কথা রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার রূপে কীর্তিত ও পূজিত হয়েছেন খ্রীস্টীয় ৭ম-৮ম শতাব্দী নাগাদ কোন সময়ে। তাঁর তিনটি সিদ্ধান্তই হয়েছে ভিমরুলের চাকে ঘা দেওয়ার মত। ভারততত্ত্ববিদ্‌রা ক্রুদ্ধ হয়েছেন আদিকবি বলে কথিত বাল্মীকিকে বাতিল করায় এবং তাঁর মৌলিকতা নামঞ্জুর করে তাঁকে জাতক ও ইলিয়াডের অনুকারী বলায়। ইতিহাসবিদ্‌রা ক্ষুব্ধ হয়েছেন রামায়ণকে মহাভারতের পরে ঠেলে দেওয়ায় এবং তার কাহিনী অংশটি নিছক কল্পনানির্ভর বলায়। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন গোঁড়া ভক্তেরা আহত হয়েছেন রামচন্দ্রের অবতারত্বে সন্দিহান হওয়ায় এবং তাঁকে ত্রেতা থেকে কলিযুগে নামিয়ে আনায়। অসন্তুষ্ট তিন পক্ষই তাই প্রবন্ধে নিবন্ধে স্ব-স্ব অভিমত ব্যক্ত করতে সুরু করেছেন এক সঙ্গে, যার ফলে বিদ্বৎসমাজে রীতিমত একটা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই যুদ্ধে হাত মেলানর আকাঙ্ক্ষায় নয়, সাধারণ বিচার বুদ্ধির আলোয় বিতর্কটির স্বরূপ নির্ধারণের জন্যেই পুনরায় প্রসঙ্গটির পর্যালোচনা করছি।

দশরথ জাতকের প্রসঙ্গটাই আগে নেওয়া যাক। জাতক গ্রন্থগুলি কবেকার রচিত? নিশ্চিতই প্রভু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অনেক পরে। ভাষার নিদর্শন থেকে ওগুলিকে প্রায় গুপ্ত সম্রাটদের সমকালীন রচনা বলে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ ওরা খ্রীস্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকের কিছু আগে পরের লেখা। আর জৈনদের প্রাকৃত রামায়ণও মোটা-মুটি তাই। কিন্তু রামকাহিনী কি অত অর্বাচীন? আমার ধারণা তা মোটেই নয়। কেন নয় তা আমি আগেই দেখিয়েছি। উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট বৈদিক আর্যদের দক্ষিণমুখী অভিযানের কাহিনীই হল রামায়ণ। দক্ষিণের আর্যেতর, অতএব রাক্ষস নামে অভিহিত গোষ্ঠীর রাজা রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ এবং রামচন্দ্রের নেতৃত্বে আর্যদের লঙ্কা অবরোধ, যুদ্ধ এবং সীতা-উদ্ধার হল তার বিষয়বস্তু। এ ঘটনার অন্তরালে যত ক্ষীণই হোক, ঐতিহাসিক কাঠামো একটা আছেই এবং তা অন্যূন খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দের ঘটনা। রামায়ণের মূল ছাঁচটা তৈরি হয়েছে নিশ্চিতই তার দু-তিনশো বছর পরে। অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১১শ-১২শ শতাব্দে। তারপর লোকগাথা হিসাবে ভাসতে-ভাসতে তা ছড়িয়েছে সারা দেশে এবং বিভিন্ন যুগের সংযোজনে তা-ই হয়েছে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। এই সংযোজনের পথেই কোন কল্পনাকুশলী লেখক খোদ বাল্মীকিকেও এর কাহিনীতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে বাল্মীকির ব্যক্তিত্ব ষোল আনা বরবাদ হতে পারে না। তা ছাড়া রামায়ণ চ্যবনের রচনা একথার অনুকূলে কোন প্রামাণ্য নজীরই নেই কোথাও। তপস্যা-নিরত চ্যবন একদা বল্মীক স্তূপে আবৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর চোখ দুটিকে জলন্ত দুটি মণি ভেবে অরণ্য ভ্রমণে আগত রাজনন্দিনী সুকন্যা তাঁকে আঙ লের খোঁচায় অন্ধ করে দেন, তারপর অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহায়তায় চ্যবন

যুবকে পরিণত হন ও দৃষ্টি ফিরে পেয়ে সুকন্যাকে বিবাহ করেন…এই হল কাহিনী। এতে মাত্র বল্মীকস্তূপে ঢাকা পড়াটুকু দেখেই তাঁকে রামায়ণ রচয়িতা বলা যায় কি? অথবা চ্যবনই বাল্মীকি বললে, তাও যুক্তিসহ হবে কি?

সুনীতিকুমার বলেছেন, দশরথ জাতকের রাম সীতা ছিলেন আদিতে দুই ভাই বোন, তার পরে তাঁরা স্বামী স্ত্রী হন। যেহেতু এরকম বিবাহ হিন্দু-আচারসম্মত নয়, তাই ব্রাহ্মণ্য রামায়ণে যখন চরিত্র দুটি আনা হয়েছে, তখন ওঁদের পুরাতন সম্পর্ক আমূল পাল্টান হয়েছে। বলা বাহুল্য কথাটা প্রণিধানযোগ্য মনে হবে না অনেকেরই। ঋক্‌বেদে দেখছি যম ও যমী দুই ভাই বোন, বিবাহ-প্রস্তাবের কথা আলোচনা করছেন পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্কবিন্যাস করে। দেখছি বৌদ্ধদের সমাজেও চলিত ছিল জিনিষটা, স্বয়ং বুদ্ধের খুড়তুত ভাই দেবদত্তই সহোদরাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর আদিম জাতি গোষ্ঠীর অনেকের মধ্যেই ত ওটা ছিল। ক্লিওপেট্রাও তাঁর ভাই টলেমিকে বিবাহ করেছিলেন। কাজেই এ থেকে কি প্রমাণিত হয়? দশরথ জাতক প্রাচীনতর ও রামায়ণ অর্বাচীনতর? বলা বাহুল্য সিদ্ধান্তটি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। তার চেয়ে এ কথা ভাবাই ভাল যে দশরথ জাতক বা জৈন রামায়ণের লেখকরা চলতি লোকপ্রত্যয় থেকে রামসীতার পরিচয় প্রসঙ্গটি আহরণ করেছিলেন, অথবা তাঁদের নিজস্ব কোন ব্যাখ্যা ছিল এ সম্বন্ধে। কারণ দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে বাহিত হয়ে ইন্দোনেশিয়ায় ভিয়েৎনামে ও থাইল্যাণ্ডে যে রামকথা পৌঁছেছে, তাতেও রাম সীতা কোথাও-কোথাও ভাই বোন এবং এই সব বহির্ভারতীয় রামায়ণের কোনটারই বয়স যে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ-৭ম শতকের বেশী নয়, এটা সুপ্রমাণিত, কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দু উপনিবেশ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতাব্দীর আগে গঠিত হয়নি। অর্থাৎ মনে করা যেতে পারে যে তাঁরা সম্ভবত দশরথ জাতক থেকেই কাহিনীটি পেয়েছেন, বাল্মীকি রামায়ণ থেকে নয়। থাই রামায়ণের ইংরাজী অনুবাদক ড. সরিত রত্নাকুলও তাঁর ভূমিকায় বুডিষ্ট সোর্সেস বা বৌদ্ধ উৎসের কথাই গুরুত্বের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য তাঁর অন্যান্য সিদ্ধান্ত ভারতবাসীর কাছে একটু কৌতুকজনকই মনে হবে। তাঁর মতে ব্যাঙ্ককের অদূরবর্তী আউথিয়া শহরই আদি অযোধ্যা এবং রাম প্রকৃত পক্ষে সিয়ামেরই অধীশ্বর ছিলেন। তাঁর জীবন-কাহিনীই পরিব্রাজকদের দ্বারা বাহিত হয়ে ভারতে যায় এবং সেটাই রামায়ণ রূপে মূর্তি পরিগ্রহ করে এবং সেই রামায়ণই আবার ফিরে আসে ইন্দোনেশিয়া ও সিয়ামে বৌদ্ধদের হাত দিয়ে।

ড. সুনীতিকুমার কি ড. রত্নাকুলের এই অভিমতের উপর ভিত্তি করেই রামায়ণকে দশরথ জাতকের অনুগামী বলেছেন? ঠিক জানি না অবশ্য। তবে থাইল্যাণ্ডে যদিও আউথিয়া শহরটি রামের রাজধানী রূপে দেখান হয় এবং থাই সম্রাটরা অনেকেই রাম অভিধাটি নিজ-নিজ নামের সঙ্গে যুক্ত করেন, তবু অধ্যাপক রত্নাকুলের বক্তব্যের এই

অংশটুকু যে অলীক ও ইতিহাস-বিরুদ্ধ, তা নিশ্চয় সবিস্তারে বোঝাতে হবে না। এবার ইলিয়াডের প্রসঙ্গে আসা যাক। হোমরের সময় যদিও খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতক বলে ধরা হয়, তবু ভারতবর্ষে গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ মোটেই হয় নি আলেকজান্দারের ভারত অভিযানের, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীর আগে। কিন্তু রামায়ণ কাহিনীর মূল কাঠামো যে তার আগেই তৈরি হয়ে গেছে, এ ত দেখেইছি পূর্বের অনুচ্ছেদগুলিতে। কাজেই রামায়ণ ইলিয়াডের ছায়ায় রচিত হয়েছে, একথা কেমন করে বলা যায়? বরং দেখা যাচ্ছে এদেশে গ্রীক প্রভাব প্রকাশমান হবার আগেই ভ্রাম্যমান বণিকদের মাধ্যমে ভারতের সংস্কৃতি গ্রীক উপকূল স্পর্শ করেছিল। জগৎ ও জীবনের উৎপত্তির হেতু এবং জন্ম মৃত্যু ও আত্মার তত্ত্ব সম্বন্ধে প্লেতো, হেরাক্লিতাস ও আরিস্ততল প্রমুখের চিন্তায় কি উপনিষদ্ ও বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না? হিন্দু পরমাণু তত্ত্ব, প্রাণ তত্ত্ব এবং গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও রসায়নের বিবিধ তত্ত্ব গ্রীকো-রোমক চিন্তায় যেমন ছায়াপাত করেছে, তেমনি করেছে ভারতীয় গল্প এবং উপকথার সম্ভারও। অতএব বক্তব্যটা যদি হয় দ্যা আদার ওয়ে রাউণ্ড বা উল্টো দিক থেকে বিচার্য, অর্থাৎ যদি বলি রামায়ণের প্রভাবেই ইলিয়াড লেখা হয়েছে, তা হলে দোষটা কি হয়? কিন্তু এ জাতীয় গা-জোয়ারি ব্যাখ্যার কোনই প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর সুপ্রাচীন সাহিত্য নিদর্শনগুলিতে দূর-দূরান্তের ব্যবধান সত্ত্বেও যে প্রাণগত ঐক্য দেখা যায়, তা আকস্মিক না বিস্মৃত আদি উৎসের নির্দেশক, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। গিলগামেস, বাইবেল, বেদ, আবেস্তা, রামায়ণ, মহাভারত এবং ইলিয়াড অডিসী ঘাঁটলে কিছু না কিছু মিল ত চোখে পড়বেই। কিন্তু নিখুঁত বিচারে রামায়ণে ইলিয়াডে মিল কতটুকু? রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন, কিন্তু হেলেন প্যারিসের সঙ্গে স্বেচ্ছায় পালিয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য লঙ্কা ও ট্রয় দুইই অবরুদ্ধ হয় এবং দুটি যুদ্ধে উভয়েরই পরাজয় হয় এবং বন্দিনীদ্বয় উদ্ধার হয়েও দেশে ফেরেন। এই সাদৃশ্যকে যদি খুব বড় করে দেখা হয়, তাহলে ত অডিসী মহাকাব্যে ইউলিসিজের সমুদ্র-সংগ্রামের সঙ্গে ত রামের সমুদ্র-শাসনকেও গ্রন্থিবদ্ধ করতে হয়!

৩.

গোড়ার কথাটারই পুনরুক্তি করে বলছি যে রামায়ণ ও মহাভারত বিশুদ্ধ ইতিহাস হয়ত নয়, কিন্তু দুইয়েরই অন্তর্লোকে যে একটি ইতিহাসের কঙ্কাল নিহিত আছে এবং রাম ও কৃষ্ণ যে প্রাগৈতিহাসিক দিনের দুটি সত্যকার মানুষই, নিছক অলৌকিক মহিমার দ্যুতিতে সমাবিষ্ট হয়েই তাঁরা আস্তে-আস্তে লোকাবতার হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং হিন্দুর পূজায়তনে ঠাঁই পেয়েছেন, এ বিষয়ে অসম্ভাব্যতা নেই। ভারতেতিহাসের কোন অধ্যায়ে এবং আনুমানিক কোন সময়ে তাঁদের আবির্ভাব, তা সূচনাতেই দেখিয়েছি। এর মধ্যে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নিরূপণে বঙ্কিমচন্দ্র

দয়ানন্দ তিলক ভাণ্ডারকার অনেকেই প্রভূত মেহনৎ করেছেন। করেছেন বিদেশী পণ্ডিতরাও। সাধারণভাবে দেখা যায় ভারতীয় পণ্ডিতরা ভারতবর্ষকে প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকারী দেশ প্রতিপন্ন করার জন্যে এই তারিখকে একটু বেশী পিছনে ঠেলে দিতে আগ্রহী হন, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা যথাসম্ভব একালের দিকে টেনে আনতে চান তাকে, সহজবোধ্য কারণেই। সে বিতর্কে না গিয়ে সোজা-বুদ্ধির বিচারে বলা যেতে পারে যে ভারতে বৈদিক আর্যদের আবির্ভাব যদি হয়ে থাকে খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ অব্দে, তার দু-তিনশো বছরের মধ্যেই যদি হয়ে থাকে ঋক্ বেদের সংকলন, তাহলে ধরা যেতে পারে যে আর্যদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান হয়েছিল পরবর্তী শ-দুই বছরের মধ্যেই। অর্থাৎ, রামের সময় দাঁড়ায় খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ ও রামায়ণের খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দ নাগাদ। এই নজীরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অর্থাৎ কৃষ্ণের সময় দাঁড়ায় রামের শ-দুই বছর পরে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ নাগাদ। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ হিসাব নিতান্ত অনুমান-নির্ভর এবং যে যুক্তি-পরম্পরার ওপরে এর স্থিতি, তার কথা সুরুতেই বলেছি, তাই তার আর পুনরুক্তি করব না। এখানে শুধু দেখাতে চেষ্টা করছি যে রাম কৃষ্ণ-বিষ্ণুর অবতার রূপে স্বীকৃত ও পূজিত হতে আরম্ভ করেছেন মোটামুটি কোন সময় থেকে।

আশা করি যে সকলেই জানেন বিষ্ণু বৈদিক দেবতা এবং তিনি বেদে অভিহিত হয়েছেন সৃষ্টি স্থিতির মূলীভূত কারণ, সর্বশক্তির অধীশ্বর রূপে। পরের সোপানে তিনিই পরিণত হয়েছেন নারায়ণে এবং লক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত ভাবে গোলোকপতি রূপে পূজিত হতে আরম্ভ করেছেন। আরো পরে এসে পাঞ্চরাত্রীয় ধর্মের অভ্যুদয়ে ঠিক কখন তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছেন বলা কঠিন। তবে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন বাসুদেব নামে সর্ব প্রথম উল্লিখিত হয়েছেন। ক্রমশ যত দিন গেছে ততই তাঁর মহিমার ব্যাপ্তি হয়েছে। তিনি হয়েছেন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং এবং তাঁর বাল্যজীবন নিয়ে লেখা হয়েছে ভাগবত, মধ্যজীবন নিয়ে মহাভারত এবং অন্তিম জীবন নিয়ে হরিবংশ। তারপর খ্রীষ্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতকের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তাঁর সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছেন রাধিকা, যিনি কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক উপরোক্ত কোন প্রামাণ্য গ্রন্থেই প্রাপনীয়া নন। কিন্তু কৃষ্ণের চেয়ে দু-হাজার বছরের কনিষ্ঠা হয়েও রাধিকা ঠাকুরাণী তাঁর হ্লাদিনী শক্তি রূপে গৌড়ীয় ভক্তিদর্শনে সগৌরবে অনুপ্রবিষ্টা হয়েছেন এবং নিম্বার্ক, মধ্ব ও চৈতন্য পরের পর তাঁকে পরমারাধ্যা দেবী রূপে যুগলারাধনার বেদীতে বসিয়ে পূজা নিবেদন করেছেন। নিঃসন্দেহ যে কৃষ্ণের মত রামও দূর অতীতের কোন সময়েই বিষ্ণুর অবতার রূপে পূজায়তনে পরিগৃহীত এবং সীতাসহ যুগলারাধনার বিষয়ীভূত হয়েছেন। যদিও অবশ্য মধ্যযুগীয় সাধু রামানন্দই রামায়েৎ সম্প্রদায়ের স্রষ্টা এবং তাঁর অল্প পরে ভক্ত তুলসীদাসই

আবধী হিন্দীতে ভক্তি-ভিত্তিক রামচরিতমানস লিখে উত্তর ভারতে রামভজনার পরিব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন, তবু রামচন্দ্র মোটেই কিন্তু অত অর্বাচীন নন। ঈশ্বরপুরুষ হিসাবে তিনিও যথেষ্ট পুরানো। যত দূর মনে পড়ছে রাম ও রাঘব কথা দুটির পাণিনিতে উল্লেখ দেখেছি। অষ্টাধ্যায়ী রচয়িতা পাণিনি খ্রীষ্টীয় অব্দের আগের অথবা সূচনাকালের মানুষ। খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে ভাস প্রতিমা নাটক লেখেন, যা রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নিশ্চিতই এঁরা কেউ দশরথ জাতক থেকে রামকথা আহরণ করেন নি। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকে ভবভূতি লেখেন উত্তর রামচরিত ও মহাবীর চরিত। তাঁরও উৎস নিশ্চয় দশরথ জাতক নয়। কারণ দশরথ জাতকের অনুগামিতা দেখা যায় না দুটি নাটকের কোনটাতেই, যায় না ভট্টিকাব্যেও।

এ ছাড়া খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতক নাগাদ কালিদাস যে রঘুবংশ কাব্য লেখেন, তার উৎস কি? নিশ্চিতই বাল্মীকি রামায়ণ। লক্ষ্য করার বিষয় কালিদাস রামকে পূর্ণ ব্রহ্ম পুরুষোত্তম রূপেই চিত্রিত করেছেন এখন থেকে অন্যূন দেড় হাজার বছর আগে এবং তাঁর কাহিনীতে রামায়ণ-স্রষ্টা রূপে বাল্মীকিও হয়েছেন সসম্মানে স্বীকৃত। অবশ্য কালিদাস ও ভাসের রচনায় ছোটখাট ব্যতিক্রম এক আধটু চোখে পড়ে মূল বাল্মীকি থেকে। যেমন উভয়েই লক্ষণকে ভারতের অগ্রজ রূপে দেখিয়েছেন, যদিও বাল্মীকিতে ভরতই জ্যেষ্ঠ। অবশ্য এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার এমন কিছু মারাত্মক বৈলক্ষণ্য নয়, যা নিয়ে মাথা ঘামান প্রয়োজন। কিন্তু যে কথাটা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল রামচন্দ্রের অবতারত্ব। তা যে হঠাৎ মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদের প্রভাবে সৃষ্টি হয় নি, প্রায় দু হাজার বছরের সাহিত্যিক নিদর্শন থেকেই সেটি প্রমাণিত হচ্ছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি উপনিষদ, ভাগবত ও মহাভারত থেকে প্রবাহিত হয়ে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে একাল পর্যন্ত চলে এসেছে বলেই, কৃষ্ণাবতার সম্পর্কীয় প্রত্যয়কে আমরা বেশী পুরাতন ভাবি। আর রামকথা যেহেতু একমাত্র রামায়ণ-নির্ভর এবং তা কাব্যে গানে ও আরাধনায় সুকীর্তিত হলেও, যেহেতু কোন বিত্তাভূয়িষ্ঠ দর্শনের স্পর্শে সঞ্জীবিত নয়, তাই কোনদিনই তা বিদগ্ধ সমাজের স্বীকৃতিধন্য হয় নি। মূলত প্রাকৃত জনের পূজায়তনে আবদ্ধ, এই কারণেই রামাবতার সম্পর্কীয় ধারণাকে ভুল করে আমরা মধ্যযুগীয় সমন্বয়পন্থী সন্তসাধুদের দান ভাবি। আগেই দেখিয়েছি যে অবতারত্বের দাবীতে রাম কৃষ্ণের আগে ছাড়া পরে নন। চলতি লোকপ্রত্যয়েও রাম ত্রেতায় এবং কৃষ্ণ দ্বাপরে। অনেকের মতে অবশ্য এই কাল বিভাগ সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভিত্তিহীন, তথাপি পার্জিটার প্রমুখ পণ্ডিতরা হিন্দুদের এই যুগ বিভাগকে একেবারে নস্যাৎ করতে পারেন নি, তাঁদের পুরাণ পর্যালোচনা-বিষয়ক বই পুঁথিতে। মোটের ওপর এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে রামচন্দ্র অবতারত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র রচনার ঢের আগে। সেই আগেটা কত আগে

তা নিয়ে তর্ক না হয় নাই তুললাম ফের।

যে-যে কারণ-পরম্পরায় রাম ও কৃষ্ণ 'হিন্দু' ভারতে ঈশ্বরপুরুষ বা ঈশ্বরাবতার বলে গৃহীত হয়েছেন, তা আমি এই নিবন্ধের সূচনাতেই বলেছি। আর্য ভারতের রাষ্ট্রিক অধিকার সুদূর দক্ষিণে সম্প্রসারিত করে যে রাম সিংহলকেও ভারতীয় প্রশাসন বলয়ের মধ্যে এনেছেন, সেই অমিত শক্তিধর ঈশ্বর ছাড়া আর কি বলে গণ্য হবেন? আর যে কৃষ্ণ উত্তরে উপনিবিষ্ট বিবদমান আর্যগোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি সাধন করে এবং আর্য-অনার্যে সমন্বয় ঘটিয়ে সংস্থাপিত করেছেন হিন্দুর সমাজবোধের আদি কাঠামোটি, তিনিও এই ভাবেই অবতার পদবী লাভ করেছেন এবং ভাগবত মহাভারত ও হরিবংশ রচয়িতা ব্যাস তাঁকে সঙ্গত কারণেই ভগবান হরিরীশ্বর বলে অভিহিত করেছেন, তাঁর এই মহিমান্বিত বিরাট ব্যক্তিত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেই। অবতারদের ত এমনি করেই সৃষ্টি হয়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের একাধিকারে জর্জরিত শূদ্রদাসদের বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ বিরোধী অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব করেছিলেন যে বুদ্ধ, তাঁকে আমরা অবতার বলেছি। রোম-শাসিত জুডিয়ায় ইহুদী ধনিক ও পুরোহিতগোষ্ঠীর শোষণ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন কৃষক এবং ক্রীতদাস শ্রেণীকে যে খ্রীস্ট, তাঁকে খ্রীস্টানরা বলেছেন প্রেরিত পুরুষ, বলেছেন ঈশ্বরপুত্র। কুক্রিয়াসক্ত লিঙ্গপূজক কোরেশদের এবং আচার সংস্কার হীন বেদুইনদের ইসলামের ছত্রচ্ছায়ায় এনে এশিয়ার পূব-পশ্চিমে ব্যাপ্ত বিশাল ভূখণ্ডে মুসলীম প্রভুত্ব কায়েম করেছিলেন যে মহম্মদ, মুসলমানরা তাঁকে বলেছেন পয়গম্বর অর্থাৎ ঈশ্বরাবতার। জরথুস্ত্র, কংফুৎস, লাউৎস প্রমুখও মানুষের সাহিত্য, দর্শনে, তথা পূজায়তনে ঠাঁই পেয়েছেন একই ভাবে। রাম এবং কৃষ্ণের অবতারত্বে উন্নীত হওয়ার ধারাও' বলা বাহুল্য অভিন্ন। ভক্ত শিষ্য, মনস্বী, ও পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায় অবশ্য যুগে যুগে তাঁদের মহিমা যেমন হয়েছে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর, তেমনি অলৌকিক শ্রী-মণ্ডিত হতে হতে তাঁরা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরই হয়ে পড়েছেন স্বয়ং। কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, জিনিসটা ষোল আনা আজগুবী কিনা? এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ঈশ্বরাস্তিত্বে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁরা অবতারত্বের কারণ ও স্বরূপ সম্বন্ধে সাধুজনের বিশ্বাসই বা না মানবেন কেন?

৪.

রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত—'হিন্দু' ভারতের প্রধান তিনটি কাব্যই এদেশে চিরদিন ধর্মগ্রন্থ রূপে ও স্বীকৃত পূজিত। তার কারণ এই তিন গ্রন্থের প্রথমটিতে রামের এবং পরবর্তী দুটিতে কৃষ্ণের জীবনকথা বিবৃত হয়েছে, আর এ দুই মহাজনই যেহেতু ঈশ্বরপুরুষ বা যুগাবতার রূপে দর্শনে ও ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত, তাই তাঁদের চরিত কথা হিন্দুর কাছে গ্রন্থমাত্র নয়, ওদের সম্বন্ধে সুগভীর ভক্তি মিশ্রিত একটা সম্ভ্রমের

বোধ আছে নৈষ্ঠিকদের মনে। এঁদের এই সম্ভ্রমের অনুপ্রেরণাতেই ১২শ থেকে ১৬শ শতকের মধ্যে বিভিন্ন সব ভারতীয় ভাষায় রামায়ণের অনুলেখন হয়। সব চেয়ে প্রসিদ্ধ হল কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ, তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ, আর মাধবদাসের অসমিয়া ও বলরামদাসের ওড়িয়া রামায়ণ। এ ছাড়া আছে মারাঠীতে আচার্য শ্রীধরের, গুজরাটীতে হেমচন্দ্র দাসের এবং তামিলে কম্বনের রামায়ণ। তেলুগুতে ভাস্করের, কানাড়ীতে পম্পার এবং নেপালীতে ভানুভক্তের রামায়ণও সুপ্রচারিত। কোন উৎসাহী গবেষক এই রামায়ণমালা সংগ্রহ করে মূল বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কোনটিতে কি ধরণের মিল-গরমিল পাওয়া যায় এবং আরোপিত বা বাইরে থেকে আনীত কাহিনী-উপকরণগুলির গোড়ার উৎস কি, তা যদি সযত্ন সন্ধানে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহলে তা সত্যিই কাজের কাজ হবে। প্রসঙ্গত থাই রামায়ণ, ইন্দোনেশীয় রামায়ণ এবং আন্নামী রামায়ণের বস্তু এবং বক্তব্যগুলোও আলোচনার আলোয় তুলে ধরা যেতে পারে। এ বিভাগে কাজ এখনো বিশেষ হয় নি, তার কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গবেষণা-কর্ম এখন পর্যন্ত দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের চৌহদ্দি কাটিয়ে বাইরেই আসতে পারেনি। হয়ত আমরা কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতকে অগ্রপথিক রূপে পাওয়ার অপেক্ষায় আছি!

এই সব ভাষা-রামায়ণের কোন-কোনটাতে সীতা রাবণের কন্যা বলে বর্ণিত হয়েছেন। অনেকগুলিতে রাম সীতা দুই ভাই বোন রূপে চিত্রিত হয়েছেন। একটিতে রামচন্দ্র কর্তৃক বালীবধের কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে, বালীর সহধর্মিণী তাঁরা আদিতে ছিলেন তাঁর জনয়িত্রী। পিতৃহত্যা ও মাতৃগমনের অপরাধেই রাম তার মৃত্যু বিধান করেছিলেন। কোনটাতে হনুমানকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্যে শাপভ্রষ্টা গন্ধকালীর কুম্ভীররূপ ধরে তাঁকে আক্রমণের, কোনটাতে বা অপালা নাম্নী কোন রাক্ষসীর মোহিনী রূপ ধারণ করে নিরাবৃত দেহে নৃত্য করার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। কৈকেয়ী কর্তৃক দশরথের কাছে এক বরে রাম-লক্ষ্মণের প্রাণদণ্ড, আর এক বরে ভরতকে সিংহাসনে স্থাপন ও তাঁর হাতে সীতাকে সমর্পণের প্রস্তাব উত্থাপন বর্ণিত হয়েছে। কোন-কোনটাতে মরণোন্মুখ রাবণকে রাম কর্তৃক সশ্রদ্ধ পরিচর্যার বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। কোন কোনটাতে আবার বানর চমূ কর্তৃক মন্দোদরীকে কেশাকর্ষণ করে মৃতদেহে পরিকীর্ণ যুদ্ধস্থলে নিয়ে আসা ও বিভীষণের হাতে তুলে দেওয়া বর্ণিত হয়েছে। সীতার সমাপ্তি প্রসঙ্গও নানা রামায়ণে নানা ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। অগ্নিপরীক্ষার নামে সীতা কর্তৃক অগ্নিগর্ভ গুহায় প্রবেশ এবং শেষ পর্যন্ত আর না ওঠা দেখান হয়েছে কোনটাতে। কোনটাতে পুরনারীদের কৌতূহল নিরাকরণের জন্যে পূর্ণগর্ভা সীতা কর্তৃক ঘরের মেঝের খড়ি দিয়ে রাবণের আলেখ্য অঙ্কন এবং ক্লান্তিবশে তারই ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়া ও তার ফলে সন্দিহান রামচন্দ্র কর্তৃক ধিকৃত হয়ে বসুমতীকে

অ্যাহ্বান এবং তাঁর কোলে আশ্রয় গ্রহণ, অর্থাৎ পাতালে প্রবেশ বর্ণিত হয়েছে। জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জনও দেখান হয়েছে কোন-কোনটাতে। এই বৈষম্যগুলি থেকে এ কথাই প্রতিপন্ন হয় যে মূল রামায়ণ অবলম্বন করেই যদিও সবাই ভাষা রামায়ণ লিখেছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই স্ব-স্ব আঞ্চলিক কাহিনী, উপকথা ও লোকপ্রত্যয় ইত্যাদিকে প্রচুর পরিমাণে ভাঙিয়েছেন নিজ-নিজ গ্রন্থে।

আমাদের কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও বাল্মীকি রামায়ণে গরমিলের নিদর্শন আছে যথেষ্টই। তার মধ্যে অঙ্গদ-রায়বার এবং তরণী সেনের কাটামুণ্ড থেকে রামনাম ধ্বনিত হওয়ার কাহিনী পড়েননি কে? এসব যে কৃত্তিবাসের স্বকীয় উদ্ভাবন এবং শেষোক্ত ব্যাপারটিতে যে তৎকালীন বাঙালীর ভক্তি আন্দোলনই ছায়াপাত করেছে বিশেষ ভাবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই কারণেই কৃত্তিবাস বাল্মীকির পুঁথি দেখেন নি, বা অন্য কোন উৎস থেকে রামকথা সংগ্রহ করেছেন, এমন মনে করার পক্ষে সঙ্গত কোন যুক্তি নেই। পুরানো দিনের অনুবাদকরা কেউ আক্ষরিক অর্থে মূলানুগামী ছিলেন না। মালাধর বসু তাঁর ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে শ্রীরাধাকে অবলীলায় আমদানি করেছেন, যদিও মূলে তিনি নেই কোথাও। হয়ত তিনি জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দ থেকেই তাঁকে সংগ্রহ করেছিলেন, যেমন স্বয়ং জয়দেব রাধাকে আবিষ্কার করেছিলেন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে। ব্রহ্মবৈবর্তের সঙ্গে গীতগোবিন্দের রাধাতত্ত্বে সত্যিই আশ্চর্য মিল দেখা যায়। উভত্রই দেখি আসন্ন ঝটিকার মুখে নন্দ গোপ শিশু কৃষ্ণকে তরুণী রাধার কোলে দিয়ে তাঁকে বাড়ী পৌঁছে দিতে বললেন। ইতিমধ্যে নন্দ অদর্শন হওয়া মাত্র কৃষ্ণ নওলকিশোর মূর্তি ধরে সন্নিহিত কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করলেন রাধার হাত ধরে। তারপর আবার শিশু মূর্তি ধারণ করে বাইরে এলেন এবং রাধার ক্রোড়ারূঢ় হয়ে গোকুলে নীত হলেন। জয়দেবের বিখ্যাত মেঘৈর্মেদুরমম্বরং শ্লোকের এই হল নাকি বিষয়বস্তু! কৃষ্ণের এই শিশুকিশোর মূর্তির অনেক নৈষ্ঠিক ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। কাশীদাসী মহাভারতের অনুবাদকও একই রকম স্বাধীনতা নিয়েছেন। মূল মহাভারতের আঠার অধ্যায় গীতাকে তিনি মাত্র কয়েকটি শ্লোকে সীমিত করেছেন, আবার অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, দ্বৈপায়ন হ্রদে ভগ্নজানু দুর্যোধনের মৃত্যুকালীন হরিষে বিষাদ ইত্যাদির বিবরণ তিনি অবশ্যই বেদব্যাস থেকে পান নি। তবু মূলের সঙ্গে তাঁর মোলাকাতই হয়নি, একথা বলা যায় কি?

কিন্তু আমাদের আলোচনা দৃশ্যত বোধ হয় একটু প্রসঙ্গ বহির্ভূত হয়ে পড়ছে। অনেকের হয়ত মনে হবে, এসব কথা এখানে তুলছি বা বলছি কেন? বলছি এইটুকু প্রমাণ করতে যে রামায়ণকাহিনী ভারতবর্ষে চিরদিনই হয় সমগ্রভাবে, নয়ত খণ্ড আকারে, সাহিত্য সৃষ্টিতে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। ভাষা-রামায়ণগুলি যেমন তার সাক্ষী, তেমনি সাক্ষী জৈন রামায়ণ ও দশরথ জাতকও, কারণ দুই-ই বাল্মীকির পরবর্তী।

আনুমানিক কত পরবর্তী, তার আভাস আমি এই আলোচনার সুরুতেই দিয়েছি। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে রামায়ণ ও মহাভারত দুই মহাগ্রন্থের যে সংস্করণগুলি এখন ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, তার একের সঙ্গে অন্যের যেমন আছে পদে-পদে পাঠ-ভেদ, তেমনি কাশী কলকাতা ও বোম্বাই সংস্করণে প্রসঙ্গগত বৈলক্ষণ্যও প্রচুর চোখে পড়ে। এর কারণ মুখে-মুখে প্রবাহিত সাহিত্য যখন পুঁথিবদ্ধ হয়েছে, তখন একজনের স্মৃতির সঙ্গে অন্যের স্মৃতির অনিবার্য ভাবেই যেমন পার্থক্য হয়েছে, তেমনি ভাবুক এবং কল্পনাকুশলী পুঁথিকারেরা নিজের রচনাও কিছু-কিছু পুঁথির ইতস্তত অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন। এর মধ্যে কোনটুকু আদি, কোনটুকু অর্বাচীন, নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তা সত্ত্বেও রামায়ণের দুটি কাণ্ড, উত্তরা ও সুন্দরা, পরবর্তী কালের সংযোজন বলেছেন পণ্ডিতরা। আমি পণ্ডিত নই, কাজেই সাতটি কাণ্ডকেই বাল্মীকি প্রণীত বলে চিহ্নিত করছি এবং মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ দুই প্রস্থিত মহাজনের আদর্শে বাল্মীকিকে আদি কবি জ্ঞানেই প্রণতি নিবেদন করছি :

'নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি।'

৫.

সব শেষে বলা দরকার যে রামায়ণ ধর্মগ্রন্থ কিনা এবং রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার কিনা, এ প্রশ্ন যদিও উনিশ শতক থেকেই বার-বার তর্কের আসরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এবং যদিও অদ্যাবধি তার সন্তোষজনক সমাধান হয়নি, কিন্তু রামায়ণ যে সাহিত্য হিসাবে অদ্বিতীয়, এ নিয়ে কোন দিনই দ্বিমত হয়নি পণ্ডিতদের মধ্যে। বাল্মীকির অস্তিত্ব বা রামায়ণের প্রাচীনতা নিয়েও কেউ সংশয় প্রকাশ করেন নি কখনো। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে রামচন্দ্রকে অবতারপুরুষ রূপে স্বীকার করলেও, রামায়ণ মহাকাব্যের সাহিত্যিক উৎকর্ষ তিনিই প্রথম অনুপম ভাষায় উদ্ঘাটিত করে দেখান। চরিত্র চিত্রণে, অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণে, নিসর্গশোভা অঙ্কনে আদি কবির অনবদ্য কলা কৌশলকে তিনি উচ্চ সাধু-বাদে সম্বর্ধিত করেন। দার্শনিক প্রজ্ঞান, রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার পথে সমুজ্জ্বল আলোক শিখা তুলে ধরায় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাত্যহিকতার ঊর্ধ্বে একটি ভাবময় দিব্য জীবনের আদর্শ উপস্থাপিত করায় মহাভারত নিশ্চিতই শ্রেয়োতর। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনের বাস্তবতা রূপায়ণেও তার মহিমা অবশ্যই অনস্বীকার্য। কিন্তু প্রাঞ্জল ও অনলংকৃত কাব্য সুষমায়, কল্পনার অবাধ বিহারে, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তিতে রামায়ণের অতুলনীয়তা যে অনতিক্রান্ত, একথা বঙ্কিমচন্দ্র বার-বার স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রামায়ণানুরক্তিও সুবিদিত। উপরন্তু তিনিই প্রথম বাল্মীকি রামায়ণ ও দূর প্রাচ্যে প্রচলিত রামায়ণের মধ্যে তুলনাত্মক আলোচনার অবতারণা করেন জাভা-

যাত্রীর পত্র নামক রচনাটিতে। তিনি সেই সময়ই বলেছিলেন যে ঘরে ও বাইরে রাম-কথার যতগুলি ভাষ্যান্তর চলিত আছে, তা একত্র করে সবগুলির একটি তুলনাত্মক ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অদ্যাবধি সেই কাজে অগ্রণী হবার মানুষ কেউ আসেন নি। ড. সুনীতিকুমার অবশ্যই বহির্ভারতীয় রামায়ণগুলির এবং ভারতে প্রচলিত ভাষা-রামায়ণগুলির যথাযথ খবর রাখেন। তিনি তাঁর কোন উৎসাহী গবেষক ছাত্রকে এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করালে বেশী লাভজনক কাজ হত। তিনি নিজে এশিয়াটিক সোসাইটিতে যে চমকপ্রদ আলোচনার কাঠামোটি পেশ করেছেন, তাতে গোটা বিষয়টি নিয়ে নূতন করে ভাবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোন দিকে কোন নূতন আলোকপাত হয়েছে বলা যাবে না। অথচ বাস্তবিকই তার দরকার যে আছে, তা কোন সংস্কৃতিবান মানুষই নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না।

একটা কথা অনেক সময় আমার মনে হয় যে রকমারি ভাষা ভূষা ও আচার সংস্কারের পার্থক্য সত্ত্বেও, ইউরোপের সংস্কৃতিতে যেমন একটি একাত্মিকতা আছে, ইউরোপীয় বললেই যেমন আমরা একটি বিশেষ জীবনাদর্শসম্পন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীকে বুঝি, এশিয়ার ক্ষেত্রে তা নেই ; এশীয় বলতে তেমন একটি ঐক্যবদ্ধ মানব সংহতিকেও বুঝি না আমরা। তাহলে কি আমাদের মানসিক গঠনে ও জীবনচর্যায় সেই ধরণের কোন ঐক্যসূত্রই নেই, না অজ্ঞতাবশত আমরা তার অনুশীলনই করিনি ? অথচ লক্ষণীয় যে পৃথিবীর প্রধান সব কটি ধর্মই এশিয়ায় জন্মেছে এবং মানবসংস্কৃতিতে এই সব ধর্মসঞ্জাত সভ্যতার প্রভাবও পড়েছে সর্বস্তরেই। আসলে ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রাণলোক মন্থন করে তার আত্মিক ঐক্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে পণ্ডিতরা, তাঁদের সমকক্ষ মানুষ একালীন এশিয়ায় হয়ত হননি, অথবা হলেও হয়ত এতবড় শ্রম ও অনুসন্ধানসাধ্য কাজে হাত লাগানর মত সামাজিক বা রাষ্ট্রিক অনুপ্রেরণাই পান নি তাঁরা কেউ। অথচ রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক উভয়বিধ দিক থেকেই যে জিনিষটি কাম্য, এতে ত সন্দেহ নেই। হাতের কাছেই পাচ্ছি রামায়ণ প্রসঙ্গটি। এটি নিয়েই ত নিখিল এশিয়ার অন্তর্লোকে প্রবেশের অপূর্ব একটা সুযোগ রয়েছে। কোন ধারা ধরে অগ্রসর হতে হবে, তার মোটামুটি আভাস ত এ প্রবন্ধের গোড়াতেই দিয়েছি। থাইল্যাণ্ড বৌদ্ধ মহাসংঘে প্রদত্ত এশিয়ার সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত ভাষণে কথাটির অবতারণা করেছিলাম আমি এবং বক্তাকে ধন্যবাদ দিতে উঠে গীতাঞ্জলির থাই অনুবাদক অধ্যাপক করুণা কোশল স্বীকৃতও হয়েছিলেন এই ব্যাপক পটভূমিতে প্রক্ষেপ করে রামায়ণ পর্যালোচনামূলক একখানি বই লিখতে। জানি না তিনি সে সংকল্প কাজে পরিণত করেছেন কিনা। তবে তিনি বা অন্য যে কেউ এটি করলে সত্যিকার একটা বড় কাজ হবে এবং সেই আলোচনার দর্পণে আমরা এশীয় সংস্কৃতির ভাবমূর্তিটি যেমন দেখতে পাব, তেমনি রামায়ণ কাব্যটিকেও নূতন আলোয় বুঝতে ও বোঝাতে পারব।

॥ দুই ॥ মহাভারত-জিজ্ঞাসা

মাইকেল মধুসূদন তাঁর অনতিখ্যাত হেক্টরবধ নামক গদ্য আখ্যায়িকার উৎসর্গপত্রে বাল্যবন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করে যে কথাগুলি লেখেন, তার মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের সঙ্গে ইলিয়াড ওডিসীর তুলনামূলক ছোট্ট একটি মন্তব্য খুবই নজর করার মত মনে হয় আমার। রামায়ণ মহাভারতের অনুপেক্ষণীয় শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেও তিনি হোমরের গ্রন্থ দুটিকে মহাকাব্যোচিত মহিমায় উচ্চতর আসন দেন। তাঁর এই অভিমত তদানীন্তন পণ্ডিতদের অনেকেরই মনঃপুত হয়নি যদিও, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আজ ধীরভাবে বিবেচনা করলে মন্তব্যটি মোটেই নস্যাৎ করার উপযুক্ত মনে হবে না বিচারশীল মানুষদের। রামায়ণ মহাভারতের, বিশেষত মহাভারতের কাব্যশরীরে একাত্মিক কাহিনীর ঠাসবুনানি যে নেই, তা মানতেই হবে। মূল কাহিনীকে বেষ্টন করে এতে রকমারি আখ্যান ও উপকাহিনীর সমাবেশ হয়েছে, এসেছে দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, নীতি ও লোকাচার প্রসঙ্গ এবং তা দশ হাজার শ্লোকে নিবদ্ধ আদি কাহিনীকে দিনে-দিনে লক্ষ শ্লোকে ব্যাপ্ত বিরাট এক তত্ত্বজ্ঞানের কোষগ্রন্থে পরিণত করেছে। কাজেই মহাভারত যে এক সময়ের রচনা নয়, নয় একজনের রচনা, এ প্রায় তর্কাতীত ভাবেই মেনে নেওয়া চলে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, মূল কাহিনীটি কবেকার রচনা এবং বাকি অংশগুলি কোন্ সময় থেকে কোন্ সময়ের মধ্যে রচিত হয়? অর্থাৎ আদি লেখক কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস কোন্ সময়ের মানুষ এবং তিনি কি সত্যিই একজন ঐতিহাসিক পুরুষ? লক্ষণীয় যে মহাভারত আখ্যায়িকার সঙ্গে ব্যাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। স্বয়ং নারায়ণের সঙ্গেই তাঁর ও দেবী সরস্বতীর নামে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। কাজেই প্রশ্ন জাগে, তিনিই মহাভারত রচনা করেছেন, না বেদব্যাস অভিধাসম্পন্ন অন্য কোন কবি পুরাণপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আড়ালে আত্মগোপন করে মূল কাহিনীটি লিখেছিলেন। এ সমস্যার, বলাই বাহুল্য, সমাধানে পৌছান সহজ নয়। তবে মহাভারতের মধ্যে যে বহু হাত বহু সময়ে আপন-আপন ছাপ ফেলেছে, তা এর বিষয়বস্তু ও রচনারীতির গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। সেদিককার তত্ত্ব নিয়ে মহাভারত বিশেষজ্ঞদের পুঙ্খানুপুঙ্খ

বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ সবিস্তারে উত্থাপন বা আলোচনা এখানে হয়ত নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নানা সময়ের সংযোজনে মহাভারত মহাকাব্যের কাঠামো বিশালতা অর্জন করেছে। তার ফলেই মহাভারত যেমন বিবিধ জ্ঞানের আকর স্বরূপ হয়েছে [যে কারণে প্রাজ্ঞজন বলেছেন যা মহাভারতে নেই, তা নেই ভারতবর্ষেই], তেমনি নিছক সাহিত্য গুণান্বিত মহাকাব্য হিসাবে তার গ্রন্থনা যথেষ্ট শিথিলও হয়েছে, যার কথা প্রচ্ছন্ন রয়েছে মধুসূদনের ঐ মন্তব্যটিতে।

কিন্তু বেদব্যাসের ঐতিহাসিক খাঁটিত্বের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে বৃহত্তর অন্য যে প্রশ্নটি এবং আজকের প্রত্নেতিহাসবিদরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যা নিয়ে, তা হল মহাভারতের ঘটনাটা কি সত্য? কুরুক্ষেত্রে কি সত্যই কুরু-পাণ্ডব, তথা কুরু-পাঞ্চালে একদিন সর্বভারতীয় আকারের একটা যুদ্ধ হয়েছিল এবং সে যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে মন্ত্রণাদাতারূপে যোগ দিয়েছিলেন দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ? যদি হয়ে থাকে, তাহলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মোটামুটি সময়টা কখন? আর এই যুদ্ধ-সম্পর্কীয় কাব্যের আদি ছাঁচটাই বা কবে লেখা হয়েছিল? পরস্পর সংলগ্ন এই প্রশ্নগুলো আসলে কিন্তু একই প্রশ্নের পরিপূরক অঙ্গ এবং এ সবের অসন্দিগ্ধ সমাধানে পৌছানর অনুকূলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনো বিশেষ সংগৃহীত হয়নি। মোটামুটি ভাবে শুধু একটুকু ধরা যেতে পারে যে উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট বৈদিক আর্যদের দক্ষিণাভিমুখী অভিযান বর্ণিত হয়েছে রামায়ণে, আর উত্তরাপথে অধিষ্ঠিত আর্যদের স্বগৃহবিরোধ ও যুদ্ধের ইতিহাস স্থান পেয়েছে মহাভারতে। আগে সম্প্রসার ও অধিকার স্থাপন, তারপর স্থিতি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা হল ঐতিহাসিক বিবর্তনের স্বাভাবিক ধারা। সেই অনুসারেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি করা হয় এবং এই দুটি বৃহৎ ঘটনা ভারতবর্ষে পরের পর আনুমানিক কোন্ সময় ঘটে থাকতে পারে, তার ভিত্তিতেই একটা সময়সীমা বাঁধার চেষ্টা হয় মহাকাব্যে বর্ণিত ঘটনা দুটিরও, আবার সর্বজনগ্রাহ্য মহাকাব্যাকারে তাদের গ্রন্থনারও। ভারতবর্ষে বৈদিক আর্যদের অনুপ্রবেশ হয় খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ অব্দ নাগাদ। তার দু-তিনশো বছরের মধ্যেই হয়ে থাকবে তাঁদের দক্ষিণী অভিযান। সুতরাং রামায়ণে বর্ণিত ঘটনার সময়টা খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দী হতে পারে। তার দু-তিনশো বছরের মধ্যেই যদি হয়ে থাকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, তাহলে তার সময় দাঁড়াচ্ছে খ্রীঃপূঃ ১৩শ শতাব্দ নাগাদ। আর মূল রামায়ণ যদি ঘটনার শ-তিনেক বছর পরে লেখা হয়ে থাকে, তাহলে রামায়ণকে খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীর এবং মহাভারতকে খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দীর রচনা বলে কতকটা নির্ভয়েই গ্রহণ করা যায়। প্রথমোক্ত ঘটনায় হয়ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অযোধ্যাপতি রাম নামধেয় প্রাগৈতিহাসিক কোন রাজা, আর দ্বিতীয়োক্ত ঘটনায় কেন্দ্রীয় পুরুষ রূপে বিদ্যমান ছিলেন হয়ত দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ নামধেয় একই রকম প্রাগৈতিহাসিক কোন শক্তিমান নরপতি। প্রথম জন আর্যাবর্তের অধিকার দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত প্রলম্বিত

করেছেন, দ্বিতীয় জন আর্যে-অনার্যে মেল বন্ধন ঘটিয়ে, ক্ষাত্রপ্রাধান্যমুক্ত নতুন হিন্দু ভারতের কাঠামো গঠন করেছেন। দুজনেই তাই লোকাবতার বা ঈশ্বরপুরুষ রূপে ভারতবাসীর পূজায়তনে সসম্মানে গৃহীত হয়েছেন। যুগে-যুগে সাহিত্যে ও শাস্ত্রে তাঁদের মহিমা কীর্তিত হতে-হতেই ক্রমশ তাঁরা অতিমানবে, তারপর স্বয়ং ঈশ্বরে রূপান্তরিত হয়েছেন, এ কথা মনে করলে তাই খুব ভুল হবে না। লৌকিক দেবদেবীর উদ্ভব ত এইভাবেই হয়।

২.

এই সিদ্ধান্তগুলির অনুকূলে কোন অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ এনে হাজির করা অবশ্য সুসাধ্য নয়। কিন্তু যাঁকে আমরা ভারতযুদ্ধের কেন্দ্রীয় পুরুষ নামে অভিহিত করেছি, সেই কৃষ্ণকে বিনা দ্বিধায় বোধহয় ইতিহাসের চরিত্র মনে করা যেতে পারে। বলা দরকার যে ছান্দোগ্য উপনিষদেই প্রথম দেবকীপুত্র বাসুদেবের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখান থেকে মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে হয়েছে কৃষ্ণকথার ব্যাপ্তি। এর মধ্যে ছান্দোগ্যোপনিষদ খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দ নাগাদ রচিত হওয়া সম্ভব, আর মহাভারতের তারিখ আমরা ধার্য করেছি খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ বা তার কাছাকাছি কোন সময়। সেখান থেকে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকের বিষ্ণু-পুরাণ পর্যন্ত, কৃষ্ণকাহিনীর এই একটানা প্রতিপত্তি দেখেই বুঝতে হবে কোন অনৈতিহাসিক বা কল্পিত চরিত্র এত দীর্ঘদিন সমাজ মনস্তত্ত্বে এভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ থাকতে পারে না। তাছাড়া খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতক নাগাদ হয়েছে সাত্বত ধর্মের অভ্যুদয় এবং সেখানে বিষ্ণুর অবতার রূপে কৃষ্ণ কীর্তিত হয়েছেন পুরুষোত্তম নামে। ভাগবতানুমোদিত ভক্তিধর্মের আবির্ভাব হয় এর পর ৪র্থ শতাব্দী নাগাদ এবং ভাগবত কৃষ্ণকে বলেন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং! সুতরাং কৃষ্ণ বাসুদেব কালে ঈশ্বর-পুরুষরূপে বিবর্তিত হলেও, আদিতে যে ইতিহাসের মানুষই, এ নিয়ে তাই তর্ক না তোলাই শ্রেয়! কিন্তু কৃষ্ণ সত্যকার ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধও সত্য ইতিহাসের ঘটনা হয় কিনা সে প্রশ্ন থাকছেই।

অবশ্য কৃষ্ণের জীবনের মাঝের অধ্যায়টিই মাত্র পাওয়া যায় মহাভারতে, যা ভাগবত ও হরিবংশে আছে, তা মহাভারতের তুলনায় যথেষ্ট অর্বাচীন। ভাগবত রচিত হয় সম্ভবত সাত্বত ধর্মের অভ্যুদয় কালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতক নাগাদ, আর হরিবংশ নিঃসন্দেহে বেশীর ভাগ পুরাণের সমসাময়িক। অর্থাৎ বৌদ্ধ অবক্ষয় ও বর্ণাশ্রমের পুনরাবির্ভাব কালে, ৮ম-৯ম শতকের ঈষৎ আগে-পরে কোন সময়ে। এ থেকে অনুমান করা চলে যে কৃষ্ণ-জীবনকথার অনেকটাই কিম্বদন্তীর মধ্যে নিহিত ছিল, যা তাঁর ঈশ্বরত্বে অভিষিক্ত হবার পর গ্রন্থাকারে গ্রথিত হয়েছে। এইভাবেই

ব্রহ্মবৈবর্ত প্রভৃতি পুরাণে আরো পরে অনুপ্রবিষ্ট হযেছে রাধা চরিত্রটি এবং ভক্তিধর্মের অনুমোদন পেযে তিনিও পরমাপ্রকৃতি বা হ্লাদিনী শক্তির মর্যাদায় ভূষিতা হয়েছেন। এই দীর্ঘ কৃষ্ণকাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় যুগে-যুগে রকমারি গালগল্প ও লোককল্পনা স্থান করে নিয়েছে সন্দেহ সেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও মূল কাঠামোটা ইতিহাসাশ্রিত কেন তার, কথা ত গোড়াতেই বোঝাতে চেষ্টা করেছি। বঙ্কিমচন্দ্র তিলক, দয়ানন্দ, ভাণ্ডারকার, অরবিন্দ, সবাই সেই ইতিহাসের কৃষ্ণকে স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এরপরই আসছে আসল প্রশ্ন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও তার কুশীলবেরা সত্য কি না? লক্ষণীয যে অবাচীন বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে কোথাও এই যুদ্ধের উল্লেখ নেই, যদিও যজুর্বেদে ধৃতরাষ্ট্র নামটি পাওযা যায়, আর পাওয়া যায় সাংখ্যায়ন শ্রৌতসূত্রে ও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে পরাশর ব্যাস কৃষ্ণ বিচিত্রবীর্য ধৃতরাষ্ট্র শিখণ্ডী প্রভৃতির নামও। এইসব গ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দের মধ্যে লিখিত বলে ধরা হয়। এ থেকে যদি অনুমান করা হয যে মহাভারতের যুদ্ধটা তৎকালে, মানে খ্রীঃ পূঃ ১০ম-৯ম শতকে এমনই সুবিদিত ঘটনা ছিল যে পৃথকভাবে তার কথা না তুলেও, শুধু তার বিশিষ্ট নাযকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করলেই সবাই বুঝতে পারতেন, কি বিষয়ে কথা হচ্ছে। সাংখ্যায়ন সূত্রে দেখা যায় কুরুরা কুরুক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হন। এরই পরবর্তী প্রতিক্রিয়া কুরু-পাণ্ডবে যুদ্ধের মধ্যে প্রকাশমান হযে থাকতে পারে না কি? জ্যোতিষিক গণনার ভিত্তিতে অধ্যাপক কে. সি. ভার্মা ভারত যুদ্ধকে খ্রীঃ পূঃ ১৩শ শতকের ঘটনা বলেই সাব্যস্ত করেছেন। প্রভু বুদ্ধ, কোশাম্বীরাজ চন্দ্রপ্রদ্যোৎ এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ছিলেন পরস্পরের সমসামযিক এবং সবাই পার্জিটারের হিসাব মত ভারত যুদ্ধের পরবর্তী ২৪তম প্রজন্মের মানুষ। এক-এক শতকে তিন প্রজন্মের মেয়াদ ধরা হলে, মোটামুটি ঐ সময়টাই যে পাওযা যায় তা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও পুরাণ আলোচনায় দেখিয়েছেন বিশদভাবে। ভীষ্মের শরশয্যা কালে মাঘের শুক্লাষ্টমী তিথিতে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান যেখানে ছিল, আর আজ যেখানে আছে, তার বিচার থেকেই ভার্মা তাঁর সিদ্ধান্তে এসেছেন।

আর একটি উপায়েও হিসাব করা হয়েছে। পুরাণে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনের পর হস্তিনাপুরে প্রথম শাসকরূপে দেখা দেন বৈবস্বত মনু। একই প্লাবনের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে, গিলগামেস মহাকাব্যে, আসিরীয় চিত্রলেখে এবং বাইবেলী প্রাচীন অনুশাসনে উল্লিখিত হয়েছে বলে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন। আসিরীয় ও হিব্রু গণনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে অধ্যাপক পুশলকার তাই মনুর প্লাবনকে ৩১শ খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীর ঘটনা বলে স্থির করেছেন। প্রতি রাজার রাজ্যকাল মোটামুটি ২০ বছর হিসাব ধার্য করা হলে, মনু থেকে কুরুপাণ্ডবদের সময়

খ্রীঃ পূঃ ১২০০ আন্দাজই দাঁড়ায়। পৌরাণিক গণনার ধারা ধরে যুধিষ্ঠির থেকে প্রভু বুদ্ধের সময়টা কি দাঁড়ায়, তা ত আগেই দেখান হয়েছে। আবার মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ ও সাতবাহন রাজাদের শাসনকাল নিয়ে গণনা করেও দেখা গেছে যে ইতিহাসের সঙ্গে পুরাণের সাল তারিখের গরমিলটা খুব গণনীয় নয়। কাজেই মহাভারতীয় ঘটনার একটা ইতিহাসসিদ্ধ ভিত্তি যে পাওয়া যাচ্ছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যতগুলি সম্ভাব্য গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত, তার প্রত্যেকটার কথাই সংক্ষেপে উল্লেখ করলাম। শুধু জ্যোতিষিক গণনার প্রসঙ্গটা অনালোচিত রইল, এ বিষয়ে লেখকের ব্যক্তিগত জ্ঞানের অভাবে। শুধু বিদুর আশ্রমের এক আলোচনাচক্রে অধ্যাপক রাজা এ সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিজের কথাতেই উদ্ধৃত করছি: 'The sun's position on the Sukla astami day in the month of Magh was 318·6° and the moon was at a distance of 90° from the sun, i e. in the Rohini Nakshatra. On the Ratha saptami day, when the sun turns north, the sun's position was 316·5°, Therefore at the commencement of the Vasanta ritu, the equinox was 46.5°. Now in 1945 Vasanta ritu's beginning or the equinox was at minus 23·4°. Hence the interval between the Bharata war and the present time seem easy enough for calculation, if the intervening lapse periods are taken not of.'

৩.

এরপর আলোচ্য মহাভারত গ্রন্থের রচনা ও রচয়িতার একাত্মিকতা নিয়ে। আগেই বলা হয়েছে যে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের মূল আখ্যায়িকাটি ছিল বড় জোর ১০ হাজার শ্লোকে আবদ্ধ এবং সেটুকুই সম্ভবত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের রচনা। তার পর তাতে কালে-কালে সংযোজিত হয়েছে নানা দিকদেশের আখ্যান, নীতিকথা, তত্ত্বজ্ঞান ও দার্শনিক সিদ্ধান্ত এবং ধাপে-ধাপে তা ধরেছে ১ লক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ বিরাট এক বিশ্বকোষের আকৃতি, কাব্যত্ব যার গৌণ একটি অংশ মাত্র। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যেই বোঝা যায় যে পরের পর তিন পর্যায়ে এই রূপান্তর সাধিত হয়েছে মহাভারতের। প্রথম পর্যায়ে যখন শ্লোক সংখ্যা ছিল ৮ থেকে ১০ হাজার, তখন এর নাম ছিল জয়। তারপর শ্লোক সংখ্যা বেড়ে যখন হল ২৪ হাজার, তখন এর নাম হল ভারত। সেই ভারতেরই বিবর্তিত রূপ হল মহাভারত। এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত মহাকাব্যের জয় অংশের বক্তা ব্যাস, শ্রোতা সম্ভবত যুধিষ্ঠির এবং এর রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১১০০ থেকে ১০০০ অব্দ। দ্বিতীয় পর্যায়ে বক্তা বৈশম্পায়ন, শ্রোতা জন্মেজয়। এর রচনা খ্রীষ্টীয় ৩য়

শতাব্দী। তৃতীয় পর্যায়ে বক্তা লোমহর্ষণ ও উগ্রশ্রবা এবং শ্রোতা হলেন শৌনক প্রমুখ। এর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতক। খোদ মহাভারত থেকেই নিদর্শনের সাহায্যে বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন যদিও, তবু বলা দরকার এই বিভাজন অনেকটাই আন্দাজ-নির্ভর এবং ঠিক সেই কারণেই কতটুকু জয়, কতটুকু মহাভারত, তা যেমন নিশ্চিত করে বলা যায় না, তেমনি কোনটুকু কার লেখনী-নিঃসৃত, তারও হদিশ করা অসম্ভব।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে প্রথম পর্যায়টুকু, অর্থাৎ খাঁটি অর্থে ভারতকথা যেটুকু, তা খুবই প্রাচীন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দু-তিনশো বছরের মধ্যেই হয়ত তা লোকগাথা রূপে রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়টুকু নিঃসংশয়ে মৌর্যযুগাবসান ও গুপ্তযুগারম্ভের মধ্যকালের রচনা, কারণ সভাপর্বে আমরা পাই ইন্দো-গ্রীক, সিরীয়, রোমক ও অন্যান্য বর্হিভারতীয় জাতির উল্লেখ, যাঁদের কাছ থেকে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় কালে কর আদায় করেছিলেন বলা হয়েছে। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে আলেকজান্দারের আক্রমণ হয় ভারতবর্ষে এবং তার পরেই পত্তন হয় মৌর্য শাসনের। তার কয়েকশো বছর পরে, অর্থাৎ গুপ্ত সম্রাটদের আমলে রোমক প্রভৃতি জাতির সঙ্গে ভারতের আদান-প্রদান শুরু হয়। তাঁদের উল্লেখ তাই ঐ সময়ে বা তার কিছু পরে ভিন্ন হতে পারে না। আর তৃতীয় পর্যায়টি তৈরি হয়েছে নিঃসংশয়ে বৌদ্ধযুগের অবসান এবং কুমারিল ভট্ট ও শংকরের নেতৃত্বে হিন্দু অভ্যুত্থানের পরবর্তী কালে, কারণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সনাতন হিন্দুত্বের জন্ম, কর্মফল, মোক্ষ ও সন্ন্যাস সম্বন্ধীয় প্রত্যয়কে মহিমান্বিত ক'রে দেখানই তার লক্ষ্য। এই পর্যায়েই ভগবদগীতাকে মহাভারতের অন্তর্লগ্ন বলে গণ্য করা হয়েছে, যা কোন যুক্তিতেই মূল মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। রচনা-রীতি ও তত্ত্বজ্ঞান দুদিক থেকে বিচার করেই এই দার্শনিক কাব্যটিকে মহাকাব্যে প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য করা হয়েছে এবং যাঁরা তা করেছেন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। এই সংযোজনটি নিঃসন্দেহে হয়েছে গুপ্ত-পরবর্তী যুগে।

মোটের উপর তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত এই মহাভারতে কাহিনী, উপকথা, বীরগাথা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশবৃত্তান্ত, ভৌগোলিক প্রসঙ্গ, দার্শনিক তত্ত্ববিচার, ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কীয় অনুশাসন, যার অভিপ্রেত প্রচার হতে পারে একমাত্র মহাভারতের মত সর্বজনপ্রিয় মহাকাব্যে সন্নিবিষ্ট হলেই। এছাড়া মহাভারতকে পুরাণের পদবীভুক্ত করার জন্যে তাতে শিব ও বিষ্ণু সম্পর্কীয় কাহিনীকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই ভাবে দেড়হাজার বছর ধরে এই মহাগ্রন্থের কলেবরে চলেছে ভাঙাগড়ার পালা। প্রতি যুগেই কবি দার্শনিক ও তত্ত্বজ্ঞানীরা তাঁদের মননশীলতার সঞ্চয় মহাভারতের মহাজঠরে প্রক্ষেপ করতে করতে আদি ১০ হাজার শ্লোককে ১ লক্ষ শ্লোকে পরিস্ফীত করেছেন। এতে মহাভারতের কাব্য-শরীরে কি

ঐক্য এসেছে এবং আরিস্ততলের সংজ্ঞানুযায়ী নানাখণ্ডের সমবায়ে তা কি অখণ্ড একটি মহাকাব্য হয়ে উঠেছে, না অনিবার্য ভাবেই তার গ্রন্থনা শিথিল ও ইতস্তত স্ববিরোধী হয়েছে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। সূচনাতেই দেখিয়েছি যে বিশ্ব-সাহিত্যে দেশীয় সমসাময়িকদের মধ্যে সর্বাধিক অধিগতবিদ্য মাইকেল মধুসূদনই একদা এই সংশয়ান্বিত প্রশ্ন তুলেছিলেন। মহাভারতে ভগবদগীতার অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য কি ছিল, তারও উল্লেখ ইতিপূর্বেই করেছি। গীতার তত্ত্ববস্তু সম্বন্ধে তাঁর অভিমত নয়, তাঁর বক্তব্য মহাকাব্যের সমগ্রতা সম্বন্ধে।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি মহাভারতের গঠনে বিভিন্ন সময় ও হাতের ছাপ পড়েছে যেহেতু, তাই তাতে আদিম সমাজের অজাচার ব্যভিচার হরণ ধর্ষণ হত্যা ইত্যাদির যেমন ছড়াছড়ি হয়েছে, তেমনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবসঞ্জাত বৈরাগ্য সন্ন্যাস ও প্রব্রজ্যার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রচারিত আত্মা-পরমাত্মার তত্ত্ব এবং বর্ণাশ্রম, তপস্যা ও মোক্ষের তত্ত্ব যেমন ঠাঁই পেয়েছে, তেমনি পেয়েছে ভক্তি, প্রেম আত্মসমর্পণের তত্ত্ব। একদিকে আছে তার কঠোর নীতিনিষ্ঠা ও আদর্শবাদিতা, অটুট বীরধর্ম ও অক্ষুণ্ণ শুচিতা, অন্য দিকে আছে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা ও হিংস্র পশুত্ব, চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও বল্গাহীন বন্যতা। একই ভাবে স্বীকৃতি পেযেছে দুই চরম প্রান্ত। আঠার পর্বের সমস্তগুলি কাহিনী এবং চরিত্র বিশ্লেষণ করেই এটা দেখান যায়। দুঃখের বিষয় ততটা অবকাশ এখানে হাতে নেই। সংক্ষেপে তাই একলব্যের গুরুভক্তি, ভীষ্মের আদর্শনিষ্ঠা, গান্ধারী ও কর্ণের সত্যসন্ধতা এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্মানুরাগের অথবা কৃষ্ণের প্রজ্ঞাশীলতার পাশাপাশি স্মরণ করতে বলছি মাতৃআজ্ঞায় বেদব্যাস কর্তৃক ভ্রাতৃবধূদের গর্ভবিধানের, কুন্তীর কানীন পুত্র লাভের, পঞ্চপাণ্ডবের একই সঙ্গে দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে গ্রহণের এবং দ্যূতক্রীড়ায় তাঁকে পণ রাখার, অথবা রাজসভায় দুঃশাসনের তাঁকে বিবস্ত্র করতে যাওয়ার প্রসঙ্গগুলি। একই সমাজে একই গোষ্ঠীর মধ্যে এই পরস্পর বিরোধী আচরণের চিত্র মহাভারত মহাকাব্যকে অবশ্যই জীবন সচেতন মহৎ সাহিত্যের রাজগৌরব দিয়েছে, কিন্তু যে সমাজ ও লোকচরিত্র প্রতি-ফলিত হয়েছে এই সব চিত্রে, তাতে মূল্যবোধের মাপকাঠি সর্বত্র অবশ্যই এক নয় এবং তা নয় মহাভারত এক হাতের ও এক সময়ের রচনা নয় বলে। মহাভারতের মূল্যায়নে এই কথাটিই সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

৪.

অনেকে হয়ত বলবেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যদি সত্যি সত্যিই একটি সর্বভারতীয় মহাযুদ্ধের রূপ নিয়ে থাকে, তাহলে যেসব জনপদ তাতে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল, তার এবং হস্তিনাপুর ও কুরুক্ষেত্রের মৃত্তিকান্তরে খনন কার্য চালালে, নিশ্চয় কিছু না কিছু প্রাত্নিক নিদর্শন হাতে

পাওয়া যাবে। লক্ষণীয় যে মহাভারতে কোশল কাঞ্চী বগধ (মগধ) বঙ্গ মদ্র গান্ধার পাঞ্চাল প্রাগজ্যোতিষ পৌণ্ড্র,—নানা জনপদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে তাদের রাজা ও রাজন্যবর্গ যুযুধান দুই পক্ষের কোন না কোনটিতে যোগ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে সৈনিক সংখ্যা ছিল মোট ১৮ অক্ষৌহিনী। ১৮ অক্ষৌহিনী মানে ২১ হাজার ৮শো ৭০টি রথ, ২১ হাজার ৮শো ৭০টি হস্তী, ৬৫,হাজার ৬শো ১০ জন অশ্বারোহী এবং ১ লক্ষ ৯ হাজার ৩ শো ৫০ জন পদাতিকের নিয়োজিত হওয়া। এই সংখ্যা দুই পক্ষে সর্বসমেত দাঁড়ায় প্রায় ৪০ লক্ষ। যে যুদ্ধে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট অঞ্চল অধিকাংশই জড়িত হয়েছিল এবং ৪০ লক্ষ সৈনিক কোন না কোন ভাবে হাত মিলিয়েছিল, তা যে প্রকৃতই সর্বভারতীয় মহাযুদ্ধ, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যই কি এতখানি ব্যাপক আকারে হয়েছিল এই যুদ্ধ এবং তাতে এত বিপুল সংখ্যক সৈনিক ও সমরোপকরণ নিয়োজিত হয়েছিল? মহাভারতের সাক্ষ্যকে এ জায়গায় প্রামাণ্য বলে মনে করেন না বহু ভারততত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞানীই।

পুরাসাহিত্যে অতি ক্ষুদ্র একজন নরপতিকেও সসাগরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর রূপে চিত্রিত করা, একটি অতি ক্ষীণায়তন রাষ্ট্রকেও লক্ষ-লক্ষ নরনারী অধ্যুষিত মহা-জনপদ নামে অভিহিত করা, সাধারণ একটি গোষ্ঠী যুদ্ধকেও মহা আহব অভিধায় আখ্যাত করাই ছিল সার্বভৌম রীতি। সেই সুবিদিত রীতির ব্যতিক্রম হয়নি রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ বর্ণনাতেও। কাজেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে যত বড় করে দেখান হয়েছে, অবশ্যই তা বাস্তবে অত বৃহৎ হয় নি। ইদানীন্তন কালের প্রসিদ্ধ চীন জাপান যুদ্ধ, ইতালী আবিসিনিয়ার :যুদ্ধ, রুশ জার্মান যুদ্ধ, বিশেষত শেষোক্ত যুদ্ধের বিখ্যাত সেবাস্তপোল ও স্তালিনগ্রাদ অধ্যায় বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি সত্ত্বেও এমন বৃহৎ আকারে প্রকাশমান হয়নি। কাজেই অতিরঞ্জন ও অতথ্য পরিবেষণ অবশ্যই হয়েছে। তবে ইলিয়াড ওডিসী শাহনামা কোথায় তা হয়নি? কিন্তু তাই বলে আদৌ যুদ্ধই হয়নি বলা অসমীচীন। বৈদিক-পরবর্তী সাহিত্যে এ যুদ্ধের উল্লেখ না থাকলেও, মহাভারতীয় চরিত্রগুলির নাম যে সর্বত্র যথেষ্ট পাওয়া যায়, এ ত আগেই বলেছি। তাছাড়া খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী থেকে শুরু করে পৌরাণিক যুগের সমস্ত প্রধান গ্রন্থেই এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে, নিরুক্তে এবং ভাস অশ্বঘোষ প্রমুখ খ্রীষ্টীয় ১ম শতকের লেখকদের রচনাতেও ভারত যুদ্ধের মুখ্য চরিত্রগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন কি হিউয়েন সাং-এর আমলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রবল ছিল।

এই জন্যেই বলা যেতে পারে যে কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব বা কুরুপাঞ্চালে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব নিয়ে যে যুদ্ধ হয়, তা আসলে উত্তর ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য জাতিগোষ্ঠীর গৃহযুদ্ধ এবং তাতে দুপক্ষেরই আর্য ও আর্যেতর প্রধান-প্রধান মিত্ররাজ্যেরা হাত মিলিয়েছিল, যার ফলে তাকে সর্বভারতীয় যুদ্ধ বললে ভুল হয় না, যদিও ইদানীন্তন কালের পরিপ্রেক্ষিতে

তাকে মহাযুদ্ধ রূপে দাঁড় করাতে গেলে আপত্তি উঠবেই। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার যথার্থই বলেছেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ছিল বড় আকারের একটি গোষ্ঠীযুদ্ধ, আর তার ব্যাপ্তি হয়েছিল সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই। কিন্তু এই যুদ্ধের কোন হাতিয়ার বা অন্য কোন রকম প্রত্যক্ষ নিদর্শনই আজ পর্যন্ত মৃত্তিকান্তর থেকে খুঁজে পাওয়া যায় নি, যা দিয়ে হাতেকলমে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। ভাণ্ডারকার গবেষণা-কেন্দ্রের উদ্যোগে ডঃ দণ্ডেকার কুরুক্ষেত্র ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় যেটুকু খননের কাজ করেছেন, তাতে কোন লৌহাস্ত্র বা রথের চক্র বা হাতী ঘোড়ার কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। [মনে রাখতে হবে যে বেদে লোহার উল্লেখ আছে। আর বেদপূর্ব হরাপ্পা মহেঞ্জো-দড়োতে ছিল তামার ব্যবহার। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে তামা লোহা কোনটাই পাওয়া যায় নি]। পাওয়া গেছে শুধু পোড়া মাটির চিত্রিত কিছু হাঁড়িকুড়ি, বেদপূর্বকালীন হরাপ্পা সভ্যতার নিদর্শন রূপে যা আগেই পাওয়া গেছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে বর্তমান কুরুক্ষেত্রের সংলগ্নাঞ্চল রূপে বাগপৎ ও অহিছত্র হরাপ্পা-বলয়ের অন্তর্গত হলেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয় হরাপ্পা-মহেঞ্জোদাড়ো যুগের বহু বহু শতাব্দী সময় কালেরপরে তাই তা প্রাগার্যদের নয়, সর্বতোভাবেই বৈদিক আর্যদের যুদ্ধ এবং তার কোন প্রত্ননিদর্শন না পাওয়ায় কি এই কথাই মনে করতে হবে যে সাবেকী ভৌমিক এলাকাগুলি এখনো আমরা সঠিক খুঁজে পাইনি? সবশেষে আর একটি কথা বলেই বক্তব্যে উপসংহার টানব। নানা দিকদেশ ও সময়ের সংযোজন হেতু মহাভারতের গ্রন্থন স্থানে-স্থানে ঢিলে হয়েছে এবং তাতে পরস্পর-বিরোধী নানা তত্ত্বের সমাবেশ হয়েছে, একথা মেনে নিয়েও কিন্তু যে কোন বিচারশীল মানুষকেই স্বীকার করতে হবে যে মহাভারত গ্রন্থ হিসাবে পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। তা শুধু কাব্য নয়, ধর্মগ্রন্থ, দর্শন, ইতিহাস ও পুরাবৃত্তও; এবং যুযুধান ক্ষাত্রশক্তির দাপট অবসিত হলে, আর্য ও আর্যেতর বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীকে এক সমাজবন্ধনে বেঁধে ফেলে কৃষ্ণ যে নূতন ভারতবর্ষের ভিত্তি রচনা করেছিলেন, তার জীবন্ত ইতিহাস হল মহাভারত। তাই তার প্রকৃত নায়ক হলেন কৃষ্ণই। অন্য কেউ না। বৈদিক ভারত, বৌদ্ধ ভারত ও পৌরাণিক ভারত একসঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে তার দর্পণে এবং সেকাল ও একালের সন্ধিস্থলে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তা অক্ষয় আলোকস্তম্ভ হিসাবে। তাই মহাভারত নিয়ে মানুষের সন্ধিৎসারও শেষ নেই, গবেষণারও বিরাম নেই। এ পর্যন্ত সেই সন্ধিৎসা ও গবেষণা যা কিছু ধারণার সম্পদ পৌঁছে দিয়েছে আমাদের কাছে, তারই সারমর্ম এখানে সংকলিত হল। যাঁরা বিশদ ভাবে বিষয়টি নিয়ে অনুশীলন করতে চান, তাঁদের জন্যে কয়েকটি অনুত্তরিত প্রশ্নের গোড়াগুলি মাত্র ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি আমি, বিশেষ-জ্ঞতার কোন দাবী না রেখেই।

নৈষ্ঠিকরা ভাগবতকে বলেন পঞ্চম বেদ। সেই ভাগবতে বলা হয়েছে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এ-কথার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয় যে গোলোকপতি বিষ্ণু ও তাঁর প্রকৃতি লক্ষ্মীই যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধা রূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হন লীলা বিলাসের জন্যে। তার মানে কৃষ্ণ বিষ্ণুরই প্রকট রূপ, আর সেই কারণেই কৃষ্ণের উপাসকরা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। বস্তুত ধার্মিকদের ব্যাখ্যা যাই হক, যুক্তিবাদীদের বক্তব্য কি? কৃষ্ণ কি ঐতিহাসিক পুরুষ ? তাঁর জীবন ও কর্মের যে কাহিনী হিন্দুভারতে সুবিদিত, তার সত্যই কি কোন ভিত্তি আছে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাবৃত্ত এ জায়গায় এখনো লক্ষণীয় পরিমাণে আলোকপাত করতে পারে নি। তবে কৃষ্ণের প্রাচীনত্ব সাহিত্যের সাক্ষ্যে খানিকটা প্রমাণযোগ্য। দেবকীনন্দন বাসুদেব রূপে কৃষ্ণের নাম উল্লেখিত হয়েছে ছান্দোগ্য উপনিষদে। তার পরই দেখা যায় উত্তর ভারতে সাত্বত ধর্মের উদ্ভব হয়েছে এবং তার কেন্দ্রীয় উপাস্য রূপে চিহ্নিত হয়েছেন কৃষ্ণ বাসুদেব। ভাগবত মহাভারত ও হরিবংশ—কৃষ্ণজীবনের তিনটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এর পর। এর মধ্যে ভাগবতে কৃষ্ণের বাল্য, কৈশোর ও যৌবন বর্ণিত হয়েছে, মহাভারতে হয়েছে মধ্যবয়স, আর হরিবংশে স্থান পেয়েছে তাঁর শেষ জীবনের কথা। তিনখানি বই-ই যদিও বেদব্যাস রচিত বলে কথিত, আসলে কিন্তু এরা একে অন্যের সমসাময়িক নয় এবং বেদব্যাস কোন একজনের নাম কিনা, তা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। রচনার রীতিতে তিনটি বইয়ে পর্যাপ্ত পার্থক্য লক্ষ্য করেই প্রথম সিদ্ধান্তটি নির্ভয়ে গ্রহণ করা যায়। আর দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বক্তব্য যে এই তিনগ্রন্থ এবং এই সঙ্গে অষ্টাদশ পুরাণ কোন একজন অমিত শক্তিধর মানুষের পক্ষেও লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে একটা জিনিস এই উপলক্ষে লক্ষণীয় যে কৃষ্ণ জীবন-সম্পর্কীয় এই তিন প্রামাণ্য গ্রন্থে বা এদের পরবর্তী বিষ্ণুপুরাণে কোথাও কিন্তু রাধার নাম নেই। কৃষ্ণ-কাহিনীতে রাধা এসেছেন অনেক পরে এবং তাঁর প্রথম দেখা পাই আমরা ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, যা অনেকের বিবেচনায় ৯ম-১০ম শতকের রচনা। কাজেই রাধাকৃষ্ণের যুগলারাধনা এদেশে খুব বেশী হলে হাজার বছরের প্রাচীন, যদিও একক-

ভাবে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় সাহিত্যে তার আরো হাজার খানেক বছর আগে থেকে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে যে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতকে পাহাড়পুর মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটিতে উৎকীর্ণ রাধা ও কৃষ্ণের যে যুগল মূর্তির ছবি পাওয়া যায়, বঙ্গদেশে তাই রাধার প্রাচীনতম শিল্পরূপ। এরপর ১২শ শতকে আমরা তাঁকে পাই জয়দেবের গীতগোবিন্দে। তার আগে শিল্পে সাহিত্যে কোথাও তিনি নেই এবং একথাও বলা বোধহয় অনাবশ্যক নয় যে রাধাকে চৈতন্য-পরিকররা উত্তর ভারতে নিয়ে গেলেও, পূর্বাঞ্চলের বাইরে কোথাও তাঁর ততটা সম্মানিত স্বীকৃতি নেই। অর্থাৎ তিনি মূলত বাঙালীরই মানসকন্যা! এমনকি ব্রহ্মবৈবর্তও বাঙালীর লেখা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

এই তাহলে দাঁড়াল যে রাধা অর্বাচীন হলেও কৃষ্ণ প্রাচীন। কিন্তু কত প্রাচীন? প্রশ্নটির মীমাংসা হতে পারে একমাত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধটা ঐতিহাসিক ঘটনা কিনা এবং তা কবে হয়, প্রমাণিত হলে। বঙ্কিমচন্দ্র দযানন্দ তিলক ভাণ্ডারকার থেকে জযসোয়াল পর্যন্ত, সবাই বলেছেন খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে কুরু-পাঞ্চালে বা কুরু-পাণ্ডবে একটা যুদ্ধ হয় এবং সেটা ঐতিহাসিক ঘটনা। মহাভারতে ভীষ্মের শরশয্যা প্রসঙ্গে তৎকালীন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে, জ্যোতিষিক গণনার মাধ্যমে তা থেকেই উপরোক্ত সময়টা নির্ধারিত হযেছে। এতে মহাভারতে বর্ণিত কাহিনীর সম্ভাবিত সময়টা পাওযা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ঘটনাটা যে সত্যই ঘটেছিল, তার প্রমাণ কোথায়? হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দ্বারা হাতে কলমে প্রমাণ করার মত মালমশলা এখনো বিশেষ পাওয়া যাযনি কিছুই এবং যাঁরা পাথুরে প্রমাণ ছাডা কোন সিদ্ধান্ত কবুল করতে রাজি নন, তাঁরা এই কারণেই মহাভারতের ঘটনাকে কাহিনীমাত্র বলেই বাতিল করেন। কিন্তু তা করার পক্ষেও কোন সবল যুক্তি আছে কি? একথা আজ মোটামুটি স্বীকৃত যে বৈদিক আর্যেরা ভারতে এসেছিলেন খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ অব্দ নাগাদ। উত্তরে উপনিবিষ্ট হয়ে তাঁরা পরবর্তী কয়েকশো বছরের মধ্যে বিরাট এক দক্ষিণাভিমুখী অভিযান চালান একটানা সিংহল পর্যন্ত। তারই কাহিনী হল রামায়ণ। আরো চার-পাঁচশো বছর লাগে উত্তরে তাঁদের ভালভাবে আত্মস্থ হতে। তারপরই তাঁদের মধ্যে বাধে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বই হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, যার মূলে ছিল ক্ষত্রিয় রাজন্যদের আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। অর্থাৎ রামায়ণ হল আর্যেতর ভারতে আর্য-সম্প্রসারণের বর্ণনা, আর মহাভারত হল আর্যভারতের স্বগৃহবিরোধের বিবরণী। প্রথমটির ক্ষেত্রে অধিনায়কতায় ছিলেন অযোধ্যাপতি রাম নামক কোন নরপতি, যাঁকে এই মহৎ কীর্তির [।] জন্যেই বলা হয়েছে ভগবান। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে বিবদমান কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী রূপে ছিলেন কৃষ্ণ নামক কোন প্রাগৈতিহাসিক বীর, যাঁকে উপনিষদ বর্ণিত দেবকীনন্দন বাসুদেবের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন প্রাচীনেরা। এই মতে যেহেতু

তিনি যুযুধান ক্ষাত্রশক্তিকে উন্মূলিত করে ও আর্যে-অনার্যে সমন্বয় ঘটিয়ে হিন্দু ভারতের কাঠামো সংস্থাপন করেন, সেহেতু তাঁকেও ভগবান হিসেবে সাহিত্যে এবং শাস্ত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের অনুরাগই অলৌকিক মহিমায় আবৃত করে এইভাবে রাম ও কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে হিন্দু পুজায়তনে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং উভয়েই যেহেতু সর্বত্র গণ্য হন বিষ্ণুর অবতার রূপে, সমাজে রামায়েৎ ও কৃষ্ণায়েৎ দুই শ্রেণীই তাই বৈষ্ণব আখ্যা পেয়ে থাকেন এখন। আর এঁদের প্রকৃতিরূপিণী যথাক্রমে সীতা ও রাধাও তাই এঁদের সঙ্গেই লক্ষ্মীর অংশ হিসেবে পুজার অধিকারিণী হয়ে ওঠেন কালক্রমে।

এইভাবে ব্যক্তি মানুষের ঈশ্বর-পুরুষে রূপান্তরসাধন সব যুগে, সব দেশেই হয়ে থাকে। জরথুস্ত্র, কংফুৎস, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, শংকর, চৈতন্য, সবাই ত আসলে মানুষ ছিলেন। ক্রমে তাঁদের মহৎ কীর্তিই তাঁদের ঈশ্বরত্বে উন্নীত করেছে। তখন অজস্র অলৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে তাঁদের মহিমার পরিচায়ক হিসাবে। রাম ও কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম হয়নি মনে করলে তাই ভুল হবে না। নিছক হাওয়ার ওপর কস্মিনকালেও কোনও দেশে এতবড় ও এমন সর্বাত্মক সংস্কৃতির পরিমণ্ডল তৈরি হতে পারে না। দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে ও পুজোপাসনায় রাম ও কৃষ্ণকথার পরিব্যাপ্তিই প্রমাণ করে যে গোড়ায় সত্যের ভিত্তি কিছু ছিল এবং আছে। সেই ভিত্তিটুকু মনে রেখেই রাম ও কৃষ্ণকে আমি ঐতিহাসিক চরিত্র বলে গণ্য করি এবং ভারতেতিহাসের কোন্ পর্বে ও কি পরিবেশে তাঁদের আবির্ভাব সম্ভব হয়, তা ত এই আলোচনার গোড়াতেই দেখাতে চেষ্টা করেছি। তবে এই সূত্রে এটুকু বলে রাখা বোধ হয় অপ্রয়োজনীয় নয় যে, যাকে নিউক্লিয়াস বা ছাঁচ বলে, সব কিছুর মধ্যে মাত্র সেইটুকুই হয়ত সত্য। তারপর কবির কল্পনা ও ভক্তের অতিভক্তি রং চড়াতে-চড়াতে সব কিছুকে এমন এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে, যেখানে সত্য মিথ্যার ভেদ মুছে গেছে, সব কিছুই হয়ে পড়েছে আজগুবী অথচ উপভোগ্য রূপকথার মত, যা থেকে সত্যের কঙ্কাল খুঁজে বের করা দুষ্কর। কিন্তু তাই বলে রামায়ণ মহাভারতে কোথাও সত্যের অস্তিত্ব নেই বলা চলে কি? কুরুপাণ্ডবে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল, এই ঘটনাটুকু মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা মানা হলে ত তাকে ইতিহাসের ঘটনা বলেই স্বীকার করতে হয় এবং সে যুদ্ধে যাঁর ভূমিকা সব চেয়ে বড় এবং যিনি কেন্দ্রীয় পুরুষ রূপে সমগ্র যুদ্ধটিকে সুনির্দিষ্ট একটি পরিণতির মুখে নিয়ে যান, সেই কৃষ্ণ কাজেই মিথ্যা হতে পারেন না। অবশ্য যিনি দেবকীনন্দন বাসুদেব, তিনিই যে রাধিকারঞ্জন কৃষ্ণ, আবার তিনিই যে পার্থসারথি কৃষ্ণ, একথা জোর করে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই হয়ত করা যায় না। তবে ভাগবতে, মহাভারতে ও হরিবংশে বর্ণিত কৃষ্ণকথায় সামগ্রিক ছকে কোথাও খুব বড় রকমের অসঙ্গতি চোখে

পড়ে না। তাতেই মনে করা যেতে পারে যে রাধিকা না হলেও কৃষ্ণ ইতিহাসের চরিত্র এবং তাঁর আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী নাগাদ, কারণ ঐ সময়ের কিছু আগে-পরেই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় পুরাবৃত্তকার ও ইতিহাসবিদ্‌রা সেকথা মোটামুটি সবাই স্বীকার করেন। এ অবস্থায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের যে-সব আধুনিকতা-সম্মত উদ্যোগ আয়োজন চলছে, তা যত দিন না একটা লক্ষণীয় সাফল্যের মাটিতে পা রাখছে, ততদিন চলতি ঐতিহ্যের অনুবৃত্তি হিসাবে তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে ও তার অধিনেতা কৃষ্ণকে এক কথায় নস্যাৎ না করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে প্রাগৈতিহাসিক ভারতের প্রখ্যাত লোকনেতা কৃষ্ণ বাসুদেব ধীরে-ধীরে ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারায় লোকাবতারে পরিণত হয়েছেন, আর তাঁকে বেষ্টন করেই ভক্তিবাদী হিন্দুর ধর্মায়তনে যুগল-আরাধনাভিত্তিক একটি পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে।

২

পৌরাণিক সাহিত্যে ঐশ্বরিক মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্যে কৃষ্ণের জীবনে যে সব অলৌকিকতা বা আতিশয্যের অবতারণা করা হয়েছে, তা বাদ দিলে জীবন্ত একটি মানুষী কাঠামোই যে পাওয়া যায় ব্যক্তিমানুষটির, তাতে আর সন্দেহ নেই। জ্ঞানে কর্মে বুদ্ধিতে ব্যক্তিত্বে এই মানুষ পুরানো পৃথিবীর সাহিত্যে প্রায় অদ্বিতীয় বলা যেতে পারে। তাঁর জীবন শ্রী ও ঐশ্বর্যে যেমন, শৌর্য ও সংঘাতে তেমনি বিচিত্র। আর আগেই বলেছি যে পরের পর তিনখানি গ্রন্থে, ভাগবত, মহাভারত ও হরিবংশে বর্ণিত হলেও, এই জীবনকথায় কোথাও লক্ষণীয় স্ববিরোধিতা নেই কিন্তু। বন্দী পিতামাতা বসুদেব-দেবকীর পুত্ররূপে কংস-কারাগারে তাঁর জন্ম। জন্মলগ্নেই তিনি কারাগার থেকে কোনও উপায়ে অপসারিত হয়ে বৃন্দাবনে নীত হন এবং সেখানে নন্দ ও যশোদার সন্তান রূপে লালিত হন। সান্দীপনীর চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নে, গোপশিশুদের সঙ্গে গোচারণে এবং মুগ্ধা গোপকুমারীদের সঙ্গে লীলাবিলাসে অতিবাহিত হয় তাঁর কৈশোর। যৌবনে রোহিনীপুত্র বলরাম-সহ তিনি মথুরায় যান এবং সম্মুখযুদ্ধে কংসকে নিহত করে পিতামাতাকে মুক্ত করেন। মথুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তারপর তিনি জরাসন্ধ, শিশুপাল শ্রেণীর দুর্বৃত্তকে পর্যুদস্ত করেন, দ্বারকা অধিকার করেন এবং রুক্মিণী ও সত্যভামাকে সহধর্মিণী রূপে গ্রহণ করেন। এরপরই তাঁকে দেখা যায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় কূটনৈতিক উপদেষ্টা রূপে এবং যুদ্ধান্তে যখন সারা ভারতবর্ষে যুযুধান ক্ষাত্রশক্তি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং আর্য-অনার্যে গড়ে উঠছে অনিবার্য কারণেই একটি সমন্বয়িত সামাজিক ছাঁচ, তখন আমরা তাঁকে দেখি প্রভাস তীর্থে আত্মোৎসর্গের জন্যে প্রতীক্ষা-নিরত প্রবীণ রূপে। স্বগোষ্ঠীর আচারভ্রষ্ট যদুদের

অধঃপতনে নৈরাশ্যজনিত মৃত্যু উপস্থিত হয় তাঁর বার্ধক্যে। এই বিচিত্র ইতিহাসের সঙ্গে কে জানে কখন যুক্ত হয়েছে বৃন্দাবন অধ্যায়ের রাধা-প্রসঙ্গ এবং কুরুক্ষেত্র অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অর্জুনের প্রতিবোধনার্থে উচ্চারিত গীতা-প্রসঙ্গ, যার দুটোই সম্ভবত প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্তী সময়ের উদ্ভাবন। রাধার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আগেই বলেছি। গীতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে মহাভারতের কাঠামোটি আদিতে যা ছিল, তাতে মূল গ্রন্থে দশ হাজার মাত্র শ্লোক ছিল এবং সেটুকু বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের পাঁচশো বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। তারপর যত দিন গেছে, তত নানা দিক-দেশের কাহিনী, উপকথা, তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যার্থবিচারকে স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে কুড়িয়ে এনে মহাভারতের মহাজঠরে অনুপ্রবিষ্ট করান হয়েছে, যার ফলে বাড়তে-বাড়তে তার শ্লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লক্ষ। গীতাও এসেছে এই ভাবেই এবং খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতক নাগাদ গুপ্ত সম্রাটদের আমলে সাময়িক হিন্দু অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে তা রচিত হয়েছে বলেই মনে হয়। ৮ম-৯ম শতকে শংকর তারপর লেখেন তার টীকা। শ্রীধর আরও কিছুকাল পরে।

গীতা যে একটি সংলাপবদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ দার্শনিক কাব্য এবং অবশিষ্ট মহাভারতের রচনারীতির সঙ্গে তার মিলের চেয়ে যে গরমিলই বেশী, এ যে-কোনও যুক্তিমান মানুষই স্বীকার করবেন। বস্তুত ধর্মনিষ্ঠ মানুষরা যতই গীতাকে স্বয়ং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী বলে স্বীকার ও প্রচার করুন, রবীন্দ্রনাথের অভিমতটাই এক্ষেত্রে সর্বতোভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেন গীতার বাচ্যবস্তু যতই মূল্যবান হোক, মহাভারতের কাব্যশরীরে সেটা যে স্বাভাবিক অধিকারে আসে নি, গায়ের জোরে জায়গা দখল করেছে, এ মানতেই হবে। কিন্তু থাক সে কথা। কৃষ্ণজীবনের মূল কাঠামোটা কী, বলেছি এবং তাতে দেখিয়েছি যে প্রেমিক যোদ্ধা কূটনীতিজ্ঞ দার্শনিক ও সন্ন্যাসী-রূপে অসাধারণ এই চরিত্রটির সত্যিই তুলনা হয় না। প্রসঙ্গত আমার মনে হয় অত্যাচারী কংসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানর অপরাধেই বোধহয় বসুদেব দেবকীর কারাদণ্ড হয়েছিল। আর বৃন্দাবনের গোপশক্তি সংহত করে বাহিনী গঠনের ফলেই কৃষ্ণের পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়েছিল কংসকে অত অনায়াসে পর্যুদস্ত করা। আজীবন জনগণের জীবন থেকে অভিন্ন বলেই কৃষ্ণকে অন্যান্য মহৎ অভিধার সঙ্গে এক হিসাবে পিপল'স ম্যান বা জন-গণের মানুষ বলেই মনে হয় আমার। কিন্তু এই মানব বা মহামানব কৃষ্ণ ক্রমশ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছেন সুবিপুল ভক্তিশাস্ত্রের আড়ালে। ভাগবতে যদিও তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলেছে, সাত্বতরা তাঁকে পূজায়তনে ঠাঁই দিয়েছেন এবং গোলাকপতি বিষ্ণুর অবতার রূপে তিনি নৈষ্ঠিক সমাজে পেয়েছেন পুরাণপুরুষের মর্যাদাও, তবু তিনি মানুষ এবং সুখ দুঃখ কামনা বেদনা ও সংশয় সংঘাতের অচ্ছেদ্য শৃংখলে বাঁধা জন্ম মৃত্যুর অধীন

মানুষ, ব্যাস থেকে শঙ্কর পর্যন্ত সকলেই এটা কবুল করেছেন। কিন্তু এই ছক আমূল পাল্টে গেল শঙ্করাচার্যের বৈদান্তিক ভক্তদের হাতে। রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব এবং কতকাংশে চৈতন্যও, কৃষ্ণের মানুষী সত্তা মুছে দিয়ে তাঁকে ভাবময় এক চিন্ময় তত্ত্বরূপে নূতন করে গড়ে তুললেন। শঙ্কর ব্রহ্মকেই একমাত্র নিত্য বস্তু বলে চিহ্নিত করেন এবং জগৎ ও জীবনকে বলেন তার মায়িক অভিব্যক্তি, অবিদ্যাবশে যা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। রামানুজ এই নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদকে ঘষে-মেজে বিশিষ্টাদ্বৈতে পরিণত করলেন। তিনি বলেন ব্রহ্ম এবং জগৎ দুইই সত্য, তবে তারা অনন্যনির্ভর এবং প্রেম ভক্তির মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নিম্বার্ক-এবং-মধ্বে এসে নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ এই ব্রহ্ম পরিণত হলেন কৃষ্ণে এবং তাঁর হ্লাদিনী শক্তিরূপে দেখা দিলেন রাধা। আর রাধারই 'ভাবদ্যুতিসুবলিততনু' বলা হয় চৈতন্যকে।

আসলে মনে করলে ক্ষতি নেই যে ১১শ-১২শ শতকে দক্ষিণ ভারতে নাথমুনি যমুনাচার্য প্রভাবে যে-আলোয়ার বা আলাবর ভক্তিসাধকরা উঠেছিলেন, তাঁদের প্রবর্তিত গোদা নাপ্পিনায়ী ও পুরুষোত্তমের যুগল-উপাসনা পদ্ধতিই ১৪শ-১৫শ শতকে নিম্বার্ক এবং মধ্বকে হয়ত অনুপ্রাণিত করেছিল রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বটি দর্শনায়িত করতে। বাংলা আসাম ও অপরাপর পূর্বাঞ্চলীয় বলয়ে বৌদ্ধ সহজিয়াদের মধ্যে ছিল নরনারীর যে যুগ্ম সহজসাধন, তা গীতগোবিন্দে উপস্থাপিত কৃষ্ণলীলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যুগলারাধনায় রূপায়িত হয়েছিল কিনা, সে কথাও অবশ্য এই উপলক্ষে ভেবে দেখার যোগ্য। কাশীতে দার্শনিক মধ্বাচার্যের সঙ্গে চৈতন্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল, একথা চরিতামৃতে উল্লেখিত হয়েছে। তাছাড়া চৈতন্য দক্ষিণেও যান। সেখানে তিনি রায় রামানন্দের প্রভাবে দক্ষিণী বৈষ্ণবতত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন একথাও ভাবা যেতে পারে, কারণ জনশ্রুতি আছে দক্ষিণ থেকে চৈতন্য অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের পাণ্ডুলিপি বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত কিন্তু স্পষ্টতই জয়দেবের প্রভাবে রচিত; এ থেকে অনুমান করি গীতগোবিন্দ দূর অতীতেই সর্বভারতে ব্যাপ্ত হয়েছিল, বোধ হয় রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা তার পিছনে ছিল বলেই। নাপ্পিনায়ীই পরে রাধার প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ান এবং পুরুষোত্তম আর কৃষ্ণও পরস্পরের অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন হন হয়ত এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়েই। মোটের উপর পার্থসারথি ইতিহাস-পুরুষ কৃষ্ণ-বাসুদেবই শুধু এইভাবে রাধাবল্লভ কৃষ্ণ হয়ে পড়েন নি, যুক্তিসর্বস্ব বেদান্ত দর্শনও তার জাত খুইয়ে, ভক্তি-বিহ্বল যুগলারাধনার দর্শন রূপেই বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত নামে সারা দেশে খ্যাত হয়েছে। চৈতন্যের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব বলা বাহুল্য এখান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। কিন্তু এই সূত্রে যে মৌল প্রশ্নটি ওঠে, তাও এড়িয়ে গেলে চলবে না। বৈষ্ণবীয় যুগলারাধনাকে যদিও বেদান্তের অনুগামীরূপে নেওয়াই প্রথাসিদ্ধ, আসলে কিন্তু তা

বেদান্তের চেয়ে সাংখ্য দর্শনেরই কাছাকাছি। আদিম এনিমিষ্ট সর্বেশ্বরবাদী মানুষেরা পিতৃদেবতা ও মাতৃদেবতার পূর্ণ বা আংশিক প্রতীক রূপে মাটি পাথর ও গাছ ইত্যাদির পুজো করতেন। তা থেকেই তৈরি হয় পিতৃদেবতা ও মাতৃদেবতার প্রতিভূরূপী শিব-শক্তির যুগল উপাসনা এবং তন্ত্রব্যাখ্যাত পুরুষ ও প্রকৃতি বা জড় ও চেতনার অচ্ছেদ্যতা আশ্রয় করে তার ওপরই কোনও সময় গড়ে উঠেছে সাংখ্য দর্শন। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়াদের সাধন প্রণালীর আড়ালে এই পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্বটিই স্থূলভাবে প্রচ্ছন্ন আছে এবং আরো পরবর্তী ধাপের বৈষ্ণব ধর্মও এই মূল কাণ্ড থেকেই উৎসারিত, যদিও শিবশক্তি হয়েছেন রাধাকৃষ্ণে রূপান্তরিত এবং তার উৎস বলে সাংখ্য নয়, দোহাই দেওয়া হয়েছে বেদান্তের। তবে লক্ষণীয় যে, চিন্তা চর্যা ও সাধনপ্রণালীতে মিল ছিল বলেই, নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র আউল বাউল সহজিয়া প্রভৃতি সমাজচ্যুত মানুষদের চৈতন্যের প্রভাবে নিয়ে আসতে এবং গৌড়ীয় কৃষ্ণায়েৎদের ইষ্টগোষ্ঠী পুষ্ট করতে সমর্থ হন এত অনায়াসে। শোনা যায় সহজিয়াদের প্রভাবশালী কোনও গুরুর নাম ছিল নারা। তা থেকেই নেড়ানেড়ি বা কর্তাভজা নামে অভিহিত হতেন তাঁরা এবং পুরাতন এই অভিধাটি তাঁদের কৌল পরিচয়ের ক্ষীণ সাক্ষ্য রূপে বেঁচে আছে আজও। গুরু বা কর্তা কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন, কে আর? স্বয়ং গোবিন্দ। অর্থাৎ কৃষ্ণ। বাংলায় কৃষ্ণ আরাধনার এই প্রাচীনতম রূপটি জন্মেছিল বোধহয় এঁদের মধ্যেই।

৩

আগেই বলেছি যে পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটিতে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি উৎকীর্ণ হয় খ্রীষ্টীয় ১০ম শতক নাগাদ কোন সময়ে। তারপর রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাস নিয়ে জয়দেব লেখেন গীতগোবিন্দ ১২শ শতকে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এবং মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় আরো শো দুই বছর পরের সৃষ্টি। প্রাক্‌চৈতন্য কালের রাধাকৃষ্ণলীলার আদি চেহারাটা পাওয়া যায় এসবে। পাওয়া যায় বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীতেও। চৈতন্য এবং তাঁর অনুগামী রূপ জীব সনাতন প্রমুখ পণ্ডিতরাই জৈব ভাবপুষ্ট এইসব আদি কৃষ্ণকথাকে দর্শনায়িত করে তার জাত্যন্তর বিধান করেন। তা থেকেই সৃষ্টি হয় প্রেমধর্ম নামক কথাটি এবং এই প্রেমধর্ম বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে সর্বভারতে ব্যাপ্ত হয়, যেহেতু গোস্বামীরা ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি সন্দর্ভ গ্রন্থ লেখেন সংস্কৃতে। এই সমস্ত রচনার মাধ্যমেই চৈতন্যব্যাখ্যাত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব যেমন প্রচারিত হয়, তেমনি কৃষ্ণ এবং রাধা ও গোপাঙ্গনাদের সম্পর্কটি স্বকীয়তা না পরকীয়তার পর প্রতিষ্ঠিত, তারও চুলচেরা বিচার শুরু হয়ে যায়।

এই উপলক্ষে গড়ে ওঠে দুটি দল, একদল স্বকীয়তাবাদী, যার মধ্যে গণনীয় নাম হল রূপ এবং জীব গোস্বামীর। অন্য দল পরকীয়াবাদী, যার প্রধান প্রবক্তা নরহরি, চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং গোবিন্দভাষ্যখ্যাত বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভৃতি। এঁদের মতে কৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষিতা মাত্রেই কৃষ্ণবধূ কারণ স্বয়ং পুরুষোত্তম যিনি, তিনি কখনোই পারদারিকতার পাপে লিপ্ত হতে পারেন না। বস্তুত এই সব তর্কের অবতারণা করা থেকে মাত্র একটা কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, কৃষ্ণকে পুরাণ থেকে টানতে-টানতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা যেখানে নিয়ে এসেছেন, সেখানে তাঁকে গ্যে লোথারিও অব বৃন্দাবন বা বৃন্দাবনের রঙ্গিলা লম্পট বলে মনে হবারই সমূহ কারণ আছে। কিন্তু বৈষ্ণবরা সতর্কতার নিদর্শন হিসাবে এই জন্যই তাঁর মানবিক পরিচয়পত্রটি হরণ করে নিয়ে, তাঁকে নিত্য-বৃন্দাবনে লীলা-নিরত শাশ্বত কান্তপ্রেমের ভাববিগ্রহে এবং রাধাকে তাঁর হ্লাদিনী শক্তিতে রূপান্তরিত করে ছেড়েছেন। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের চোখে গৃহসংসারবিমুক্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত ধর্মে রতিরসের এই প্রাবল্য বাস্তবিকই বিভ্রান্তিকর ঠেকে! লক্ষণীয় যে, চৈতন্যের সমকালে বা ঈষৎ পরে ভারতের অন্যান্য অংশে কবীর দাদু মীরা রজ্জবালি শংকরদেব ভক্তনরসী নামদেব প্রভৃতি আর যেসব ভাবসাধকের আবির্ভাব হয়, তাঁদের ভজনাদিতে আবেগের তীব্রতা থাকলেও, আদিরসের এই আধিপত্য নেই। এটা বোধ হয় গৌড়বঙ্গের সহজিয়া ঐতিহ্যের প্রতিফলন। ১৯শ শতকে নূতন শিক্ষাদীক্ষার আলোয় বাঙালী সমাজ যখন নূতন মূল্যবোধে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের মাধুর্য তাঁদের মনোহরণ করেছিল অপূর্ব রোমান্টিক কবিতা হিসাবে। কিন্তু রসতত্ত্বকে তাঁরা কি চোখে দেখেছিলেন, রামমোহন রায়ের নির্মম নিবন্ধেই মিলবে তার যৎকিঞ্চিৎ আভাস।

ব্রাহ্মদের এই শুচিবায়ু হিন্দুদের মধ্যে অবশ্য ছিল না, কিন্তু ভাগবতের কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং মন্তব্যটি তাঁদেরও মনঃপূত হয় নি। 'অনায়ারাধিতো গোবিন্দ' কথাটি নিয়ে ভক্তেরা যতই লাফালাফি করুন, বুদ্ধিবাদী বাঙালী ওর মধ্যেও কিন্তু মোটেই রাধাকে আবিষ্কারের চেষ্টা করেননি। তাঁদের একাংশ রাধা-কৃষ্ণকে লায়লা-মজনু শিরী-ফরহাদ বা রোমিও-জুলিয়েতের মত যুগল প্রেমের আদর্শ রূপে দেখেছেন এবং কাব্যে গানে সেই প্রেমকে মহিমান্বিত করেছেন ; আর একাংশ রাধাকে সম্পূর্ণ ছাঁটাই করে পূর্ণ মানবতার প্রতীক হিসাবে পার্থসারথি কৃষ্ণকে পুনর্বসতি দিতে আগ্রহী হয়েছেন। মধুসূদনের (অবশ্য তিনি খ্রীস্টান হয়েছিলেন, ; কিন্তু মনেপ্রাণে হয়েছিলেন কি?) ব্রজাঙ্গনা ও রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ প্রথমের এবং বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র ও নবীন সেনের রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্যত্রয়ী দ্বিতীয়ের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। দুপক্ষের কেউই কিন্তু ভাগবতী মহিমায় সমাচ্ছন্ন করে দেখেন নি বা দেখতে চাননি কৃষ্ণকে। ১৯শ শতকীয় মানবতাবোধের প্রাণবন্ত প্রভাবের দিনে তা সম্ভবই ছিল

ছিল না। কৃষ্ণকে তখন থেকেই ইতিহাস-পুরুষরূপে সন্ধানের সূত্রপাত হয় এবং অনুশীলনতত্ত্বে দত্তপ্রত্যয় বঙ্কিমই হলেন সেই পথে অগ্রনায়ক স্বরূপ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ১৯শ শতকে শুধু বুদ্ধিবিমুক্তির ইতিহাসই রচিত হয় নি, রচিত হয়েছে তার বন্ধনের ইতিহাসও। যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলনের বেগকে প্রতিহত করার জন্যে আমরা দেখি তার পিঠ-পিঠ উঠেছে ভক্তিবাদী সনাতনী হিন্দু-পুনরভ্যুত্থানের আন্দোলনও এবং চিরাচরিত শাক্ত ও বৈষ্ণব দুই শাখাতেই আবির্ভূত হন একে-একে এমন-সব অবতারকল্প-বলে-বিবেচিত মানুষরা, যাঁদের কাছে প্রায় বিনা তর্কেই যুক্তিবাদীরা পরাভব স্বীকার করতে থাকেন ধীরে-ধীরে। এই পরাভূত প্রগতিশীলদের মধ্যে প্রথম হলেন কেশবচন্দ্র সেন, যিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে নব-বিধান সমাজ গঠন করেন এবং ব্রহ্মের পিতৃত্ব নাকচ করে দিয়ে তাঁকে অভিষিক্ত করেন

মাতৃত্বে! অর্থাৎ তাঁর ব্রহ্ম হন ব্রহ্মময়ী। নিশ্চিতই এটি পরমহংসের প্রভাবসম্ভূত। এছাড়া বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ অগ্রণী ব্রাহ্মরা হন ভক্তিবাদী বৈষ্ণব। বিজয়কৃষ্ণের প্রভাবেই প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী বিপিনচন্দ্র পাল ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং চিত্তরঞ্জন দাস বৈষ্ণব শিবিরে অনুপ্রবিষ্ট হন। ব্রজেন্দ্রনাথ লেখেন বেঙ্গল বৈষ্ণবিজম নামক পুস্তক, যাতে খ্রীষ্টীয় ১ম শতকে ভারতে আগত সেন্ট টমাসের অনুচরদের প্রচারিত ক্যাথলিক প্রেম-ভক্তি দর্শনের প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি—এই তথ্য প্রমাণের চেষ্টা হয়। এই মত অবশ্য শীল মহাশয় পরে বদলান। বিপিনচন্দ্র কেশবচন্দ্রের ইণ্ডিয়া আস্‌কস হু ইজ যীশাস ক্রাইস্ট বইয়ের সম্পূরক রূপে লেখেন ইউরোপ আস্‌কস হু ইজ কৃষ্ণ নামক বই, যাতে সুফী প্রেমতত্ত্বের ও ক্যাথলিক বিরহতত্ত্বের সঙ্গে গৌড়ীয় ভক্তিতত্ত্বের তুলনীয় আলোচনা করে তিনি তিনের মধ্যে একটি আত্মিক একত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। দুটি রচনাই বৈদগ্ধ্যে বিশিষ্টতার পরিচায়ক, যদিও পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতায় আজ আমরা জেনেছি যে দক্ষিণী উৎসের খবর না জানায় তাঁরা কেউই সমস্যার সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে পারেন নি। শিশিরকুমার লেখেন অমিয়নিমাইচরিত, যাতে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে কলিতে চৈতন্য আবির্ভূত হয়েছেন, ষড়্‌ গোস্বামীর এই সিদ্ধান্তকেই সবিস্তারে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। আশা করি অনেকেই জানেন যে, গৌরনাগরবাদ নামে একটা মতবাদের জন্ম হয়েছিল চৈতন্যকে ঘিরে ১৬শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। এই মতের অনুবর্তীরা বলতেন চৈতন্যই যেহেতু স্বয়ং কৃষ্ণ, (অর্থাৎ পুরুষোত্তম), সেই হেতু তাঁর সেবক বৈষ্ণব মাত্রেই প্রকৃতি এবং তাঁদের কর্তব্য রতিভাবে আবিষ্ট হয়ে তাঁকে ভজনা করা। শিশিরকুমার এই মতকে অনুসরণ করতেন কিনা জানিনা, তবে তিনি এবং জগদ্বন্ধু ভদ্র এই মতের অনুকূলে সশ্রদ্ধ ব্যাখ্যান রেখে গেছেন তাঁদের রচনায়। মোটের উপর বৈষ্ণববাদ পুনরুজ্জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নানামুখে প্রসারিত

এই উত্তমগুলি বঙ্গদেশে দেখা দিতে থাকে গোটা ১৯শ শতাব্দী জুড়েই। ২০ শতকের গোড়ার দুই দশকেও চলে তার অনুবৃত্তি। তার পরই আসে বিপরীতমুখী ঢেউ। ঈশ্বরাস্তিত্বেই মানুষের প্রত্যয় টলে যেতে থাকে যেখানে, ঈশ্বরাবতারে আর প্রত্যয় আসবে কোথা থেকে? ভক্তজনবাঞ্ছিত ধর্মীয় পরিমণ্ডলে রেখে কৃষ্ণ ও চৈতন্যের চর্যা তাই ধীরে-ধীরে সীমিত হল গিয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এবং বৃহত্তর বিদ্বৎ সমাজে আরম্ভ হল প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের আলোয় বিষয়টি অনুধ্যান। তারই অনুষঙ্গ রূপে আজ প্রশ্ন উঠেছে, কৃষ্ণ কি ইতিহাসের মানুষ? ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাত্রাপথে কোনও এক সময় সত্যিই কি তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন? এ-প্রশ্নের পক্ষে-বিপক্ষে বলার কথা যা ছিল, সবই উপরে বলা হয়েছে। বক্তব্যের পরিসর আরও বাড়বে বর্তমানে যেসব প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি চলছে তার পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান তৈরি হলে। তবে এ-কথার পুনরুক্তি করলে বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে ইতিহাস ও কবিকল্পনার আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ-বাসুদেব হয়েছেন এক অত্যাশ্চর্য চরিত্র, যাঁর তুলনা গোটা পৃথিবীতে মিলবে না। চৈতন্য যিনি কৃষ্ণেরই প্রকট বিগ্রহ বলে ভক্তসমাজে কীর্তিত, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা বোধহয় এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ বহির্ভূত। এইটুকু বললেই হবে যে উচ্চে ও অনুচ্চে, অস্তিবানে ও নাস্তিবানে ভেদরেখা মুছে দেওয়ার এবং অগৃধ্নু, নিষ্কিঞ্চনতার উজ্জ্বল আদর্শ প্রচারের দ্বারা তিনি এক ধরণের সাম্যবাদের পূর্বাভাস যেমন দিয়েছিলেন, তেমনি শোষণভিত্তিক সমাজ ও বিভেদভিত্তিক প্রশাসনের বিরোধিতা করে বলিষ্ঠ জননেতৃত্বের পরিবেশও গঠন করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তি-সম্পর্কিত অন্যান্য প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শুধু এই দুটি কথা মনে করলেই ত তাঁকে আমরা আজকের মন ও মানুষের অনেকখানি কাছেই নিযে আসতে পারি। কে বলতে পারেন যে, যে-মানসিকতা কৃষ্ণকে নিছক রাধিকারঞ্জন ও গোপী-মনোমোহন নটবর সাজিয়েছে, সেই মনোভাবই চৈতন্যকেও দিব্যোন্মাদ দশাপ্রাপ্ত প্রেমার্দ্র নায়ক সাজিয়ে তাঁর যথার্থ বিদ্রোহী সত্তাটিকে গোপন করতে চেয়েছে কিনা। কেই বা জানেন যে, বৃন্দাবন কৃষ্ণদাস লোচন মুরারি কর্ণপুর রূপ জীব নরহরি বিশ্বনাথ ও বলদেব বিদ্যাভূষণের দর্পণে চৈতন্যকে আমরা আজ যেমনটি দেখি, আসল মানুষটি ঠিক তেমনই ছিলেন কিনা।

।। চার ।। ভারত-ইতিহাসের যাত্রাপথে ভগবদগীতা

সব ধর্মেরই থাকে একটি তত্ত্বের দিক, আর একটি থাকে অনুষ্ঠানের দিক। জগৎ এবং তার অন্তর্লগ্ন জীবনপ্রবাহের আদিকারণ-সম্বন্ধীয় প্রত্যয়, জীব-জীবনের লক্ষ্য, কৃত্য ও চরম পরিণতি সম্পর্কীয় বিধিবিধান, জৈব ও অজৈব পৃথিবীর মধ্যে ঐক্য-অনৈক্যের স্বরূপ নির্ণয় ইত্যাদি নিয়ে ধর্মের তাত্ত্বিক বিভাগটির কারবার। আর পূজা, প্রার্থনা, আহার, উপবাস, ইন্দ্রিয়শাসন এবং শাস্ত্রব্যবস্থিত সৎকর্মাদির অনুষ্ঠান হল ধর্মের ফলিত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যাবুদ্ধি ও বিচারশক্তির তারতম্য অনুসারে ধর্মের এই দুই বিভাগের যে কোনওটার ওপর মানুষ গুরুত্ব বা লঘুত্ব আরোপ করে থাকেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে সাধারণ নরনারীর কাছে অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি ও আচরণের ইতিনেতিই প্রাধান্য নেয় ধর্ম হিসাবে। তত্ত্ববিচার বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যসাপেক্ষ, তাই তা সর্বজন-অধিগম্য নয়। তবে আনুষ্ঠানিক আনুগত্যের মত প্রত্যয়ের অন্ধ আনুগত্যও চলে পুরুষানুক্রমে হস্তান্তরিত হয়ে এবং না জেনে না বুঝে বহুজনই যেমন বিচিত্র পূজা উপাসনা স্নান পান ও ব্রত নিয়ম পালন করেন, তেমনি যুক্তি ও চিন্তার আলোয় কিছুমাত্র যাচাই না করেও রকমারি প্রত্যয় বা তত্ত্বকথাও তোতা পাখীর মত আওড়ে চলেন। কাজেই ধর্ম বলতে ঠিক কি বোঝায় এবং কোনখানে তার সীমানা বাঁধতে হবে, সে প্রশ্ন তুললে নাকাল হতে হয় বিশেষ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেও। অবশ্য বদ্ধমূল ধারণায় অচল-প্রতিষ্ঠদের এ অসুবিধাটা নেই।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে ইসলামের পার্থক্য নির্দেশ করে ইংরেজ পণ্ডিত ওয়েস্টব্রুক হিস্ট্রি অব রিলিজিয়ন বইয়ে লিখেছেন, হিন্দুরা মুসলমানদের মত গোমাংস খান না, আর মুসলমানরা হিন্দুদের মত পুতুল পুজো করেন না, এই হল দুইয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। আর প্রধান পার্থক্য হল হিন্দুরা শবদাহ করেন, মুসলমানরা করেন মৃতদেহ সমাধিস্থ। বলাবাহুল্য এ বিচার অসত্যও নয়, অতথ্যও নয়। কিন্তু তবু একি সম্পূর্ণ বিচার? অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর হেরিটেজ অব ইণ্ডিয়া বা ভারতের ঐতিহ্য নামক বইয়ে লিখেছেন, শঙ্করাচার্য ৮ম শতাব্দীতে যে অদ্বৈত বেদান্তভিত্তিক অনির্বচনীয় ও সর্বতোব্যাপী ব্রহ্মের তত্ত্ব প্রচার করেন, তা তিনি পেয়েছিলেন ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে হজরত

মহম্মদের প্রচারিত অনির্বচনীয় সর্বশক্তিমান আল্লার তত্ত্ব থেকে। তার আগে হিন্দুরা হয় পৌত্তলিক নয় নিসর্গ-উপাসক ছিলেন। এও কি সঠিক বিচার? জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, জীবনের কৃত্যাকৃত্য এবং পরিণতি সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলীম প্রত্যয়ের মধ্যে কোথায় মৌল ঐক্য, কোথায় পার্থক্য, ওয়েস্টব্রুক তা লক্ষ্যই করেন নি। অধ্যাপক কবীরেরও খেয়াল হয়নি যে প্রভু মহম্মদের অনেক আগেই উপনিষদ লেখা হয়েছে এবং তাতে অরূপ অনির্বচনীয় সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র, (শঙ্করকৃত অদ্বৈত বেদান্ত যার ভাষ্য বলে বিবেচিত) ঈশ, কেন ও ব্রহ্মোপনিষদের আগে না পরে লেখা, তা অবশ্য অদ্যাবধি নির্ধারিত হয় নি। তবে ও দুইই যে খ্রীস্টপূর্ব যুগের কোনও সময়ে রচিত, এতে আর সন্দেহ নেই। তাছাড়া হিন্দু-ধর্মের গণ্ডী ত শুধু অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বেই সীমিত নয়। তার আছে আরো নানা বিভাগ উপবিভাগ এবং তারাও অর্বাচীন নয় কেউ। কিন্তু অধ্যাপক কবীর সে-সবের কথা বলেনই নি। অতএব দেখা যাচ্ছে দুজন বিশিষ্ট পণ্ডিত দুরকম ভুল করেছেন দুটি ধর্মের আপেক্ষিক মূল্য নিরূপণে।

প্রসঙ্গটির উল্লেখ করছি শুধু এইটুকু বোঝানর জন্যে যে কী ধর্ম, আর কোন্‌খানে তার প্রকৃত প্রাণবস্তু নিহিত, তা নিরূপণ করতে বিদ্বান ব্যক্তিদেরও পদে-পদে বিচার-প্রমাদ হয়। কাজেই সাধারণ নরনারীর যে তা হয়ই এ নিয়ে ত তর্কের আদৌ অবকাশ নেই। অথচ নিজের ধর্মের সেই প্রাণবস্তুটি পুরোপুরি না চিনলে এবং অন্যান্য মুখ্যধর্মের সঙ্গে তার মিল-অমিলের দিকগুলি তুলনায় উপলব্ধি না করলে তথাকথিত ধর্মচর্চা পণ্ড-শ্রম ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এই পণ্ডশ্রমে পৃথিবীর পনের-আনা মানুষই দত্তপ্রত্যয়, তাই সবাই নিজ ধর্মের একনিষ্ঠ সিপাহী এবং আপন ধর্মের মহিমা ব্যাপ্ত করার বা মর্যাদা রক্ষার নামে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মাথায় বাড়ি দিতে বা গলায় ছুরি বসাতেও দ্বিধা করেন না। আশেপাশে সামনে-পিছনে লক্ষ-লক্ষ ক্ষুধিত রুগ্ন ও নিঃশেষিত সর্বস্বান্ত মানুষ যখন ধুঁকছেন, তখন মন্দিরে গির্জায় সাইনাগগে মসজিদে সারা বিশ্বের ঐশ্বর্য একত্র করে অদেখা অজানা অপ্রমাণিত বিশ্বপতির তুষ্টিবিধান করছেন যুগের পর যুগ ধরে, আচার্য পাদ্রী রাব্বি ইমাম ও পুরোহিতরা! জিজ্ঞাসা করুন তাঁদের কারোকে ধর্ম বলতে কি বোঝেন, ধর্মের সঙ্গে অধর্ম বা না-ধর্মের তফাৎ কোথায়, তাহলে সত্যিকার জবাব দিতে কিন্তু কেউই পারবেন না। অথবা যে জবাব দেবেন, তা নিছক কতকগুলি বাঁধা বুলির আবৃত্তি। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর মাটি এই অবুঝ মানুষদের ধর্মঘটিত খুনোখুনিতে কতবার রক্তাক্ত হয়েছে, মানুষে-মানুষে কি বিরাট ভেদের গণ্ডী সৃষ্টি হয়েছে, ইতিহাসের যে-কোনও অমনোযোগী পাঠকও তা জানেন। সেইজন্যে ইতিহাস-সচেতন ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠ মন নিয়েই ধর্ম এবং তার অনুষঙ্গ-বিষয়ক বই পুঁথি লিখিত হওয়া উচিত। নান্য পন্থা বিদ্যতে!

কিছুকাল আগে সেই রকম একখানা বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল। বইটির নাম দ্য রোল অব ভগবদ্‌গীতা ইন ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি। লেখক সাংবাদিক প্রেমনাথ বাজাজ একেবারে বেদ আরণ্যক উপনিষদ কল্পসূত্র যুগ থেকে পুরাণ ইতিহাস এবং বৌদ্ধ জৈন অভ্যুদয়ের সময় পর্যন্ত, আবার হিন্দু পুনরভ্যুদয়ের যুগ থেকে ইসলাম, বৃটিশ ও স্বাধীনতা-পরবর্তী কাল পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের সুদীর্ঘ অগ্রযাত্রার পটভূমিতে রেখে হিন্দুদের ধর্মপ্রত্যয়, সমাজবিকাশ ও ধর্মচর্যার যথার্থ স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিচারের আংশিক অবতারণা করেছিলেন শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে তাঁর আদিম সাম্যবাদ থেকে আধুনিক দাসত্ব-বিষয়ক বইতে, তারপর করেছিলেন দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী তাঁর ভারত-ইতিহাসের পর্যালোচনা-সম্পর্কীয় বইয়ে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মনু থেকে মার্ক্স এবং অপরাধ ও কর্মফল নামক বই দুখানিতেও আছে প্রসঙ্গটির বিবিধ দিকের বিচার। আছে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতীয় সমাজবিকাশের ধারা বইতেও। কিন্তু ধর্মের তাত্ত্বিক ও আনুষ্ঠানিক দুই সমান্তরাল প্রবাহের আলোয় তুলে ধরে দীর্ঘ ইতিহাসের এই গতিপথ পূর্বাপর বিশ্লেষণ শ্রীবাজাজের আগে আর কেউ করেছেন বলে মনে পড়ছে না। বইটি তাই অস্বচ্ছন্দ ইংরেজী সত্ত্বেও অশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। লেখকের পর্যাপ্ত অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ এতে ছত্রে-ছত্রে যেমন ফুটেছে, তেমনি ফুটেছে অসীম সাহসও—যার অভাবে অনেক জানা, বোঝা ও ভাবা কথাও ব্যক্ত করতে ভরসা পান না বহু বিদগ্ধ মানুষই। অবশ্য বুঝ্‌মানের চেয়ে গতানুগতিক মত ও পথের অনুবর্তীরাই যে দুনিয়ায় বেশী, এ ত বলারই দরকার নেই! আর বিশেষ-বিশেষ মতলব হাসিলের জন্যে গোঁজামিল দেনেওয়ালার সংখ্যাও যে কম না, তাও ত না বললেই চলে বোধহয়!

কিন্তু দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, পুরাবৃত্ত ও সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে লেখক যখন ভারতীয় জীবন এবং মননের সর্বাত্মক সমীক্ষা করছেন, তখন ভগবদ্‌গীতার ভূমিকাকে তাঁর আলোচনায় ধ্রুববিন্দু বলে গণ্য করেছেন কেন, এ প্রশ্নও উঠতে পারে। প্রশ্নটিকে তিনি নিজেই প্রত্যুদ্‌গমন করে নিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। গীতাকে যেহেতু সুপ্রাচীন কাল থেকেই ঈশ্বরের বাণী এবং হিন্দুর ধর্ম কর্ম আচার সংস্কার ও ধ্যান ধারণার সার্থক সংক্ষিপ্তসার ভাবা হয়েছে, তাই গীতার গণনীয় তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক পর্যালোচনাগুলির মাপকাঠিতে প্রতিযুগের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনধারা বিশ্লেষণ করলেই আমাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর অন্তর্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হবে, এই কথা বলেছেন সেকাল ও একালের বিজ্ঞজনেরা। অর্থাৎ গীতা হল হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি মেড ইজি! কথাই আছে উপনিষদ হল ধেনু, শ্রীকৃষ্ণ তার দোহক এবং দুগ্ধ হল গীতা, যার মধ্যে বিধৃত আছে জ্ঞান কর্ম, বিবেক, বৈরাগ্য ও মোক্ষের সমুদয় তত্ত্ব। গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ? শংকর, শ্রীধর স্বামী, আনন্দগিরি থেকে

দয়ানন্দ সরস্বতী, বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী পর্যন্ত বহু ভারতীয় মহাজনই গীতার এই সার্বভৌম মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন। উইলকিন্স, কোলব্রুক, এমার্সন, এডুইন আর্নল্ড প্রমুখ বিদেশী বিদ্বানরা এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সাদ্তে, শেলী প্রমুখ কবিরা গীতার মধ্যে পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইন্টিমেশন ওডে এবং শেলীর এডোনিস শোকগাথায় বিশ্বরূপ দর্শনের ছায়া প্রতিভাত হয়েছে বলেছেন অনেকেই। মাত্র সেদিনও পারমাণবিক বিস্ফোরণের উজ্জ্বল ভয়াল রূপকে মার্কিন বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার গীতায় অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

সুতরাং হিন্দুত্বের ঘনীভূত প্রকাশ বলে গৃহীত এই গীতা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুগুলি কি এবং তা জানলেই হিন্দু জীবনচর্যার আদ্যোপান্ত জানা হয় কিনা, সে চিন্তা মনে উদয় হতেই পারে। গীতায় বলা হয়েছে ঈশ্বর, আত্মা, অদৃষ্ট ও মোক্ষ এই চার সনাতন, প্রত্যয়ের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে জীবন। সমাজের বিশাল সৌধ হল সেই জীবনের আশ্রয় আর পরের পর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ নিজ-নিজ গুণকর্ম অনুযায়ী শ্রম দিয়ে সেই প্রবহমান সমাজের শ্রীসম্পদ বৃদ্ধি করছেন। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ হলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারী ও ধর্মাধিনেতা রূপে ভবপারেরও কাণ্ডারী। ক্ষত্রিয়ের হাতে প্রশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহের এবং বৈশ্যের হাতে শিল্পবাণিজ্যের সার্বিক নেতৃত্ব। শূদ্রের করণীয় আর কিছুই নয়, শুধু উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা। তিনি তাই হবেন কৃষক, দেহশ্রমী, কারিগর ও পরিচারক। অতএব তাঁর শিক্ষা নিষিদ্ধ, স্বাধিকার সীমিত, অথচ শূদ্র পুরুষের মেহনত এবং শূদ্রা নারীর ইজ্জতে বেপরোয়া অধিকার আছে উপরতলার মানুষদের। এই যে বিধান, এ শাশ্বত এবং এখানে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। যা কিছু হচ্ছে বা হবে সবই পূর্বনির্দিষ্ট। এবেরই নিয়ামক ঈশ্বর। ব্যক্তির কর্তব্য শুধু ফললোভহীন নিরাসক্ত মন নিয়ে কর্ম করে যাওয়া। অর্থাৎ একদিকে জাতিভেদ ও অদৃষ্টবাদ, অন্য দিকে অকৈতব ব্রহ্মানুগত্য হল ভগবদ্গীতার চরম বা পরম তত্ত্ব এবং ওপরতলার কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার রূপেই পরিকল্পিত হয়েছে গ্রন্থটি। নিঃসন্দেহ বৈদগ্ধ্যের দ্যুতিতে যেমন সমুজ্জ্বল এই গ্রন্থ, কাব্যগুণেই তেমনই অনবদ্য ; তবু সর্বকালের সত্য বলে গ্রহণীয় কি এর কোনও নির্দেশই ?

অবশ্যই না। কিন্তু হিন্দুসমাজ বরাবর আঁকড়ে আছে এই প্রত্যয়গুলি। জন্মের সঙ্গে কর্মফলের এবং সমাজের সঙ্গে উচ্চনীচ বিভেদের সম্পর্ক যেমন তার লোকজীবনে চিরদিন অনতিক্রম্য, ঈশ্বরের অনন্ত ধ্রুবতা ও জগতের আপেক্ষিক অস্তিত্ব সম্পর্কীয় ধারণা তেমনি তার ভাবজীবনে সুচিরস্বীকার্য। বেদোত্তর কাল থেকে মহাভারত ও মনু হয়ে তা সোজা আজকের দিন পর্যন্ত চলে এসেছে। যদিও সাংখ্য ও বৈশেষিক

দর্শনে যথাক্রমে জড় ও চেতনের এবং পরমাণু ও পঞ্চ তন্মাত্রার কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যায়নের প্রয়াস হয়েছে এবং চার্বাক ও কেশকম্বলী প্রমুখ দার্শনিকরা বস্তুনির্ভর বিশ্বতত্ত্বও প্রচার করেছেন বটে, কিন্তু সমাজের নিষ্ঠুর মুষলাঘাতে তা সর্বদাই চুরমার হয়ে গেছে। বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের বস্তুবাদের প্রেরণায় আচরণভিত্তিক নূতন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন, প্রায় হাজার বছর লোকজীবনে প্রভুত্ব করেছেন এবং ছোটবড়র ভেদাভেদ মুছে দিয়ে সাম্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা আর তারই প্রাথমিক প্রয়াসরূপে সর্বজনীন শিক্ষা ও সেই শিক্ষার মাধ্যম রূপে কথ্য ভাষা পালি প্রাকৃতের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। কিন্তু টেঁকে নি তাও। সেই অদৃষ্ট কর্মফল এবং ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যই গ্রাস করেছে তাকে শেষপর্যন্ত। ৮ম শতকে কুমারিল ভট্ট ও শংকরের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধবিলুপ্তি ও সনাতনীদেরই জয়-জয়কারই হয়েছে ফের। নিগৃহীত শূদ্রেরা ১২শ শতকে আগত মুসলমানদের ধর্ম গ্রহণ করে এবং হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই নিয়েছেন তার প্রতিশোধ। এই শতকে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে তারই দূরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসাবে।

২

ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য তত্ত্বই যে হিন্দু জীবনচর্যার মূল ভিত্তি এবং যুগ-পরম্পরায় তা যে অনড় একত্ব নিয়ে হস্তান্তরিত হযে চলেছে, এ ত সুপ্রমাণিত কথা। এই কারণেই যে-কোনও বিদ্বান ব্যক্তিই গীতা থেকে নিজের মনোমত ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করতে পেরেছেন। দয়ানন্দ তা থেকে বিশুদ্ধ বৈদিকধর্ম উদ্ধার করেছেন। তিলক তাতে পেয়েছেন অদ্বৈত-বেদান্ত। বঙ্কিম পেয়েছেন নিরাসক্ত কর্মসাধনা। অরবিন্দ পেয়েছেন অতিমানববাদ। গান্ধী পেয়েছেন অহিংসা। সন্ত্রাসবাদীরা পেয়েছেন অগ্নিমন্ত্র। বস্তুত এর সবই কোনও-না-কোনও আকারে গীতায় সুলভ্য। তাইতেই তথাকথিত অগ্নিযুগের সৈনিকরা যখন গীতায় পকেটে নিয়ে পিস্তল চালাতেন, তাতে কেউ বৈলক্ষণ্য দেখতে পান নি কিছু। রোনাল্ডস্রে গীতাকে যখন :নরঘাতনের দর্শন বলেছেন, তাও অনেকের মতে অগ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয় নি। অর্থাৎ গীতা একটি পরস্পর-বিরোধী মত, পথ ও চিন্তার হোয়াট নট বা সর্বজ্ঞরগজসিংহ বিশেষ। এ কথা হয়ত বলার প্রয়োজন নেই যে, গীতা মহাভারতেরই একটি অংশ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনায় অর্জুন আত্মীয়বিনাশে অনিচ্ছুক হয়ে যুদ্ধ পরিহারে উন্মুখ, তখন কৃষ্ণ তাঁকে যুদ্ধে প্রবর্তিত করছিলেন যে-সমস্ত তত্ত্বোপদেশ দিয়ে, তাই গীতায় শ্লোকাকারে গ্রথিত হয়েছে। বলাই বাহুল্য এই সব তত্ত্বকথা নিয়ে লেখক পৃথক গ্রন্থরূপেই আগে গীতা লিখেছিলেন। পরে সম্ভবত তার স্থিতির কথা ভেবেই গোটা বইটিকে মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট করান হয়েছে। মূলের আনুষঙ্গিক রূপ আদিতে কখনোই আঠার

অধ্যায়ের এই কাব্যে লেখা হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এই দিক থেকে ভেবেই বলেছেন যে গীতার বক্তব্য যতই মূল্যবান হক, মহাভারত কাব্যকহিনীতে তা স্বাভাবিক গতিতে আসার বদলে অহেতুক জায়গাই জুড়েছে বেশী।

মহাভারতের কাব্যদেহে গীতার অনুপ্রবেশকে কবি যে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেছেন, তা অকারণ নয়। সমগ্র মহাভারতের মধ্যে যে একটি কাহিনীগত গতির স্বাচ্ছন্দ্য আছে, তা হোঁচট খায় গীতায় এসে। এর রচনাশৈলী দৃঢ়বদ্ধ এবং আগাগোড়া তাত্ত্বিক ও দর্শনঘেঁষা। এই কারণেই একে পরবর্তী কালের সংযোজন বলে ধরা হয়। কিন্তু সে যাই হোক, আগেই বলেছি যে গীতাকে হিন্দু ভারতে সর্বদেশ ও সর্বকালীন সত্যের কোষগ্রন্থ এবং স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বলেই ধরা হয়। সমস্ত নৈষ্টিক ব্যাখ্যাই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও এই মোদ্দা কথাটিই মানা হয় যে ঈশ্বরই একমাত্র সত্য। জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নেই, অবিদ্যাজনিত মায়ায় আমরা তাকে সত্যরূপে দেখি। আত্মা অবিনশ্বর তাই কর্মজনিত বিপাকে মানুষ জন্মজন্মান্তর ধরে পরিভ্রমণ করে, কর্মক্ষয় হলে লাভ করে মোক্ষ। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই, যা কিছু হয় বা করতে হয় মানুষকে, সবই ঘটে প্রাক্‌ব্যবস্থিত ঐশ্বরিক বিধানরূপে! সমাজের স্তরভেদ, মানুষে-মানুষে সুখ দুঃখের তারতম্য, সবই হয়েছে ও হয় বিধাতৃ-নির্দেশে! অতএব তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ বশ্যতা এবং আকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম সাধনাই হল কল্যাণের উপায়! সর্বোপরি গীতায় বলা হয়েছে যখনই অধর্মের অভ্যুত্থান হয় স্বয়ং ঈশ্বর অবতারপুরুষরূপে নিজেকে সৃষ্টি করেন এবং দুষ্কৃতদের খতম করে সদ্ধর্ম সংস্থাপন করেন। এই যদি সার্বদেশিক ও সার্বকালিক সত্য হয়, তাহলে সভ্যতার অগ্রযাত্রা কি একদিনেই স্তব্ধ হয়ে যায় না? অন্যদেশের কথা থাক, ভারতবর্ষেই কি এই সব তত্ত্ব সার্বিক নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত বা পালিত হয়েছে?

বলাবাহুল্য মোটেই তা হয় নি। সুপ্রাচীই কালেই দেখি ভারতবর্ষে বস্তুবাদী দর্শন রচিত হয়েছে। গণিত জ্যোতির্বিদ্যা আয়ুর্বেদ রসায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে জগৎ ও জীবনের বস্তুভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রচারিত হয়েছে বৌদ্ধ ও জৈনেরা ঈশ্বরাস্তিত্বের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে সন্নীতি এবং জীবকল্যাণকেই একমাত্র শ্রেয় কর্ম বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু সনাতনীদের কায়েমি-স্বার্থসম্ভূত প্রতিরোধ যুগে-যুগে এই দ্বিতীয় শিবিরের কণ্ঠরোধ করেছে। এমন কি ১৯শ শতকে বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে যখন আমাদের সনাতনী ধ্যানধারণার ভিত্তি আমূল নড়ে গেছে, রুশো ভোলতেয়ার পড়ে কেউ সমসাময়িকভাবে সাম্যবাদের প্রবক্তা হয়েছেন, কেউ মিল বেনথাম ডারউইন হার্বার্ট স্পেন্সার পড়ে সাময়িকভাবে নাস্তিক্যবাদ প্রচারে মেতেছেন, তখনও আমাদের মনের বাতাবরণ বদলায়নি। তাই এই সব ক্ষণবিপ্লবীই পরবর্তী জীবনে কেউ কোঁৎ

পড়ে অনুশীলন তত্ত্বপ্রচার করেছেন, হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ফেঁদেছেন, কেউ পিতৃ-পুরুষের ধর্মকর্ম ত্যাগ খ্রীস্টান পাদ্রী হয়েছেন এবং বিখ্যাত হয়েছেন হিন্দুদর্শনের ওপর বই কেতাব লিখেই। ব্রাহ্ম হয়ে কেউবা লিখেছেন বৃদ্ধ হিন্দুর মনোবেদনামূলক নিবন্ধ। বঙ্কিম কেশব বিবেকানন্দ অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবান্ধব এই ঐতিহ্যে দত্তপ্রত্যয় ছিলেন বলেই আমাদের স্বদেশী আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, কংগ্রেসী আন্দোলন, সবই ধর্মের রঙে অনুরঞ্জিত হয়েছে এবং তার অনিবার্য ফলস্বরূপ একদিকে উগ্র হিন্দু স্বাজাত্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উঠেছে মুসলীম স্বাজাত্যবোধ এবং তা অবশেষে ডেকে এনেছে ভারত বিভাগের অপরিহার্য দুর্ভাগ্য।

আমাদের সৌভাগ্য যে রবীন্দ্রনাথ অসীম প্রাণশক্তির বেগে মধ্যবয়সে পা দিয়েই এই অণ্ডাবরণ ভেঙে বাইরে এসেছিলেন এবং হয়েছিলেন দেশকাল ও ধর্মের গণ্ডীমুক্ত বিশ্বমানবতার পূজারী। কিন্তু দেশ তাঁর সেই বিবর্তনকে বুঝতে চায় নি। শেষ জীবনে তিনি হয়েছিলেন কতকটা পর্যন্ত নিরীশ্বর বস্তুবাদে বিশ্বাসী এবং ধীরে-ধীরে হয়ে উঠেছিলেন ক্ষুধাতৃষ্ণা ও পাপতাপে নিমগ্ন সাধারণ মানুষের সুহৃদও। কিন্তু পণ্ডিতী বিচারে তাঁকে ভারতীয় ভাবচেতনার মূর্তবিগ্রহ রূপেই অচলপ্রতিষ্ঠ রেখেছে চিরদিন। শান্তিনিকেতন-বক্তৃতামালা গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য এবং স্বদেশী যুগের গান ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ থেকে তাই তাঁর আর ছুটি হয়নি। এই যে আমাদের অনড় মানসিক প্রবণতা, একেই শ্রীবাজাজ বলেছেন গীতা-মনস্কতা। অর্থাৎ গীতা গ্রন্থটিকে তিনি একটি প্রতীক স্বরূপ নিয়েছেন, সেইজন্যেই তাকে পটভূমিতে রেখে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজবোধের সামগ্রিক আরোহ অবরোহ এবং গতিপ্রকৃতিকে যাচাই করেছেন।

স্বীকার করতেই হবে যে ভারতীয় জীবন ও মননের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গীতার সত্যই একটি গণনীয় ভূমিকা আছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ ভূমিকা প্রগতি ও মানব মঙ্গলের সহায়ক নয়, বরং পদে-পদে পরিপন্থী এবং গীতার আগে থেকেই হিন্দু ভারতে এই মানসিকতা বীজাকারে সমাজচেতনায় নিহিত ছিল। গীতায় হয়েছে সেই সবেরই সমীকরণ এবং তার অতিপ্রচারে অপরাপর গোষ্ঠীর চিন্তাধারাও গেছে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত হয়ে। কাজেই শ্রীবাজাজের এই গীতামুখী ইতিহাস-পর্যালোচনা উৎকেন্দ্রিক হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না।

আসলে আমাদের মনের মৃত্তিকা থেকে ঐতিহ্যাশ্রয়ী অন্ধ ধারণার শিকড় সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। তা না হলে যুগে-যুগে যতই নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হক আমাদের চোখে, যতই অভিনব দর্শন ও জীবনচিন্তা আলোকপাত করুক আমাদের মনে, আমরা এক ও অপরিবর্তনীয় থেকে যাব। যুগের হুজুগ থেমে গেলেই দেখা যাবে আমাদের জীবনে ও মননে আগেও যা ছিল পরেও তাই আছে। মাঝে যেখানে যেটুকু ব্যতিক্রম ঘটেছিল, তাকে সনাতনী চুণ বালিতে রাতারাতি চৌকষ করে নিতে

বেশী সময় লাগবে না। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও কৃষ্ণকমলকে আমরা হিন্দুয়ানির গঙ্গাজলে শোধন করে নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে এখন করছি। মানবেন্দ্র, মুজফফর আহমদ, ভূপেন দত্ত, কেউই হয়ত রক্ষা পাবেন না আমাদের কবল থেকে ! মার্কসবাদে-গান্ধীবাদে, বিজ্ঞানে এবং ঈশ্বর ও আত্মা-নির্ভর ভাববাদী দর্শনে, জাতীয়তায়-আন্তর্জাতিক সাম্যে, সন্ত্রাসে-অহিংসায় যে অদ্ভুত জগাখিচুড়ী বানাতে জানি আমরা, তা এই শতাব্দীর দুই ও তিনের দশক থেকে সাতের দশক পর্যন্ত সাহিত্য কলা কৃষ্টি, সমাজবোধ ও রাজনীতিক প্রবাহের একটানা ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যাবে। একেই আমরা সগর্বে বলি বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য এবং তাকে বৃহৎ একটি কৃতিত্ব বলে ঘোষণা করি। শ্রীবাজাজ এই পুরুষাক্রমিক ভ্রান্তি ও মূঢ়তার ইতিহাসকে চিহ্নিত করে সত্যিই একটি বড় কাজ করেছেন।

॥ বুদ্ধ কনফুসিয়াস লাউৎজে যীশু এবং মহম্মদ : সংস্কৃতি-জিজ্ঞাসুর চোখে ॥

।। এগার ।। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের বিপ্লবী ভূমিকা

আমার আলোচনার বিষয় হলেন বুদ্ধ, যাঁকে পুরা পৃথিবীর সর্বাধিক প্রিয় মানুষ নামে অভিহিত করেছেন সভ্যতার ইতিহাস-ব্যাখ্যাতা ওয়েস্টফেল। সেই সঙ্গেই তিনি এও বলেছেন যে, সবার চেয়ে কম বুঝেছে মানুষ যে সব মহামানুষকে, বুদ্ধ তাঁদের মধ্যেও অগ্রগণ্য। বুদ্ধ যা-যা বলে গেছেন, তার ঠিক বিপরীত কথা তাঁর মুখে বসিয়ে সমারোহ-সহকারে আজ তাঁকে পুজো করছে পৃথিবীর মানুষ। একই সঙ্গে এমন জগৎ জোড়া সমাদর ও এতটা অনুপলব্ধি ঘটেছে বোধ হয় খুব কম মহাপুরুষের ভাগ্যেই। অধ্যাপক ওয়েস্টফেলের সিদ্ধান্তটা একটু যাচিয়ে দেখা যাক। কারণ আমারও ধারণা বর্ণাশ্রমগর্বী হিন্দুসমাজ বৌদ্ধধর্মের বিপ্লবী ভূমিকাটি শুধু বিকৃত করেই দেখায়নি, বুদ্ধের জীবন ও বাণীর ঠিক উল্টো ব্যাখ্যাও প্রচার করেছে, নিজেদের কায়েমি স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। আজ বুদ্ধ শান্তি ও অহিংসার সমর্থকরূপে উচ্চ কোটির মানুষদের এত আদরণীয়, তার কারণ তিনি যা চেয়েছিলেন তার কিছুই হতে দিইনি আমরা। তাঁকেই ভেঙে গড়ে নিয়েছি আমরা আমাদের মত করে। সবাই জানেন বুদ্ধ বেদ ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তা করেছিলেন চার বর্ণে বিভক্ত সমাজ বিন্যাসের বিরুদ্ধে। প্রচার করেছিলেন সাম্য ও শুচিতার বার্তা। তুলে ধরেছিলেন ভেদবিভেদ বিমুক্ত নূতন এক সঙ্ঘ-জীবনের আদর্শ। আর এই জন্যেই সনাতনীরা বুদ্ধের ধর্মকে নিরীশ্বর নাস্তিক্যবাদ বলে ধিক্কৃত করেছিলেন। নিগ্রহ ও লাঞ্ছনার দ্বারা বৌদ্ধদের উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। করেও ফেলতেন হয়ত, যদি না অশোকের মতো শক্তিশালী সম্রাট তাঁদের রক্ষক হতেন।

অথচ দেখে অবাক হতে হয় যে, এই বুদ্ধই পরে হিন্দু দশাবতারের অন্যতম রূপে গৃহীত হয়েছেন এবং ষড়ৈশ্বর্যের পরিচায়ক ভগবান অভিধাটি তাঁর নামের আগে যুক্ত হয়েছে। শুধু এই নয়; শাক্ত শৈবদের এবং নাথপন্থীদের পূজায়তনে তিনি নিরঞ্জন বা ধর্মঠাকুর রূপে শিবত্ব লাভ করেছেন এবং ধূপধুনো ও নৈবেদ্য সহযোগে পূজিত হচ্ছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে দৃশ্যত লোপ পেলেও কার্যত তা বৃহৎ হিন্দু-পরিমণ্ডলেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে এবং তান্ত্রিকতা-প্রভাবিত বিচিত্র লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে

আত্মপ্রকাশ করছে। এ কেন হল, হলই বা কেমন করে? সেই কথাতে আসছি এবার। আজকের দিনে কে না জানেন যে বৈদিক আর্যেরা ভারতে আসার আগে এদেশে আর একটা বৃহৎ সভ্যতা ছিল। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা থেকে তার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে বলে, কেউ, কেউ তাকে মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাও বলেন। সে সভ্যতা যে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে। আর সে সভ্যতার অধিকারীরা যে ধর্মমতে শৈব শাক্ত অর্থাৎ আদি পিতা ও আদি মাতার উপাসক ছিলেন, এও কূটতার্কিক না হলে মেনে নিতে অসুবিধা নেই। সেখানকার মাটি থেকে শিব ও শক্তির প্রতীক বা মূর্তি পাওয়া গেছে, যা নিঃসংশয়ে এটাই প্রমাণ করে যে ঐ দুটিই প্রাগার্য দেবতা এবং তাঁদের মহিমাত্মক আগম ও নিগম এই দুই শাখায় বিভক্ত তন্ত্রও প্রাগার্য ধর্মশাস্ত্র?

এর থেকেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে মহেঞ্জোদড়ো ও হরাপ্পার সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর আর্যদের ঘোড়ার খুর ও লোহার হাতিয়ারে এবং সেই সুসভ্য শাক্ত শৈব গোষ্ঠীর একাংশ আস্তে-আস্তে মিশে গিয়েছিলেন বিজয়ী আর্যদের সঙ্গে, আর এক অংশ ভূমিদাসরূপে তাঁদের কৃষক, কারিগর ও সিপাহীবাহিনী পুষ্ট করেছিলেন। এই শেষোক্ত দলই হলেন ভারতের শূদ্রশ্রেণী, যাঁরা সর্ববিধ সামাজিক ও রাজনীতিক অধিকারে বঞ্চিত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী অপ্রতিবাদে পাড়ি দিয়েছেন কঠিন বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজে। আর প্রথমোক্ত দল রাজনীতিক দিক থেকে বিজিত হয়েও বিজয়ী হয়েছেন এই অর্থে যে নিসর্গ-উপাসক যজ্ঞাচারী আর্যদের তাঁরাই শিখিয়েছেন ভক্তিবাদ-প্রভাবিত পিতৃমাতৃ-আরাধনা। আর্যদের পূজায়তনে শিব শক্তি বিষ্ণু লক্ষ্মী প্রভৃতি আর্যেতর দেবতার প্রতিষ্ঠাতাও তাঁরাই। এ সিদ্ধান্ত করছি এইজন্যে যে বেদপর্যায়ে অথর্ব সর্বশেষ বলে কথিত হলেও, অথর্বের ভাষা কিন্তু ঋগ্বেদের চেয়ে অর্বাচীন ত নয়ই, বরং ঢের বেশী প্রাচীন ও দুর্বোধ্যই মনে হয়। আর তন্ত্রের সঙ্গে অথর্বের প্রাণগত ঐক্য কত বেশী তা ত যে কেউ কয়েকখানি তন্ত্র মন দিয়ে পড়লেই বুঝবেন।

এতেই ধারণা করছি, আদি তন্ত্রগুলি অধুনা অজ্ঞাত কোনো প্রাগার্য ভাষায় লেখা হয়েছিল, যা আর্য-দ্রাবিড় মিশ্রণের পর সংস্কৃতে অনুবাদ হয়েছে। আর অনার্যদের আদি গ্রন্থ অথর্বও তখনই বেদ রূপে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনও সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হয়েছে যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য দর্শনের সঙ্গে। প্রজ্ঞাসম্পন্ন আর্যেতর জাতিগোষ্ঠীগুলির মনকে এভাবে ভিন্ন পোষ মানানোর আর ত উপায় ছিল না। আর তা করতে না পারলে বাইরে থেকে উপনিবিষ্ট আর্যদের পক্ষে স্থিতিশীল ও সমাজবদ্ধ সভ্যতাও গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু আর্যে-দ্রাবিড়ে যে-মিশ্রণ, তা হয়েছিল শুধু সমাজের ওপর তলায়। নীচু

তলায় পরাজিত দ্রাবিড়রা যাপন করেছেন বঞ্চিত ভূমিদাসের জীবনই। তাঁরা পাননি কোনো রকম শিক্ষাদীক্ষা, কোনো রকম সুবিচার সদ্ব্যবহার। তাঁদের কোনো সন্তান তপস্যা করলে রাজহস্তে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়েছে, যেমন হয়েছে শম্বুকের। অস্ত্রবিদ্যা শিখলে গুরুহস্তে হয়েছে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ, যেমন একলব্যের। দৈবক্রমে তাঁদের কোনও কন্যা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মাতৃত্ব লাভ করে বরণীয় হয়েছেন হয়ত। কিন্তু শূদ্রী বা দাসী রূপেই অসম্মানিতা হয়েছেন তামাম মহিলা সম্প্রদায়।

এগুলি গল্পই সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা জিনিস ও থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে শূদ্র জাতির পুরুষের মেহনত ও নারীর ইজ্জতের ওপরই গড়ে উঠেছে আর্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ইমারত। তার ফলেই তাঁরা হারিয়েছেন তাঁদের সেই সুমহান সভ্যতার ঐশ্বর্য, যা সৃষ্টি করেছিল মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও লোথাল এবং যা থেকে উঠেছিল সাংখ্য বৈশেষিক গণিত আলকেমি রসায়ন। দ্রাবিড় জাতির এই যে পতন, আমার মতে এই হল ভারতেতিহাসে মনুষ্যত্বের প্রধানতম পরাভব। জাতিভেদ ও অধিকারভেদ তৈরি হয়েছে এর মাটি দিয়েই, তৈরি হয়েছে পরবর্তীকালে সর্বাধিক অনৈক্যের প্রতিমা। অথচ সেই প্রতিমাগুলিকেই আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করেছি জাতিগত ও সাংস্কৃতিক কৌলীন্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করে!

তাই বলে এটা ভাবলে ভুল হবে যে এই পরাভব ও বিড়ম্বনাকে দ্রাবিড় জাতি-গোষ্ঠীগুলি অপ্রতিবাদীবশ্যতায় মেনে নিয়েছিলেন। বার-বার বিদ্রোহ করেছেন তাঁরা। বিশ্বামিত্র ও গৃৎসমদগোষ্ঠীর বিদ্রোহের কাহিনী আছে পুরাণে। চার্বাক ও কেশকম্বলীর এবং মখোলীপুত্র গোসালের বিদ্রোহের সামান্য স্বাক্ষর আছে দর্শন চিন্তায়। ধর্মাচরণেও হয়েছে এই বিদ্রোহের রূপটি পরিস্ফুট। উঠেছে বৌদ্ধধর্ম, যা বেদ, ব্রাহ্মণ, যাগযজ্ঞ, মোক্ষ, সব কিছু গৃহীত-প্রত্যয়কে অস্বীকার করেছে, অস্বীকার করেছে ব্রহ্মকে এবং চারিত্রিক ও নৈতিক শুচিতার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সঙ্গেই শবর, পুলিন্দ ও নিষাদদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেয়েছে এক সঙ্ঘারামের অধীনে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বৌদ্ধধর্ম পরিণামে সন্ন্যাস প্রেম ও করুণার ধর্মে রূপান্তরিত হলেও, আদিতে তা ছিল বৈপ্লবিক মত এবং অবনমিত মানুষের বিনষ্ট সম্ভ্রম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যেই তার উদ্ভব। এই সিদ্ধান্ত পোষকতা লাভ করে আরও এই জন্যে যে বুদ্ধ নিজেও আর্য কৌমভুক্ত নন। তাঁর জন্ম কপিলাবস্তুতে এবং যে লিচ্ছবি তথা শাক্য বংশে তাঁর জন্ম তা আর্যবলভুক্ত, নয় এবং তাতে সহোদরা বিবাহ-চলিত ছিল। বুদ্ধের খুল্লতাতপুত্র দেবদত্তই স্বয়ং টলেমির মতো সহোদরা বিবাহ করেছিলেন।

মনে রাখতে হবে ঈশ্বর ও পূজা উপাসনা বিরোধী এবং সামাজিক সাম্য প্রচারকারী বৌদ্ধধর্ম যখন তথাকথিত হিন্দু ঐক্যের প্রাচীরে ফাটল ধরাল এবং দলে-দলে শূদ্রদাস ও কিরাতরা এই ধর্ম গ্রহণ করে এর জনবল বৃদ্ধি করতে লাগলেন, তখন

আর্য কৌমের অন্তর্ভুক্ত রাজা, ভূম্যধিকারী পুরোহিত, শ্রেষ্ঠী ও সৈন্যাধ্যক্ষরা বৌদ্ধ হয়ে গেলেন ঠিক সেই ভাবেই, যে ভাবে গিয়েছিলেন প্রথম শতকে কনস্ট্যানটাইন ও তাঁর অনুগত রোমক অভিজাতরা খ্রীস্টান। এ ছাড়া তাঁদের আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষা সম্ভবই ছিল না যে! উচ্চ কোটির মানুষরা বৌদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সামাজিক ভাঙনের দুর্বার গতি রোধ হল যদিও, তবু বৌদ্ধধর্মের সাম্যাশ্রিত আদর্শের গুণে অনুন্নতের অধিকারের সীমা সম্প্রসারিত হল বেশ খানিকটা। বড়-বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত হল। কেতাবী সংস্কৃতের বদলে জনগণের ব্যবহার্য পালি ও প্রাকৃত—শিক্ষার মাধ্যম হল। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা, ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র,—জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিভাগে আর্যেতর জাতির মনীষার প্রকাশন হল; তা-হল সাহিত্য, চিত্রাঙ্কণ ও ভাস্কর্যেও। পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপ্ত হল বিদগ্ধ সন্ন্যাসীদের পদচরণা ও প্রচারণা। বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার বৃহদাংশ জয় করল।

অশোক থেকে হর্ষবর্ধন অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী থেকে ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটিভাবে হাজার বছর হল বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও সমুন্নতির কাল। মাঝখানের গুপ্ত সম্রাটরা যদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তবু বৌদ্ধধর্মের ওপর চড়াও হননি তাঁরা, বরং পৃষ্ঠপোষকতাই করেছেন তার। এর আগের ইতিহাস দুর্লভ, পরের ইতিহাস দুঃখজনক। একদিকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল এবং বৌদ্ধরা সরকারী পোষকতা হারালেন, অন্যদিকে দক্ষিণ থেকে সনাতনীদের হিংস্র প্রতিরোধ উঠল আগে কুমারিল ভট্টের ও তার পরে শংকরাচার্যের নেতৃত্বে। সুপরিকল্পিত পন্থায় বৌদ্ধদের নিপাত ও নিগ্রহ সুরু হল। তাঁদের মঠ মন্দির ভাঙা, গ্রন্থনাশ, প্রাণনাশ, সবই হতে লাগল পাইকারি হারে। শূদ্র নামে অভিহিত যে অজস্র মানুষ সামাজিক সুবিচারের আশায় একদিন বৌদ্ধ হয়েছিলেন, অবিচার ও উপদ্রবে বিব্রত হয়ে তাঁদের সন্তানরা আবার হিন্দু হলেন। অর্থাৎ সেই পুরাতন শৈব-শাক্ত ধর্মের আড়ালে বৌদ্ধধর্মকে গোপন করেই ফিরে এলেন তাঁরা। তবে বৌদ্ধধর্ম এর পর তান্ত্রিকতার সঙ্গে মিশে গেল বলা ঠিক হবে না। আসলে তন্ত্রাচারীরাই বৌদ্ধ হয়েছিলেন, বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ভ্রষ্ট হয়ে তাঁরা আবার সেই কৌলিক তন্ত্রাচারেই ফিরে এলেন। যদিও বৌদ্ধবাদের প্রতীক, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক কিছুই সঙ্গে নিয়ে এলেন তাঁরা আসার সময়।

এই তন্ত্র-বৌদ্ধ সংমিশ্রিত ধর্মই চলে মহাযান নামে, যেমন নৈষ্ঠিক বৌদ্ধধর্ম চলে হীনযান নামে। বাংলাদেশের সিদ্ধাই, যোগী, অবধূত, আউল, বাউল, সবাই উঠেছেন এই মহাযানের মূল শাখা থেকে এবং মোটা কথায় তাঁদের আমরা বলি আদি সহজিয়া। তাঁদের পূজায়তনে নিরঞ্জন, ধর্ম, পঞ্চানন্দ ইত্যাদি রকমারি নামে পূজিত শিব এবং নীলতারা, বিশালাক্ষী, নানা নামে পূজিতা শক্তির প্রতীক ও পূজা পদ্ধতির মধ্যে

একদিকে যেমন এখনও পাওয়া যায় তাদের আদিম প্রাগার্য রূপটি, অন্যদিকে তেমনই পরবর্তী কালের বৌদ্ধ ছাঁচটিও চিনতে দেরী হয় না। অদৃষ্ট, জন্মান্তর ও ভূতপ্রেত থেকে সুরু করে অনেক কিছু আজগুবি জিনিস তাই এদের মধ্যে পাওয়া যাবে, আর তা যাবে সমধিক পরিমাণে রাঢ়ে, পৌণ্ড্রে, কামরূপে ও প্রাগজ্যোতিষে, তার মানে পূর্বাঞ্চলীয় ভারতে। এর কারণও সুস্পষ্ট। মনে রাখবেন এগুলিই মূলত ভারতবর্ষের আর্যেতর বলয়। কিন্তু এই পূর্বাঞ্চলীয় মুল্লুকগুলিতে বৌদ্ধ ও তন্ত্রাচারীদের মধ্যে চলনসই রকম একটা সমন্বয় হলেও, ভারতের আর কোথাও কিন্তু তা হয়নি। বরং ৮ম-৯ম শতক থেকে শংকর-প্রবর্তিত যে বর্ণাশ্রমী সমাজমানস নূতন করে মাথা তুলল, তার দুঃসহ জাতিভেদ ও শূদ্রনিগ্রহ এবং বাস্তববিমুখ মোক্ষবাদী শিক্ষা-সংস্কৃতি গোটা দেশকেই ঠেলে নিয়ে চলল ফের চরম অধোগতির দিকে।

১২শ শতকে ভারতে যখন তুর্কী অভিযান হল, তখন যে দলে-দলে নিম্নবর্গের হিন্দুরা মুসলমান হলেন, তা নূতন রাজশক্তির পীড়নে প্রলোভনে, না সমাজ পীড়ন থেকে অব্যাহতির প্রয়োজনে শাসকগোষ্ঠীর আশ্রয় নেবার আকাঙ্ক্ষায়? আমার বক্তব্য এই যে, যাঁরা বৌদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরাই মুসলমান হলেন এবং হলেন সেই একই কারণে সামাজিক সাম্য পাবার ভরসায়। তা তাঁরা পাননি অবশ্য। কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ অভিজাত মহলের ভূমিদাস হয়েই থেকেছেন তাঁরা সেখানেও এবং বঞ্চিত লাঞ্ছিত কয়েক কোটি মুসলমানের পুরুষানুক্রমিক অসন্তোষ ভাঙিয়েই আটশ বছর পরে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীরা পাকিস্তান নামে নূতন একটি দেশ গড়ে দিয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ মুসলীম পিতৃভূমি রূপে, ভারতের ভূমিসংস্থান থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের দুটি খণ্ড বহিষ্কৃত করে দিয়ে। এই পূর্বাংশটি এখন স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে। আর পশ্চিমাংশটি তিন-তিনটি যুদ্ধের পরও অদ্যাবধি সহজ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি ভারতের সঙ্গে। অনির্বাণ বৈরিতার ছাইচাপা আগুন ধূমায়িতই হয়ে চলেছে তার অন্তরে বছরের পর বছর ধরে।

সেই জন্যেই বলছি খ্রীঃ পূঃ ৫শ শতাব্দীতে বুদ্ধ ভারতের সমাজসমস্যা যে-পথে সমাধান করতে চেয়েছিলেন, সেটাই ছিল শ্রেয় পথ, যেহেতু তার ভিত্তিতে ছিল ঐতিহাসিক বাস্তব দৃষ্টি, লক্ষ্যে ছিল সামাজিক সাম্য কামনা। সবাই জানেন এ দুটো চিন্তাই জন্মেছিল আর্যেতর জাতিগোষ্ঠীর উর্বর মননশীলতায়। যাযাবর আর্যজাতিরা এতটা উদার চিন্তায় কোনোদিন পৌছাননি। কিন্তু মতগুলি যে বিপজ্জনক, তাঁরা তা পরিষ্কার বুঝেছেন। তাই বৌদ্ধধর্মের বিপ্লবী রূপটা তাঁরা নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন তার ওপর মৈত্রী ও করুণার কল্পিত ব্যাখ্যা আরোপ করে। তার বস্তুবাদী ছাঁচটি খতম করে দিয়েছেন স্বয়ং বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বানিয়ে এবং তাঁর মুখে কর্মফল ও জন্মান্তরের তত্ত্ব বসিয়ে। যে বুদ্ধ একদিন উঠেছিলেন ব্রাহ্মণ্য ভারতে অসম শাসন-শোষণের

বিরুদ্ধে নিগৃহীত মানুষের মুক্তিদাতা রূপে, উঠেছিলেন বেদবিরোধী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দার্শনিক মত নিয়ে, তাঁকে যথাসম্ভব 'হিন্দু' বানিয়েই তৃপ্তিলাভ করেছি আমরা। এটা দেশ ও জাতির দুর্ভাগ্য তাতে আর সন্দেহ নেই। অবশ্য খ্রীস্টের সাম্যবাদী ধর্মও প্রতীচ্য জাতিগুলির হাতে সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার হয়েছে এবং খ্রীস্টকে সাজান হয়েছে শ্বেত জাতিগোষ্ঠীগুলির কায়েমি স্বার্থের সতর্ক প্রহরী। কাজেই প্রকৃত খ্রীস্ট ও বুদ্ধকে মানুষের চেনাই হয়নি আজ পর্যন্ত।

□

। দুই । যীশু, বুদ্ধ ও ভারতবর্ষ

আমাদের ছাত্রবয়সে যীশু খ্রীস্টের জীবন সম্বন্ধীয় একখানি বইয়ের ব্যাপক প্রচার ছিল। লেখকের নাম মনে নেই। বইয়ের নাম ইন কোয়েস্ট অব ক্রাইস্ট। এই বইয়ে খ্রীস্টধর্মের তাত্ত্বিক ও অনুষ্ঠানের দিকগুলির সঙ্গে হিন্দুধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ ব্যাখ্যাত হয়েছিল এবং তার আলোয় লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে যীশু কোনও সময়ে নিশ্চয় ভারতে এসেছিলেন ও এখানকার ধর্মকর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিচয় লাভ করেছিলেন। খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের একখানি সাপ্তাহিক পত্রে সে সময় এই বইয়ের বক্তব্য বিষয় নিয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। বলা বাহুল্য প্রতিকূল আলোচনাই বেশী হয়েছিল।

তখন থেকেই ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে যাঁরা খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে কিছু পড়া শোনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে খ্রীস্টের জীবন ও দর্শনের ওপরে ভারতীয় প্রভাব সম্বন্ধে অস্পষ্ট একটা ধারণা প্রচলিত হয়। যতদূর মনে পড়ছে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রমুখের লেখায় এই অস্পষ্টতাকে স্বচ্ছ করার চেষ্টা হয়েছিল, যদিও পূর্ণ আলোকপাত করতে পারেননি তাঁরা। এক দিকে খ্রীস্টান সমাজের প্রবল প্রতিরোধ, অন্য দিকে উপযুক্ত দলিলপত্রের অভাবই সম্ভবত তাঁদের বেশী দূর অগ্রসর হতে দেয় নি।

পরবর্তীকালে এই অনুমানকে প্রমাণের গণ্ডীতে নিয়ে আসার উদ্যম নূতন করে সুরু হয়েছে। নিকোলাস নটোভিচ নামে এক রুশ পণ্ডিত এবং স্পেন্সার লিউইস নামে এক ইংরেজ পণ্ডিত এই কাজে অগ্রণী হয়েছেন। প্রথমের দ্যা আনস্নোন লাইফ অব যীশাস ক্রাইস্ট ও দ্বিতীয়ের দ্যা মিষ্টিক্যাল লাইফ অব যীশাস এই পথের দুটি লক্ষণীয় পদক্ষেপ হিসাবে ইতিহাসবেত্তা জিজ্ঞাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নটোভিচ লাদকের রাজধানী ল্যের হিমিস মঠের প্রধান লামার কাছে বৌদ্ধ যুগের কতকগুলো পুরাতন পাণ্ডুলিপি পান; সেগুলো থেকে জানা যায়, জেরুজালেম থেকে ভ্রাম্যমাণ বণিকদের সঙ্গে ইশা নামে এক কিশোর বালক ভারতে আসেন এবং তিনি কাশ্মীর, রাজগৃহ, জগন্নাথ ও কাশী পর্যটন করে ও এখানকার হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের কাছে

শাস্ত্র অধ্যয়ন করে ষোল বৎসর পরে স্বদেশে ফেরেন।

প্রধান লামা নটোভিচকে যে পাণ্ডুলিপি দেন, তা পালি থেকে তিব্বতীতে অনূদিত এবং সাল-তারিখের বিচারে নাকি দেখা যাচ্ছে এগুলো খ্রীস্টের ক্রুশবিদ্ধ হবার অল্প পরের লেখা। ভারত-পর্যটন অন্তে স্বদেশে ফেরার পর সেখানকার নাস্তিক শাসকদের হাতে উক্ত ইশার প্রাণদণ্ড হয়েছে, সে বার্তা এনেছেন বণিকরা, একটি পাণ্ডুলিপিতে তারও উল্লেখ রয়েছে। এ-থেকেই নটোভিচ সিদ্ধান্ত করেছেন এই ইশা যীশু ছাড়া কেউ নন।

খ্রীস্টান ধর্মগ্রন্থকাররা যীশুর যে বৃত্তান্ত লিখেছেন, তাতে দেখা যায় বারো বয়সে তিনি পিতামাতার সংস্রবচ্যুত হয়ে মরুভূমিতে চলে যান তপস্যা করতে এবং সিদ্ধ হয়ে ত্রিশবৎসর বয়সে জুদিয়ায় আবির্ভূত হন ঈশ্বরপুত্র রূপে। তারপর রোমক গবর্ণর পন্টিয়াস পাইলটের বিচারে তাঁর মৃত্যু হয়। মাঝের এই ষোল-সতের বছরের কোনও হিসাব মেলে না। তিব্বতী পুঁথির ইশা যদি খ্রীস্ট হন, তাহলে হারানো এই সময়টুকুর খোঁজ পাওয়া যাবে এবং যীশুর জীবন ও মতবাদের আদি উৎসটার সন্ধানও সহজ হবে।

সবাই জানেন যীশুর জীবনকালে জুদিয়া রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইহুদী মহাজন ও পুরোহিত সম্প্রদায় বিদেশী প্রভুদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জনসাধারণকে অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনার মধ্যে রেখেছিলেন। এই লাঞ্ছনার স্বাদ পেয়েছিলেন যীশু জন্ম থেকেই, মানুষকে মুক্ত করার চিন্তাও ব্যাকুল করেছিল তাঁকে বাল্যেই। তখনকার মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল, এ অবশ্য প্রমাণিত সত্য। সুতরাং ভারতীয় বণিকদের মুখে বুদ্ধের মৈত্রী ও মানব-করুণারবার্তা শুনে তিনি ভারতে আসতে আগ্রহী হবেন, এ আর অসম্ভব কী? তাঁর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলি দেখার ইচ্ছা এ দিক থেকে খুবই অর্থপূর্ণ মনে হয়। এর পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, নূতন ধর্ম প্রচার ও রাজাজ্ঞায় মৃত্যুলাভও খুব স্বাভাবিক মনে হয়।

বুদ্ধ আর্য প্রাধান্যময় ভারতবর্ষে নিগৃহীত শূদ্র ও সর্বাধিকার বঞ্চিত ভূমিদাসদের সংহত করেছিলেন, ঈশ্বরবর্জিত এক আচারবিমুক্ত সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করে। তিনশ বছর পরে অশোকের সময়ে তাঁর ধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়ে দিগ্বিজয়ী সাফল্য লাভ করে। খ্রীস্টও একই ভাবে নিঃস্ব শ্রমজীবী, কৃষক ও ক্রীতদাসদের সংহত করেন, বিদেশী শাসক ও স্বদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে একত্রে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে। কায়েমি স্বার্থবানরা এতে কুপিত হয়ে তাঁকে রাজদ্বারে উপস্থিত করেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহী রূপে ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয়। রোমে তারপর সম্রাট কনস্টানটাইন যেদিন খ্রীস্ট ধর্ম নিলেন, সেদিনই তা হল রাজধর্ম এবং পেল সারাদেশের স্বীকৃতি।

অবশ্য কর্মাদর্শে বুদ্ধ ও যীশুর মধ্যে প্রভূত ঐক্য দেখা গেলেও ধর্মাদর্শে ঐক্য অল্পই

দেখা যায়। বুদ্ধ বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করেছিলেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কণ্ঠ সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু যীশু প্রচার করেছিলেন এক পরম পিতার বার্তা; বলেছিলেন জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, এই ত্রিতত্ত্বের কথা। এ সবের আদি উৎস হিসাবে বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা ভারতীয় আর্য বা ব্রাহ্মণ্যধর্মকে যদি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে বোধহয় ভুল হবে না। সম্ভবত অনেকে জানেন যে রোমান ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের মধ্যে মালা জপার এবং বৈষ্ণবদের মত সখীভাবে ভজনের রীতি আছে। অবশ্য স্বয়ং যীশু কোনদিন এই ভাবের সাধনা বোধহয় করেন নি। মোটের ওপর বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাস, প্রব্রজ্যা, বৈরাগ্য ও সেবা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রেম, ভক্তি ও নতি, দুইয়েরই সমমাত্রিক প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে খ্রীস্টধর্মে। ভিত্তি তাই ভারতবর্ষ, একথা যুক্তিসহকারেই বলা যেতে পারে।

স্পেন্সার লিউইস বলেছেন, যীশু ভারতবর্ষের বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যদের এবং হিন্দু পণ্ডিতদের কাছে শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছিলেন, পাণ্ডুলিপিগুলি থেকেই এটা জানা যাচ্ছে, আরও জানা যাচ্ছে হিন্দুধর্মের অস্পৃশ্যতা অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের উদার সাম্যবাদিতা তাঁর বেশী ভাল লেগেছিল। আবার বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বর তত্ত্বময়তা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের ঈশ্বরমুখিতা তাঁর বেশী অনুরাগ আকর্ষণ করেছিল। হয়ত এ দুইয়ের সমীকরণ করতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবন, ধর্মতত্ত্ব ও সাধনপ্রণালীতে। হয়ত আরো অনেক দিন থাকতেন ভারতে। কিন্তু পিতা জোসেফের মৃত্যু এবং দুর্দশা-পীড়িত স্বদেশবাসীর দুঃখই তাঁকে আহ্বান করে নিল জুদিয়ায়। ধর্মশাস্ত্রে এই ঘটনাই কি সাধু ব্যাপটিষ্টের আহ্বান নামে অভিহিত হয়েছে? এই উপলক্ষ্যে মাতা মেরীকে লেখা খ্রীস্টের এক-খানি পত্রও নাকি তিব্বতী অনুবাদে পাওয়া গেছে এ-পুঁথিগুলির মধ্যে, যাতে সংসারের অনিত্যতা ও আত্মার অবিনশ্বরতার কথা রয়েছে। রয়েছে বৈরাগ্যের প্রভাবে মোহমুক্ত দিব্যমুক্ত দিব্যদৃষ্টি লাভের নির্দেশ। এই চিঠি বণিকদের হাতে পাঠিয়েছিলেন তিনি, বলেছেন স্পেন্সার লিউইস।

এত কথা সবই অলীক হতে পারে কি? বুদ্ধ ও বুদ্ধের ছ-শ বছর পরে খ্রীস্ট এবং তাঁর ছ-শ বছর পরে মোহম্মদ প্রাচ্যের প্রধান তিনটি ধর্ম প্রবর্তন করেছেন। ভারত পারস্য ও চীনের সুপ্রাচীন ধর্মের পরবর্তী এই তিন ধর্ম পরস্পরের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে তা সত্যিই আনুপূর্বিক জানা প্রয়োজন। সেই জানার পথে খ্রীস্টজীবনের এই যে একটি অনাবিষ্কৃত অধ্যায় আজ উন্মুক্ত হতে চলেছে, এর মূল্য কম নয়। একদিকে এ মতের প্রামাণিকতা যেমন খ্রীস্ট জীবনের ঐতিহাসিক বনিয়াদ দৃঢ় করবে, অন্যদিকে খ্রীস্টধর্মের আদি উৎসটিও সার্থকভাবে উদ্ঘাটিত করবে।

অনেকেই জানেন আশা করি যে খ্রীস্টের পরিচিতি শুধু ধর্মশাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এবং তা হয়েছে পরবর্তীকালের ভক্তদের দ্বারা। সমসাময়িক বিবরণ নেই কিছুই, একমাত্র নেজারাথের যশুয়া নামক এক পাগল রোগীর উল্লেখ ছাড়া, যিনি শূন্যে দু-হাত তুলে 'পিতা পিতা' করে চেঁচাতেন। কোনও রোমান চিকিৎসক লিখেছেন তাঁর ডায়েরিতে এই কথা। সেই কিম্বদন্তীর ঈশ্বর-পুরুষ যাতে ইতিহাসের মাটিতে ধরা পড়েন, তার জন্যে বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের একটি প্রতিনিধি দল পাঠান হয়েছিল তিব্বত লাদক নেপালে। তাঁরা ফিরে এসেছেন এইসব পাণ্ডুলিপি ও পুঁথিপত্রের কোন সন্ধান না পেয়েই। নটোভিচ লিউইস এণ্ড কোম্পানি কি তাহলে নির্মূলভাবে হাতিয়ে নিয়ে গেছেন সে-সব? না-কি এর সবটাই কল্পনা!

□

।। তিন ।। কনফুসিয়াস ও লউৎজের তত্ত্বপ্রত্যয়

১৯৬২-র শেষাশেষি চীন-ভারত সঙ্ঘর্ষ বাধলে আমাদের কোন কবি বলেছিলেন, পবিত্র ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে তোল, যা কিছু চীনা তাকেই পুড়িয়ে ছাই করতে হবে। ঘৃণা কোন অবস্থাতেই পবিত্র হতে পারে কিনা এবং একথা দেশপ্রেমের উত্তাপে উৎসারিত কবিকল্পনার অত্যুক্তি হলেও সমীচীন কিনা, সে প্রশ্ন এখানে তোলার প্রয়োজন নেই। কথাটা ঠিক নয়, কেননা মানবসভ্যতার ইতিহাসই তার প্রমাণ। কারণটা বলছি। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার পীঠভূমি যে-কটা মুল্লুক, চীন শুধু তার একটা নয়, ভারতবর্ষ ও মিশরের এবং কতকাংশে ইরাণ ইস্রাইল ও গ্রীসের মত তারই স্থানও বিচিত্র কারণে অগ্রগণ্য। রোম ও আরবের নামও করতে পারি অবশ্য, কিন্তু কে না জানেন যে পুর্বোক্তদের তুলনায় তারা অর্বাচীনতর? মানুষকে এরা দিয়েছে এমন কতকগুলো ভিত্তিমূলক সত্যজ্ঞান, যা আশ্রয় করে সভ্যতার ইমারত আজ খাড়া রয়েছে।

এদের মধ্যে ভারতবর্ষ ও চীন জগৎ-ও-জীবনচিন্তার এমন কতকগুলি স্তরকে স্পর্শ করেছে, যেখানে গ্রীক দার্শনিকদের কেউ-কেউ ছাড়া আর কারও পৌছানরই শক্তি হয় নি। আবার সমাজনীতি ও আচরণবিধিতেও তাদের সমকক্ষ অগ্রগামিতা দেখা যায় না আর কারো। যদিও রাষ্ট্রব্যবস্থাপনায়, বৈষয়িক শ্রীসম্পাদনে ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারে রোম এবং আরবের স্থান এদের উপরে। গোটা দুনিয়াতেই তারা অগ্রনায়ক এদিক থেকে। ইরাণ ইজ্‌রাইল ও মিশরের দানও নগণ্য নয় নিশ্চিতই। কিন্তু ইসলামের অভ্যুদয়ে আবেস্তাবাদী ইরাণের বাতাবরণ আমূল পালটে গেছে। মিশরও গ্রীস রোম ও আরবের হাতে বারবার রং বদল করেছে। ইজ্‌রাইলের মাটি থেকে উৎখাত হয়ে সেখানকার মানুষরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছেন, নিজেদের জীবন ও মননের অনন্ত বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়েও গেছেন সঙ্গে করে। কিন্তু যেহেতু তাঁদের সমগ্র সত্তা মূল ভূখণ্ডে সংহত রূপ ধরে নি, তাই তাঁদের ইতিবৃত্তের ধারাবাহিকতা নেই।

তা নেই অবশ্য গ্রীস এবং রোমেরও। আজকের খ্রীস্টানী গ্রীস ও ইতালী ভিন্নতর

শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ, তবু সবিস্ময়ে লক্ষণীয় যে আদিকালের গ্রীকো-লাতিন ক্লাসিক-ভিত্তিক কতকগুলি প্রত্যয় ও মূল্যবোধ তারা অজ্ঞাতসারেই আঁকড়ে আছে আজো। বরং রেনেসাঁস থেকে এগুলির নূতন মূল্যায়নের যে প্রয়াস শুরু হয়েছে তার যোগসূত্র উত্তরোত্তর দৃঢ়ই হচ্ছে। অবশ্য এ জায়গায় ভারতবর্ষ ও চীনের আত্মিক চেহারাটা একেবারেই অন্যরকম।

তাদের ইতিহাসের পূর্বাপরতা কোনদিন ছিন্ন হয় নি। যুগে-যুগে রাজনীতিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্লাবন এসেছে, তা শুধু তাদের মাটিতে পলিই ফেলে গেছে, যা থেকে তৈরি হয়েছে অবিচল একটা জীবনবোধের ভূস্তর। সব কিছু বৈষম্যের উপাদান নিয়েই তার ওপর গড়ে উঠেছে রকমারি সমন্বয়ের ইমারত। হিদেন রোমের বা পেগান আরবের জমিন কিন্তু যথাক্রমে খ্রীস্টানী বা ইসলামী সাবেকী ছাঁচ বজায়ই রাখতে পারে নি।

চীনের ছাঁচটা ভেঙেছে ইদানীং কম্যুনিজমের অভ্যুদয়ে, কেননা কম্যুনিজম কোন জায়গাতেই পূর্বতনের সঙ্গে আপোষ করে চলে না। তাই পুরানো সম্পত্তি ও সম্পর্কভিত্তিক সমাজব্যবস্থা এবং ধর্ম ও আচরণভিত্তিক নৈতিক অনুশাসন দুই-ই বদলে গেছে আজকের চীনে। এই ভাঙন কোন স্থিতিশীল গঠনে রূপ নেবে এখনি তা বলা কঠিন। তবে দেখছি কম্যুনিজমের আদিপীঠ সোভিয়েতের সঙ্গে তার ইতিমধ্যেই আদর্শের যুদ্ধ বেধেছে।

কিন্তু চীনের ইতিহাস ত ১৯৪৮ সালে থেকেই শুরু নয়। আর অন্তত চার হাজার বছর আগে থেকে তার যাত্রা আরম্ভ এবং রাজনীতিক একাত্মতা না থাকলেও ভারতের মতই আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতায় তা মহিমার সমুজ্জ্বল উচ্চতায় পৌঁছেছিল। অতীতের সেই বৃহৎ উত্তরাধিকার জাতির মননধারা ও প্রাত্যহিক দিনচর্যায় নূতন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে দুজন, লাউৎস আর কনফুসিয়াস দুজনেই তাঁরা ৬ষ্ঠ বা ৫ম খ্রীস্টপূর্ব শতকের মানুষ।

এটা এক আশ্চর্য সময়। কারণ এই সময় সীমার মধ্যেই বুদ্ধ মহাবীর জরথুস্ত্র জেরেমিয়া এজেকিয়েল সোক্রেতিস সকলের আবির্ভাব। তার মানে প্রত্ন ঐতিহাসিক যুগ থেকে মানুষ এই কালেই ইতিহাসের শক্ত মাটিতে প্রথম পা রেখেছে। চীনের ইতিহাসে এই কালটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় যে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের আগে পর্যন্ত লাউৎস ও কনফুসিয়াস প্রবর্তিত ধর্ম ও জীবননীতিতেই ছিল তার প্রধান আশ্রয়। লাউৎজে সেকালীন হুনান রাজ্যের অন্তর্গত কাউতি [পুরানো নাম চু-ই] অঞ্চলে জন্মান ৫৭০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে। গল্প আছে চৌ বংশীয় রাজার তিনি গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির অনুরোধে তাঁর বাণী তাও-তে-চিং নামক বইয়ে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করে পৃথিবী থেকে তিনি অদৃশ্য

হন। ক্রমে এই সব সূত্র আশ্রয় করে জন্মায় নানা মত পথ ও দার্শনিক তত্বচিন্তা। অবশেষে লাউৎস স্বয়ং ঈশ্বরে পরিণত হন এবং তাঁর নামে দিকে দিকে মন্দির উঠতে থাকে।

কনফুসিয়াস নামটি সৃষ্টি করেছিলেন জেস্যুইট পাদ্রীরা। খুং-এর জন্ম ৫০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে লু রাজ্যে। কিম্বদন্তী আছে লাউৎজেকে তিনি দেখেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য তাঁকে মোটেই আকৃষ্ট করে নি। তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে লু রাজ্যের মন্ত্রী হন তিনি, পঞ্চান্ন বছরে হন প্রধানমন্ত্রী এবং রকমারি শুভ সংস্কার প্রবর্তন করেন। কিন্তু সভাসদদের ষড়যন্ত্রে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন শেষ পর্যন্ত। বাকী জীবনে তিনি আর একজন আদর্শ রাজা খুঁজে হয়রান হয়েছেন। অবশেষে তিয়াত্তর, বছরে কুফু শহরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে ঈশ্বরত্ব লাভ করেছেন তিনিও। এখন গ্রামে-গ্রামে তাঁর মন্দির। লক্ষ-লক্ষ পশুবলি হয় তাঁর নামে উৎসর্গ করে।

কনফুসিয়াস রেখে গেছেন অজস্র রচনা। তাঁর লেখা দু-গ্রন্থে ভাগ করা হয়: ১ম বিভাগে পড়ে চারখানি বই আচরণবিধি সংক্রান্ত, তাওহিও [বয়স্কদের শিক্ষা] চুং-যুং [অভ্রান্ত পথ], লুন-য়্যু স্থ [ভাষণ ও কথোপকথন], মাং-ৎস [এই নামীয় শিষ্যের টীকা]; ২য় বিভাগে পড়ে পাঁচখানি তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কিত, বই : ই-কিং [বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র], চৌ-কিং [চীনা ইতিহাস], শী-কিং [ভজনগীতি], লী-কিং [পূজা ও ব্রতের নিয়মাদি], চু-য়ুন-চু-ইন-কিং [বসন্ত ও শরতের পুঁথি], তে-চান-চিয়ান [সমসাময়িক কাল]।

বলা দরকার যে চীনাদের ধর্ম-চেতনা ও জীবন-বোধের আদি কাঠামোটার গড়ন তৈরি হয়ে গিয়েছিল লাউৎজে ও কনফুসিয়াসের অনেক আগেই। ধর্মবিশ্বাসে তাঁরা ছিলেন পুরানো নিসর্গ-উপাসক শ্রেণীভুক্ত এবং প্রকৃতির নানা উপাদানকে ও মৃত পূর্বপুরুষদের পূজা করতেন তাঁরা। সাং-তি বা পরমেশ্বর সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা অবশ্য ছিল পণ্ডিতদের এবং ইয়ুং ও ইন, বা পুরুষ ও প্রকৃতির যুগ্মরূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এরকম একটা বিশ্বাসও হয়ত ছিল। সাধারণের মধ্যে লৌকিক উপধর্মেরই ছিল ব্যাপক প্রাধান্য।

তাঁরা জীবনের উৎপত্তি ও পরিণাম নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ড্রাগন ও ভূতপ্রেত পূজা এবং যদৃচ্ছ আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিনাতিপাত করতেন। এঁদের সংহত ও এক একটি সাংস্কৃতিক অনুশাসনে আবদ্ধ করেছিলেন পূর্বোক্ত দুই আচার্য। লাউৎজে তাঁদের মধ্যে জাগিয়েছিলেন জগৎ-ও-জীবনচিন্তা, যার ফলে তাঁদের দৃষ্টি বাইরে থেকে আকৃষ্ট হয়েছিল ভেতরের দিকে। কনফুসিয়াস দিয়েছিলেন তাঁদের সুসম্বদ্ধ এমন এক আচণবিধি, যা পরবর্তী আড়াই হাজার বছরেও জীর্ণ হয় নি।

বলা দরকার যে দুজনের কেউই পরমার্থ বিষয়ে কোন কথা বলেন নি। লাউৎজে

প্রচার করেছেন তাও-তত্ত্ব। তিনি বলেছেন, জ্ঞান বিত্ত ক্ষমতা কোনওটাই সত্যবস্তু নয়। সবই আপেক্ষিক। জীবনে যাকে কর্তব্য বলা হয়, তাও ভ্রান্তির পিছনে দৌড়ান। সত্যবস্তু হল, বৈরাগ্য বা নির্বেদ, য়ু-য়ুই, যেহেতু তাই তাও লাভের উপায়। কিন্তু তাও কী? তাও হল অস্তিত্ব এবং নিরস্তিত্ব—একাধারে দুই-ই। আর সেই কারণেই এই তত্ত্ব অপ্রকাশ এবং অচিহ্নিত বলে ধার্য।

বাক্য ও মনের অগোচর অনির্বচনীয় ব্রহ্মেরই সগোত্র বলে মনে হতে পারে তাওকে। কিন্তু লাউৎজে বারবার বলেছেন, ইনি সৃষ্টিকর্তা নন, তাঁরও ওপরে, ইনি নির্বিকল্প সমাধি ইনি, স্থিরমূর্তি ভূমা, ইনি জ্যোতির্ময় সত্যস্বরূপ, অথচ নিরুপাধিক। কাজেই তাও প্রাপ্তি মোক্ষপ্রাপ্তিরই নামান্তর নয়। অর্থাৎ তাও-তত্ত্বের এই অংশটি বেশ ধোঁয়াটে, তাই খোদ কনফুসিয়াসই তা বুঝতে পারেন নি! তবে জ্ঞান ও কর্ম পরিহার করে নির্বেদে আসার নির্দেশ মানুষকে দিয়েছেন বৌদ্ধরাও এবং তাকেই তাঁরা বলেছেন নির্বাণ।

বৌদ্ধধর্ম যখন চীনে আসে তাও-তত্ত্বের এই দিকটার সঙ্গে তার মিল দেখেই হয়ত দলে-দলে মানুষ স্বাগত জানিয়েছিলেন তাকে। কিন্তু লাউৎজে যাই বিধান দিন তাও তত্ত্বের আকারে, কনফুসিয়াস মানুষের হাতে সুবিস্তীর্ণ কনডাক্ট রুলস ছাড়া আর কিছুই পরিবেষণ করেন নি তাঁর কথোপকথনমালার আবরণে। এই কথোপকথন জাত হল এপিকটেটাস বা মার্কসের অরেলিয়াসের আত্মবিচারের অনুরূপ, কিংবা ধম্মপদ অথবা প্লেতোর ডায়ালগের অনুরূপ। বিষয়ী মানুষের কর্তব্য কী ও ভদ্র নাগরিকের সদাচার কেমন, তা বুঝিয়েছেন তিনি এর পৃষ্ঠায়। বুঝিয়েছেন উন্নত রাষ্ট্রাদর্শের স্বরূপ।

পূর্বপুরুষ ও পূর্বাচার্যদের যা পথ, তাকেই শ্রেয় পথ বলেছেন কনফুসিয়াস। নৈতিক বিশুদ্ধি ও লোককল্যাণকে যেমন তিনি শ্রেয় চর্যা বলেছেন, তেমনি পুরা-জ্ঞানকে বলেছেন শ্রেয় বিদ্যা। এই বিদ্যা ও চর্যা যেমন তাঁর মতে জীবনের আশ্রয়, তেমনি তাঁর মতে জগতের আশ্রয় হল পাঞ্চভৌতিক উপাদান ও অতিবাস্তবিক দুটি সংবিধান। একটা হল কর্মফল, আর দ্বিতীয়টা হল হেতুবাদ এবং দুই-ই তাঁর মতে একান্ত অলঙ্ঘ্য।

এই সূত্রে লক্ষণীয় যে লাউৎজের পথ হল সন্ন্যাস-আশ্রিত নৈষ্কর্ম্যের পথ, আর কনফুসিয়াস ব্যবস্থিত পথ হল বিষয়সচেতন গার্হস্থ্যের পথ। তত্ত্বজ্ঞানী দুজনেই, কিন্তু একজনের তত্ত্বদৃষ্টি বস্তু ছাড়িয়ে ভাবের গহনে গোলকধাঁধা রচনা করেছে, অন্যজনের চেতনা মাটিকে বেষ্টন করেই মহত্ত্বের শিখর নির্দেশ করেছে। চীনা মানসিকতায় এ দুই বৈশিষ্ট্যই একসঙ্গে দেখা যায় যে, এই কথাটিই একদা বলেছিলেন বুফাস উইলহেলম। চৈনিক সংস্কৃতির ভিত্তিও এটিই।

॥ চার ॥ ইসলামের বিশ্ববীক্ষণ

ইতিহাস ও দর্শনে সুপণ্ডিত ডক্টর এম. হিলালী দীর্ঘদিন মিশর, ইরান ও আরব মুল্লুকে বসবাস এবং শিক্ষা লাভ করেছেন। ঐস্‌লামিক ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁর মতামত তাই প্রামাণ্য বলেই গ্রাহ্য। তাছাড়া তিনি হিন্দু, গ্রীক, চৈনিক ও খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রাদির প্রতিপাদ্যের সঙ্গে ইসলামের মূলতত্ত্বগুলির তুলনায় আলোচনা করেছেন, সে জন্য তাঁকে ধর্মীয় ঐকদেশিকতামুক্ত বিচারক বলেও মনে করা হয়। তাঁর রচিত 'ইসলাম অ্যাজ ইউনিভার্স্যাল ফেথ' এবং 'রেনেসাঁস ইন মোসলেম ইণ্ডিয়া' নামে দু-খানি বই ইসলামের তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের পক্ষে অবশ্যই আলোকদিশারী।

প্রথম বইটিতে তিনি দেখিয়েছেন ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায়ান্ধকার দিনে আরবের এক প্রান্তে উদ্ভূত হয়ে ইসলাম কি করে নিজ শক্তিতে একদিকে বার্বারী ও স্পেন পর্যন্ত, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়া ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল, একথা তাঁর মতে বিদ্বেষপ্রসূত। তিনি বলেন, ইসলামের অন্তর্নিহিত মৈত্রী ও গণতন্ত্রের আদর্শই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিস্তীর্ণ ভূমিভাগে ব্যাপ্ত হয়েছে। বেশীর ভাগ মুল্লুকেই সে-সময় লিঙ্গপূজা এবং জড়বাদী নিসর্গ উপাসনা চলিত ছিল, মানুষ পরমাত্মা বা শুদ্ধ ধর্মের সন্ধান পায় নি। তাছাড়া ছিল হুজুরে-মজুরে দুরপনেয় দূরত্ব। ইসলাম এ দুইয়েরই অবসান ঘটিয়েছে এবং একদিকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ব্যক্ত করেছে, অন্যদিকে প্রবর্তন করেছে সাম্যাশ্রিত সমাজ। তার ফলে মানুষ ইচ্ছা করেই ইসলামকে মুক্তির পথ বলে স্বাগত জানিয়েছে। যুদ্ধ-বিগ্রহ যা হয়েছে, তা হয়েছে ঈশ্বরদ্বেষী কাফের ও সাম্রাজ্যবাদী খ্রীস্টানদের সঙ্গে।

দ্বিতীয় বইয়ে তিনি বিবৃত করেছেন ভারতে ইসলামের অভ্যুদয় কাহিনী। এখানেও তাঁর সিদ্ধান্ত একই। ইসলাম আপন প্রাণশক্তিতেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছে ভারতে, তাকে জোর করে প্রচার করতে হয় নি। তাঁর মতে ভারতবর্ষের সমাজ-ব্যবস্থাপনায় উচ্চবর্ণের একাধিকার ছিল, তাঁরা নিজেদের শিক্ষায়তনে এবং পূজামন্দিরে শূদ্রদের ঢুকতে দিতেন না। তাঁদের সামাজিক ও রাজনীতিক অধিকার ছিল না। তাই তাঁরা সাম্যাশ্রিত ইসলামকে গ্রহণ করেছিলেন বিচারের আশায়। তাছাড়া,

বিবস্ত্রা নারীমূর্তি কিংবা প্রস্তরনির্মিত পুং-জননেন্দ্রিয় পূজার কদর্যতায় ক্লিষ্ট হয়েও তাঁরা ইসলামকে আলিঙ্গন জানিয়েছিলেন, জীবন ও জ্যোতিঃস্বরূপ অনির্বচনীয় ঈশ্বরকে পাবার সোপান জ্ঞানে। এখানেও যুদ্ধ-বিগ্রহ যা হয়েছে, তা হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যকামীদের ও ধর্মদ্রোহী নাস্তিক বা উপজাতিদের সঙ্গে।

দুখানি বইয়েই ডক্টর হিলালীর প্রতিপাদ্য মোটামুটি এক। তাঁর মতে ইসলামই মানুষকে দিয়েছে ধর্মের ক্ষেত্রে অদ্বৈত ঈশ্বরের তত্ত্ব, সমাজের ক্ষেত্রে মানবাত্মিক সাম্য, আর এ দুয়ের আকর্ষণেই অপধর্ম অধ্যুষিত অঞ্চলের মানুষরা ধর্মান্তর গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার, উত্তর আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ ও পূর্ব ইউরোপে ইসলামী অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এইভাবেই। পৌত্তলিকরা এবং সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণকামী খ্রীস্টানরা শত্রুতার বশেই এই ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করে দেখিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এক হাতে কোরআন, অন্য হাতে তরবারি নিয়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন উসমান, ওমর ও আলি প্রমুখ খলিফারা। প্রকৃতপক্ষে ডক্টর হিলালীর মতে ইসলামই মানুষের মন থেকে আদিকালের জড়তা ও অন্ধ প্রত্যয় ছুটিয়ে দিয়ে সেখানে নবযুগের যুক্তিবাদ এবং জীবনদর্শন প্রবর্তন করেছে। গণিত, আলকেমি, চিকিৎসাশাস্ত্র এসবই তাঁর মতে মূলত ইসলামের দান। আর স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কারুকর্মের নূতন শৈলী ও পার্লামেণ্টারি শাসনের উন্নততর রূপও।

আগেই বলেছি ডক্টর হিলালীর পাণ্ডিত্য ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে আমি অনেকের মতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন। সেই শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়েই আমি তাঁর সিদ্ধান্তগুলি একটু যাচিয়ে দেখতে চাইছি। কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখি যে, জগতের প্রধান পাঁচটি ধর্মের অন্যতম রূপে ইসলাম মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, ধর্মচিন্তায় ও জীবনদর্শনে অনেক সম্পদ দিয়েছে এ আমি সসম্মানে স্বীকার করি এবং ইসলামের ইতিহাস শুধু মুসলমানের নয়, সমস্ত মানবজাতির ইতিহাসেরই একটি সমুজ্জ্বল অধ্যায়, এ-ও আমি অকপটে বিশ্বাস করি। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞ গ্রন্থকারের অনেকগুলি বক্তব্যের সঙ্গেই আমি একমত হতে পারি নি। আমার মনে হয়েছে, বহুস্থানেই তাঁর উক্তিতে তথ্য ও সত্যের অপহ্নব হয়েছে প্রবলভাবে।

প্রথম কথা ঐস্লামিক কেন, কোনও সাম্রাজ্য-বিস্তারই তরবারির সাহায্য ভিন্ন প্রতিষ্ঠা হয় নি। তাই ইসলামের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছে প্রমাণ করতে যাওয়ার অর্থ হয় না। পশ্চিম এশিয়ায় রোমক সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য, পূর্ব ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত মুঙ্গল সাম্রাজ্য, কোনটাই নিরস্ত্র অনুপ্রবেশের ফলে হয় নি। মোসলেম সম্প্রসারণও ঐ একই ধারায় হয়েছে এবং নৈষ্ঠিক মুসলমান ইতিহাসকাররাই সেকথা জাতীয় গৌরবের নিদর্শন রূপে লিখেছেন। তাছাড়া ঐস্লামিক বিশ্বভাবনাও ত এর পরিপন্থী নয়; তা দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হারাব, এই দুই ভাগে গোটা

জগৎকে ভাগ করে; দার-উল-হারাবকে স্বধর্মে আনার জন্যে ধর্মশাস্ত্র ব্যবস্থাপনা দিয়েছে জেহাদের এবং বলেছেন, তাতে মৃত্যু হলে হবে শহীদ, আর জয়ী হলে হবে গাজী। বলেছে বিধর্মীদের হয় ধর্মান্তরিত করবে, না হয় কোতলে আম বা সমূলে নিপাত করবে, অসম্ভব হলে তাদের জিম্মি করে রাখবে ও মুণ্ড শুল্ক নেবে। এই শুল্কেরই নাম জিজিয়া।

অগ্নি-উপাসক পারসিকদের, বাইজেন্তীয় রোমকদের, পৌত্তলিক মিশরীদের এবং মাতৃদেবতা ও পিতৃদেবতা-পূজক হিন্দুদের মুল্লুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদি ইতিহাসে এর প্রমাণ এত স্পষ্ট ও প্রচুর যে, তা মুছে ফেলার উপায় নেই। কিন্তু মোছার আদৌ প্রয়োজনই আছে কি? প্রাচীন কালের দিগ্বিজয় ও রাজ্যবিস্তার ত এইভাবেই হত। তার কোন দেশ, কাল ও ধর্মগত পার্থক্য ছিল না। কিন্তু শুধু প্রাচীন বলছি কেন? ফ্যাসিস্ট সম্প্রসারণের পন্থাও ত একই দেখেছি আমরা এবং আজও পৃথিবী এই সামরিক অপবুদ্ধির কলুষমুক্ত হতে পারে নি বলেই, পারমাণবিক ত্রাস এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষকে বিবশ করে রেখেছে।

ডক্টর হিলালীর দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত [ইসলামের আগে পৃথিবীর সর্বত্র অপধর্ম চলিত ছিল, তার জঘন্যতা থেকে মুক্তির জন্যে মানুষ ইসলাম নিয়েছিলেন] একই রকম অপ্রামাণ্য। খ্রীস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে বুদ্ধের আবির্ভাব, তাঁর ছশ বছর পরে খ্রীস্ট এবং খ্রীস্টের ছশ বছর পরে মহম্মদ। এঁরা পর-পর এশিয়ায় তিনটি বৃহৎ ধর্ম প্রবর্তন করেন। এর মধ্যে আদি বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরবাদী হলেও তার ভিত্তিতে ছিল অহিংসা, মৈত্রী, বিবেক, বৈরাগ্য এবং চিত্তশুদ্ধি। আর খ্রীস্টধর্ম ঐশ্বরিক ত্রিতত্ত্বে বিশ্বাসী এবং তা প্রচার করেছে প্রেম, সেবা ও বিশ্বহিতৈষণার আদর্শ। সুতরাং অনাচার-কদাচার-কবলিত ধর্ম বলা যাবে না তাদের। আর প্রাচীন ভারতের হিন্দু ধর্ম, চীনের কংফুসীয় ও তাও ধর্ম বা জাপানের শিন্তো ধর্ম কিংবা ইহুদী ধর্মকেও কোন বিবেক-বান মানুষই অপধর্ম বলবেন না।

এর মধ্যে কংফুসীয় ধর্ম অনেকটা আদি বৌদ্ধ ধর্মের মতই আচারভিত্তিক, আর তাও ধর্ম হল অদ্বৈত বেদান্তেরই চৈনিক সংস্করণ। শিন্তো ধর্ম হল পিতৃগণের উপাসনা, আর ইহুদী ধর্ম হল জেহোবা বা পরম ব্রহ্মের আরাধনামূলক ধর্ম। হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা আমি করব না, শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, হিন্দু ধর্ম একটা এক-কেতাবী ও এক পয়গম্বরী ধর্ম নয়। তা একটা ধর্ম-সমবায়, যার মধ্যে আস্তিক-নাস্তিক, সাকারবাদী-নিরাকারবাদী, মাতৃউপাসক-পিতৃউপাসক সবাই আছেন এবং এক ধর্ম সম্প্রদায়কে বেষ্টন করে আছে এক-এক পর্যায়ের শাস্ত্র, যার মধ্যে উন্নততম পর্যায় বলে গণ্য হয় বৈদান্তিক বা ব্রহ্মবাদী ধর্ম।

সুতরাং শুধুই জড়বাদী, নিসর্গ-উপাসক ও লিঙ্গপূজক ছিলেন গোটা পৃথিবীর

মানুষ, এ ত প্রমাণ হল না। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা ইসলাম প্রথম দিয়েছে এ কথাও দাঁড়াল না। পারসিকদের আহুর মজদা ও অরহিমান দুই ঈশ্বরের পরিকল্পনা থাকলেও, ইহুদীদের ছিল এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরই। হিন্দুদের ব্রহ্মও এক ও অদ্বিতীয়, উপরন্তু তিনি বাক্যমনের অগোচর বলেও কথিত, আর ব্রহ্মের এই স্বরূপচিন্তা উপনিষদ থেকেই পল্লবিত হয়ে বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্রে এসেছে। কাজেই আরব উপকূল থেকে মালাবার উপকূলে এসে উপনিবিষ্ট মুসলমান মাপলাদের কাছ থেকে ৯ম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য একেশ্বরের তত্ত্ব পেয়ে বেদান্ত দর্শন প্রচার করেছিলেন, ডক্টর হিলালীর এ সিদ্ধান্ত হাস্যকর। একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি একথার সৃষ্টি এবং প্রধান প্রধান উপনিষদগুলিরও জন্মকাল খ্রীস্টের হাজারখানেক বছর আগে।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে, লিঙ্গপূজা ও নিরাবৃত নারীমূর্তির পূজা বলতে ডক্টর হিলালী সম্ভবত শৈব ও শাক্ত ধর্ম দুটি বোঝাতে চেয়েছেন এবং এই দুই ধর্মকে আদিম ফ্যালিক ওয়ারশিপ বা জননেন্দ্রিয়-পূজার পর্যায়ভুক্ত রূপে দেখাতে চেয়েছেন। বস্তুত জীব-জন্মের আদি উৎসরূপে যৌনাঙ্গের পূজা শুধু ভারতে নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই ছিল। গ্রীকদের, মিশরীদের, চীনাদের এবং মহম্মদ-পূর্ববর্তী আরব-কোরেশদের মধ্যেও এই পূজা চলিত ছিল। আবার আদিম রেড ইণ্ডিয়ান, টাহিটিয়ান ও অষ্ট্রিক কোল-গোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যেও ছিল। সুতরাং জিনিসটাকে বিনা পরীক্ষায় ন্যক্কারজনক বলে বাতিল করে দেওয়া চলে না। আগম ও নিগম দুই শাখায় বিভক্ত যে-শাস্ত্রকে আমরা তন্ত্র বলি, তার দার্শনিক ভিত্তি অনুসরণ করলে আমরা পাই পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্ব, যা থেকে তৈরি হয়েছে সাংখ্য। প্রকৃতি সর্বশক্তির আধারীভূতা, কিন্তু তিনি স্বয়ং পরিণামিনী নন, পুরুষের সহকারিতায় তিনি হন সক্রিয় এবং সেই যোগ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বপ্রপঞ্চ, এ কি বস্তুবিজ্ঞানের ম্যাটার ও এনার্জিরই দার্শনিক রূপকল্প নয়?

ডক্টর হিলালীর এখানে আর একটু বিচারস্থৈর্য প্রয়োজন ছিল। অনুরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করেছেন তিনি খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে। এ কথা সত্য যে, অগ্রসরমাণ ঐস্লামিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদী খ্রীস্টানদের যুদ্ধ হয়েছিল রাজ-নীতিক স্বার্থ নিয়েই, জেরুজালেমের কবর রক্ষা একটা অজুহাত মাত্র—তবু ক্রুজেডের সমালোচক বা সমর্থক না হয়েও বলব যে, খ্রীস্টধর্মে ভাল জিনিস কিছুই নেই, একথা যুক্তিসহ নয়। ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের ত্রিতত্ত্ব এবং প্রেম-ভক্তির আদর্শ, আর প্রটেস্টাণ্টদের বুদ্ধিবিশুদ্ধ ও আচারনিষ্ঠ আরাধনার আদর্শ আসলে ভারতীয় ভক্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গেরই দূর প্রতিচ্ছবি স্বরূপ এবং পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী একদিন এই ধর্মকে আশ্রয় করেই গ্রীকো-রোমক জড়বাদ থেকে আধ্যাত্মিক সমুন্নতির স্তরে এসেছিলেন, গড়েছিলেন বিরাট এক নূতন সভ্যতা, আর সেই সভ্য মানুষেরা জ্ঞানে,

কর্মে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে জগৎকে অনেক ঐশ্বর্য দিয়েছিলেন, একথা ভুললে চলবে কেন? মধ্যযুগে কলের জাহাজ ও আগ্নেয়াস্ত্র অবলম্বন করে এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় তাঁরা বিরাট-বিরাট সাম্রাজ্য বানিয়েছিলেন, নির্যাতন ও শোষণে বিধ্বস্ত করেছিলেন কোটি কোটি মানুষকে তা ঠিক। কিন্তু তা ত করেছিলেন তার আগে রোমকরাও, চেঙ্গিজ খাঁ, কুবলাই খাঁরাও।

সুতরাং ধর্মাবলম্বী মানুষদের ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মের তত্ত্বকে এক করে দেখলে হবে কেন? ধর্ম এককালে চিন্তা, আচরণ ও জীবনচর্যায় প্রেরণা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষ ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করে পাইকারি হারে অন্যায় করেছে, তার দৃষ্টান্ত সব যুগে সব দেশেই মিলবে। ইসলামে অমুসলমান সম্বন্ধে কি নির্দেশ আছে, তা ত গোড়াতেই বলেছি। তা সত্ত্বেও মুসলমান-শাসিত দেশগুলিতে আজও অমুসলমানরা আছেন, ভারতে তাঁরাই ছিলেন [এবং এখনো আছেন] সংখ্যাগরিষ্ঠ, এতে কি প্রমাণ হয়? ভারতবর্ষে ইসলামের পরিব্যাপ্তির কারণ সম্বন্ধে আমি ডক্টর হিলালীর মতামত মোটের উপরে স্বীকার করি, যদিও সশস্ত্র অভিযান যে হয়েছিল, একথাও অস্বীকার করি না। ছশো বছর পরে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা যে-মাতৃভূমি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন স্বতন্ত্র জাতিত্বের দাবীতে এবং পাকিস্তান কায়েম করলেন, এ সামাজিক অবিচার ও অনৈক্যেরই ফল।

কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলামের আগে কোন বিশুদ্ধ ধর্মবোধ বা সুস্থ জীবনচিন্তা ছিল না, বা ভারতকে ইসলাম একেশ্বরতত্ত্ব শিখিয়েছিল, একথা ভিত্তিহীন কেন তা আমি আগেই বলেছি। ভারতবর্ষে জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মচিন্তার চরম উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু তা আবদ্ধ ছিল উচ্চকোটির মানুষদের মধ্যে। তাকে গণতান্ত্রিক ছাঁচে ঢেলে গড়তে চেয়েছিলেন বৌদ্ধরা এবং কিছুটা পেরেওছিলেন, কিন্তু আক্রমণশীল হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের ফলেই তা স্থায়ী হয় নি। তান্ত্রিকধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ ঘটিয়ে একটা নূতন হিন্দু পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে, যা সনাতনীদের স্বীকৃতির বাইরে পড়ে থেকেছে আউল বাউল ইত্যাদি নামে। এর পরে এসেছে ইসলাম এবং অধিকারভ্রষ্ট নীচুতলার মানুষদের আপন শিবিরে টেনে নিয়েছে। তাতে হিন্দু জীবনচিন্তায় আত্মকেন্দ্রিক রক্ষণশীলতা পরিস্ফুট হয়েছে ঠিকই; কিন্তু তাকে বর্বরতা বা সংস্কৃতিশূন্যতা বলা যায় কি? অনুরূপ অনড় একগুঁয়েমি ইসলামেও দেখা যাবে। সূফীদের তাঁরা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিধর্মী বলেছেন এবং সবাই জানেন একদা মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতে চরম নির্যাতন চলেছে সূফীদের ওপরে, তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে কোরআন ও হাদিশকে মান্য করেন নি বলে।

লক্ষণীয় যে, ডক্টর হিলালী সূফীদের মধ্যে জ্ঞানবাদীদের কূতার্কিক ও ভক্তিবাদীদের বিরুতাচারী বলেছেন এবং ভারতের সমন্বয়বাদী সাধু-সন্তদের সম্বন্ধেও বিরূপ

মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামের সাংগঠনিক ভিত্তিই হল সাম্য, তাই যে কোন আচার ও পূজাপদ্ধতিতে অভ্যস্ত মানুষরাই তাতে স্বস্তিতে থাকতে পারে। সামাজিক শান্তির নামে সমন্বয়ের প্রয়াস অর্থহীন। তাঁর বিবেচনায় সমন্বয়ের নাম করে দুই ধর্মে জোড়াতালি দিতে গেলে আসলে দুটোরই প্রাণগত স্বাতন্ত্র্য খোয়া যায়। শাজাহান পুত্র দারাশিকো রচিত মজমে উল বাহেরিন বা দুই সমুদ্রের মিলন গ্রন্থকে এই কারণেই তিনি আধুনিক কালের পরিভাষা অনুযায়ী বিপথে প্রস্থিত বিদ্যার পুঁথি বলেছেন এবং চিস্তি গুরুদের বা সন্ত-সাধুদের অভিহিত করেছেন সদিচ্ছা সম্পন্ন অকেজো মানুষ বলে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁর এ বিচার সংস্কার-মুক্ত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে না নৈষ্ঠিক মুসলিম সমাজেও। আলবেরুনি, আলহাজ বা খুলদুন প্রমুখ পণ্ডিতদের এবং হাফিজ, রুমী, জামী, শাবিস্তারী প্রমুখ কবিদের ঐস্লামিক মাপকাঠিতে বিচার করে বাতিলের দলে ফেললে ইসলামই কিন্তু দরিদ্রতর হবে। আর নানক, চৈতন্য, দাদূ, কবীর, নামদেব প্রমুখকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন বেকুব বললে তা হবে ভারতীয় ইতিহাসের মূলগত প্রবণতাকেই অস্বীকার করা।

আসলে ডক্টর হিলালী দুটি বইয়েই একটা কল্পিত প্রতিপক্ষ খাড়া করে নিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে ইসলামের সমর্থনে আপন বক্তব্য পেশ করেছেন। বস্তুত সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইসলামের মহৎ দান সম্বন্ধে আমরাও অবহিত এবং তার উচ্চ ধর্মীয় ভূমিকাও আমাদের শ্রদ্ধার মধ্যে গৃহীত। কাজেই ইসলামকে কেউ আমরা ছোট ভাবছি এ মনে করার হেতু নেই। আবার অন্যান্য ধর্মের চেয়ে পরে জন্মেছে বলে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে বোঝানও নিষ্প্রয়োজন। সব ধর্মের মতো ইসলামেও জীবন ও জগৎ চিন্তার বহু গভীর কথা স্থান পেয়েছে। বহু আচার-অনুষ্ঠান ইসলাম প্রবর্তন করেছে যা বিশ্বের সব মানুষ নিতে পারেন। আবার ইসলামেও সীমার বাঁধন আছে, যে বাঁধনগুলির জন্য অনৈস্লামিক ধর্ম সম্বন্ধে কোন কোন ক্ষেত্রে তা আপোসে অসমর্থ। ডক্টর হিলালী এই জায়গায় মুক্তদৃষ্টি ঐতিহাসিক হতে পারেন নি, যা হওয়া প্রত্যাশিত ছিল তাঁর মত মানুষের কাছে।

সবশেষে একটা কথা। জগৎকে গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, আলকেমি শুধু ইসলামই দিয়েছে বললে ঠিক বলা হয় না। গ্রীক, হিন্দু, চীনা ও অমুসলিম আরবের দানও এক্ষেত্রে যথেষ্ট। স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা শিল্পশৈলী সম্বন্ধে কিংবা পার্লামেণ্টারি শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে ইসলামের দান অবশ্যই মর্যাদার সঙ্গে স্বীকার্য। কিন্তু পূর্বোক্ত জাতিগুলির এবং খ্রীস্টানদের দানকেও এই প্রসঙ্গে সসম্মানে মেনে নিতে হবে, কারণ তাঁরাই অগ্রবর্তী। স্পেনে আগত মুররা ইউরোপকে নবজীবনের চেতনা দিয়েছেন, তাঁর এক।। যেমন তর্কাতীত নয়, তেমনি নয় ভারত সম্বন্ধেও। স্পেনে নবজাগৃতি ইসলামের। দান হয় যদি, তাহলে খাস আরবে বা আরব্য-বলয়ে সে সময় আধুনিক-

ধরনের জাগৃতি আসেনি কেন? আর ভারতে হিন্দু বৌদ্ধ যুগের পর ইসলামের আবির্ভাবকাল কি ঠিক আলোর যুগ? তুর্কী ও মুঘল শাসকরা ঠিক সাম্যাশ্রিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন কি এদেশে? শিল্পরীতি, সাহিত্য, সঙ্গীত ও রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে তাঁরা নিশ্চয় অনেক বড জিনিস দিয়েছেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ছশো বছরেও সমীকরণ হয় নি বলেই পাকিস্তান হয়েছে, ডক্টর হিলালী এই দুঃখের কথা কথা কি অস্বীকার করতে পারেন?

□

॥ পাঁচ ॥ মধ্যযুগের মন ও মানুষ

উনিশ শতকে ইংরেজশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশে যে নূতন শিক্ষা-দীক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল, তার ফলে যে নূতন জীবন ও মননধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাকে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ নাম দিয়েছেন অনেকেই। তা এক ধরণের জাগরণ ঠিকই, কিন্তু ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তার একটি মূলগত পার্থক্য আছে। ইউরোপের মানুষ সামন্তযুগের অশিক্ষা-কুশিক্ষায় যে পুরানো গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হারিয়ে ফেলেছিল, তাকেই নূতন করে আবিষ্কার করেন এবং তা-ই তাঁদের মধ্যে জাগায় বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসা ও ঐতিহাসিক বস্তুবোধ, আর এ-দুটোকে আশ্রয় করেই মানুষ নূতনভাবে তৈরি করে নেন তাঁর সংস্কৃতি—যা আসলে তাঁদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কৃতিরই নূতন অনুবৃত্তি।

কিন্তু ভারতবর্ষ উনিশ শতকে যে-সংস্কৃতিকে পেল, তা হল বাইরের জিনিষ এবং তা বস্তুত ভারতীয় জীবন ও মননের সঙ্গে কোন রকমেই সম্পর্কিত নয় এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত শহুরেদের বাইরে গোটা দেশের অন্তর্লোককে তা স্পর্শও করল না। ফলে সর্বতোভাবে নূতন একটা জীবন-চেতনায় মূর্ত হল না তা। দেশের বৃহৎ একটা শ্রেণী রইলেন নিষ্ঠার সঙ্গে পুরানোকে আঁকড়ে, আর একটা শ্রেণী সমস্ত পুরানো মূল্যমান খুইয়ে ঐতিহ্যভ্রষ্ট আধুনিকে রূপান্তরিত হলেন। আর এই দুই শিবিরের যুদ্ধই চলল আবর্তিত হয়ে পুরো এক শতাব্দী ধরে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার প্রত্যেক ক্ষেত্রে। তাই একদিকে যখন দেখি রামমোহন বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারকে অন্যদিকে তখনই দেখি রাধাকান্ত রামকৃষ্ণ ভূদেবকে। বঙ্কিম কেশব বিবেকানন্দ চেষ্টা করেছেন দুইয়ের মধ্যে জোড়াতালি দেওয়ার। কিন্তু ফল হয়নি। এই বিরোধের জের চলেছে আজও।

এর তুলনায় আমাদের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে যে সমন্বয়মূলক নবজাগৃতির একটি আন্দোলন হয়েছিল, তাকে অনেকের কাছে বেশী নিকটের মনে হবে। অবশ্য আমাদের ধর্ম সমাজ সাহিত্য শিল্পকলা ও জীবনচর্যার বহিরঙ্গকে প্রভাবিত করলেও সত্তার অন্দরকে তাও বিশেষ ছুঁতে পারে নি এবং তা পারে নি বলেই রক্ষণশীলতার যে অনড়

অণ্ডাবরণের মধ্যে হিন্দু মানসিকতা হাজার বছর পাক খাচ্ছে, মুসলিম মানসিকতা খাচ্ছে সাত আটশো বছর, তা ভেঙে-চুরে একটা একাত্মিক জীবন ও রাষ্ট্রবোধ গড়ে ওঠে নি। তবু স্বীকার করতেই হবে যে জিনিষটা উঠেছিল এই মাটি থেকেই এবং তার বৈজিক উত্তরাধিকার আমরা সবাই অল্পাধিক পেয়েছি। উনিশ শতকের জাগৃতির বেলা এটা হয়নি, তা দেশের চাষী কারিগর ও দেহশ্রমী মানুষদের বরাবরে একেবারেই পৌছায নি। দুইয়ের মধ্যে এই মৌলিক পার্থক্যাটা না বুঝলে, ইউরোপীয় রেনেসাঁসের এবং তার সমসময়িক মধ্যযুগের ভারতীয় রেনেসাঁসের আসল তাৎপর্যটাই বুঝব না আমরা। সেই জন্যেই বিশদ আলোচনা দরকার বিষয়টির। কারণ এই উপলব্ধির উপরই মধ্যযুগের ধর্ম সমাজ সাহিত্য ও কলাকৃষ্টির সার্বিক উপলব্ধি নির্ভর করছে।

ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের গোড়ার পর্বটা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত হয়েছে। শার্লেমাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর উত্তর থেকে ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসি গথ, নানান বর্বর জাতির মানুষরা এসে পশ্চিমী দেশগুলোকে তছনছ করে দিয়েছে। তারপরে ধীরে ধীরে উঠল ছোট ছোট নগররাষ্ট্র এবং চাকরানভোগী সামন্তদের নিয়ে এক এক জন ক্ষুদে যোদ্ধা এরাই এক একটি মুল্লুকে শাসনকর্তা হয়ে বসলেন। কালে তাঁরাই হলেন রাজা। এই সব নগররাষ্ট্রই পরে কিন্তু বর্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর জন্ম দিয়েছে। এইসব রাষ্ট্রে রাজা, সামন্ত এবং শ্রেষ্ঠী তিনকেই চালাত খ্রীস্টান গির্জা। শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম সমাজ ও ব্যক্তিক আচার-আচরণ সবই নিয়ন্ত্রিত হত পাদ্রীদের নির্দেশে, আর তাঁরা ছিলেন বেশীর ভাগই নিরক্ষর এবং এঁদের যথা-সম্বল ছিল কিছু বাইবেলী বিদ্যার সঙ্গে রকমারি তুকতাক ও ম্যাজিক বা কৃষ্ণবিদ্যা।

এই অন্ধকারকে ভেদ করে ফুটল রেনেসাঁস বা নবজাগৃতির আলোক। গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির মধ্যে গুহায়িত ছিল যে জীবনদর্শন, যে বলিষ্ঠ ভাবস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয়, তাকে নতুন করে মানুষ আবিষ্কার করলে খ্রীস্টীয় গির্জার দাপটকে একান্তে সরিয়ে ফেলে। সেই আত্মাবিষ্কার চিত্রকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান—সব দিকেই মূর্ত হয়ে গড়ে তুলল নূতন ইউরোপকে এবং সেই ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা তিন মহাদেশে প্রতিষ্ঠিত করল নিজেকে। রেনেসাঁসের পর রিফর্মেশন বা সংস্কার, তারপর শিল্প বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব তাকে ধাপে ধাপে আজকের দরজা পর্যন্ত টেনে এনেছে। এই ইউরোপের ইতিহাসে হানাহানি, জাতিদ্বন্দ্ব, অনাচার ও বেলেল্লামি আছে, আছে দুর্বল ও অনগ্রসরকে শোষণ করে স্ফীত হওয়ার বর্বরতা। সেই সঙ্গেই আবার আছে, মানুষের সামূহিক আত্মপ্রকাশ এবং অগ্রযাত্রার মহত্ত্বও।

ইউরোপের সঙ্গে তুলনায় ঐ সময়ের ভারতেতিহাসের ধারাও মোটামুটি একই। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর বৃহৎ সাম্রাজ্য ভেঙে গেল এবং উদ্ভব হল ছোট-বড় বহু নরপতির। রাজকীয় সমর্থনের অভাবে বৌদ্ধধর্মের ইমারত ধ্বসে পড়ল এবং হিন্দু নাম

নিয়ে ক্ষমতাবানেরা নানা বিকট ও বিকৃত পূজাপদ্ধতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। শ-দেড়েক বছরের মধ্যেই উদ্ভব হল কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্যের এবং তাঁরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নূতন ধর্মাদর্শ দিযে করলেন জোটবদ্ধ, আর নিম্নবর্ণের মানুষদের দিলেন সমাজের বাইরে ঠেলে, কপালে অচ্ছুতের মার্কা দাগিয়ে দিয়ে। ১২শ শতকে আগত মুসলিম শাসকরা এই অচ্ছুতদের অসন্তোষ ভাঙিয়েই গড়ে তুললেন বৃহৎ এক মুসলমান সমাজকে এবং ভারতবর্ষে নূতন একটি সংস্কৃতির জন্ম হল যার ঐস্লামিক সংস্কৃতি। এর পরের ইতিহাসে দেখি একদিকে মুসলিম শাসনের স্বাধিকার-প্রমত্ততা, অন্যদিকে হিন্দুর আত্মরক্ষামূলক সঙ্কোচন। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় বা সমঝোতা হতে পারল না, ইসলামের কাঠামোতে অন্য ধর্মের স্বীকৃতি অনুমোদিত নয় বলে।

তবু ইতিহাস নিষ্ক্রিয় থাকেনি; বাইরে থেকে এসেছিলেন সুফীরা, তাঁদের মধ্যে যে অংশ জ্ঞানবাদী, তাঁরা প্রচার করলেন আনাল হক বা অহংব্রহ্মের তত্ত্ব। যাঁরা ভক্তিবাদী, তাঁরা উদ্ঘাটিত করলেন মধুর ভাবাশ্রিত সাধনপ্রণালী, যা বৈষ্ণবীয় রাগ-মার্গের সাধনার অনুকল্প। বলা নিষ্প্রয়োজন যে হিন্দু মুসলিম ভাবমিলনেরই একটা প্রয়াস করেছিলেন এঁরা। তা করেছিলেন চিস্তি ও দরবেশ সম্প্রদায়—মারফতীরাও। তাঁরা আত্মা ও মোক্ষের অর্থাৎ হকিক ও তৌহিদের তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং নাছুত লাহুত মালকুত ও হাউতে ধাপে ধাপে উন্নীত হওয়াকেই বলেছেন সাধনার লক্ষ্য। এই ধাপগুলি হল যথাক্রমে দেহময় মনোময় ও জ্ঞানময় সত্তারই ঐস্লামিক বিকল্প। সাজাহানপুত্র দারা লিখেছিলেন মজমে উল বাহেরিন বা দুই সাগরের মিলন, যাতে উপনিষদ ও কোরআনের মূল তত্ত্বগুলির মিলন দেখান হয়েছে এবং প্রেমাত্মক আরাধনার মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এই সমন্বয়ের বাণীই প্রচার করেছিলেন রামানন্দ নানক দাদূ কবীর রজ্জবালি প্রমুখ সন্তরা। এদের মধ্যে কবীর ও রজ্জবালি ছিলেন মুসলমান, কিন্তু উভয়েরই শিষ্যরা ছিলেন হিন্দু-মুসলমান। যেমন নানক ও দাদূর ছিল হিন্দুর সঙ্গে মুসলিম শিষ্যও। যেমন হরিদাস নিয়েছিলেন চৈতন্যের শিষ্যত্ব। এই সন্ত-সাধকদের প্রভাবে সমাজের নীচুতলায় ধীরে ধীরে একটা একীকরণের প্রয়াস সুরু হয়েছিল, যদিও মুসলিম রাজশক্তি ছিল সেই প্রয়াসের উপর খড়্গহস্ত।

মধ্যযুগের এই সন্ত-সাধকদের জীবন ও সাধন-প্রণালীও এক ধরণের রেনেসাঁস ঘটিয়েছে। এঁদের সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকদের প্রথম অবহিত করেছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন আজ থেকে বহু বছর আগে, তাঁর ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা বই প্রকাশ করে। বইটি মূল্যবান এবং প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে আজও এটিই আমাদের প্রধান প্রামাণ্য বই, যদিও মূল বিষয়ের কোন কোন বিভাগ নিয়ে ইতিমধ্যে বিশদতর বই বা প্রবন্ধাদি লিখেছেন আরও কেউ কেউ। সেইসব বই পুঁথির কোন কোনটার কথা এই আলোচনায় উল্লেখ করার দরকার হতে পারে। মোটের উপর পঞ্জাব উত্তরপ্রদেশ

রাজস্থান গুজরাট মহারাষ্ট্র জুড়ে গোটা ভারতেই যে সমন্বয়পন্থী সন্তরা আবির্ভূত হযেছিলেন, তাঁদের জীবন ও সাধনার কথা বইটিতে বলা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত হলেও আলোচনা তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুলিখিত।

একটা কথা মনে রাখতে হবে, সন্ত-সাধকদের মধ্যে কয়েকজন সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী পুরুষ থাকলেও বেশীর ভাগই ছিলেন নিরক্ষর সাধারণ মানুষ। তাই তাঁরা জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথাও বলেননি, শাস্ত্রীয নির্দেশমত জটিল সাধন-ভজনের পথও দেখাননি। তাঁরা দাস্য বাৎসল্য ও মাধুর্য-আশ্রিত সহজ-সাধনের কথাই বলেছেন এবং সেই সাধনে ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মায়তনের প্রাধান্য অস্বীকার করে মানবিক স্বাধিকারকেই বড করে দেখাতে চেযেছেন। শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব সমাজে একটা জ্ঞানমার্গীয আভিজাত্য সৃষ্টি করেছিল। রামানুজ ও নিম্বার্ক দ্বৈত আরাধনার মাধ্যমে সেই নির্বিশেষ তত্ত্বজ্ঞানকে যুগল আরাধনার পথে এগিযে দিয়েছিলেন, আর এই যুগল আরাধনাভিত্তিক ভক্তিতত্ত্বই হল সন্তপন্থার বীজস্বরূপ এবং লক্ষণীয যে সারা ভারতেই এর রূপ মোটামুটি এক। এই ঐক্যসূত্রটি ক্ষিতিমোহন সেন ধরে দিতে চেষ্টা করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে সন্ত সাধকদের সাধনার ধারা সারা ভারতেই মোটামুটি এক ছিল। কেউ হযত রামসীতার, কেউ রাধাকৃষ্ণ বা লছমী-নারাযণের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করতেন। কেউ করতেন আল্লা বা নিরুপাধিক পরমেশ্বরের উদ্দেশে। কিন্তু মূল তত্ত্বটি তাঁদের অভিন্ন ছিল। তা হল সৃষ্টিকর্তার এবং মানবজাতির একত্ব, আর জীবনে সিদ্ধিলাভের উপায প্রেমভক্তি বিবেক বৈরাগ্য ও সেবার পথ অনুসরণ। বলা নিষ্প্রযোজন যে এই প্রচারণাব মধ্যে প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, ভেদাভেদের বিরুদ্ধে যেমন একটি বিদ্রোহের সুর ছিল, তেমনি ছিল সর্বমানুষে একটি সাম্যের সুরও। তাই আউল বাউল দরবেশ ফকির অবধূত প্রভৃতি নানা নামে এই মতাবলম্বীদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সমাজগণ্ডীর বাইরে এবং নানা পন্থার অনুগামী সংস্থাও তৈরি হযেছে ভারতবর্ষে এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়। বাংলায় গৌড়ীয়, আসামে মহাপুরুষিয়া, উড়িষ্যায় ভাগবতী, গুজরাটে ভগত, নানা নাম তাঁদের।

আগেই বলেছি এঁদের সাধনভজনের প্রণালী ছিল সহজ সরল। কেউ বিধিবদ্ধ কেতাবের মধ্যে আপন প্রত্যয় বেঁধে দেন নি। অকপট প্রেম ও আর্তি-সম্বলিত গানেই অভিব্যক্ত হয়েছে সকলের অন্তরের কথা। এই সমস্ত গানই ধর্মগ্রন্থ-সুলভ মর্যাদায় গৃহীত হয়েছে ভক্তদের সমাজে। বাংলায় বৈষ্ণব মহাজনদের পদ, অসমিয়াতে শঙ্করদেব ও মাধবদেবের, মারাঠীতে তুকারাম ও নামদেবের, গুজরাটীতে নরসী ভগতের, রাজস্থানীতে মীরার [রাণা কুম্ভের পত্নী বলে কিম্বদন্তী থাকলেও এবং বৃন্দাবনে সনাতনের সঙ্গে এঁর সাক্ষাৎ হওয়ার গল্প বহুল-প্রচারিত হলেও, আসলে ভোজরাজের পত্নী কিংবা বৃন্দাবনের জনৈকা ভক্তিমতী নর্তকী] ভজনাবলী, পঞ্জাবীতে জপজী

গীতিমালা অসীম মর্যাদায় গৃহীত হয়েছে। হয়েছে দক্ষিণী আলোয়ারদের পদাবলী তিরুবল্লুবর অপ্পর পত্তিনত্তর প্রমুখের ভজন, যা কবীরের দোঁহা ও তুকার অভঙ্গেরই দক্ষিণী অগ্রজ। দক্ষিণীদের প্রসঙ্গটি বাদে সেন মহাশয় এঁদের অনেকের কথাই বলেছেন এবং বলেছেন পরিপাটি করেই, যদিও কারো রচনার নিদর্শন বা বিস্তৃত বচন উদ্ধৃত হয়নি তাঁর আলোচনায়।

দক্ষিণী আলোয়ারদের প্রসঙ্গ ও রচনা বাঙালী পাঠককে সংক্ষেপে উপহার দিয়েছেন বহুদিন আগে নলিনীমোহন সান্যাল শাস্ত্রী এবং তাঁর পরে পূর্ণতররূপে দিয়েছেন যতীন্দ্র-দাস রামানুজ দাস। আর মীরা ও কবীর সম্বন্ধে পূর্ণতর বই লিখেছেন হিন্দীতে অধ্যাপক শ্যামদাস। আলোয়ারদের প্রসঙ্গ সমধিক প্রণিধানযোগ্য এই কারণে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের উদ্ভব তা থেকেই হয়েছে এমনই অনুমান করা হয়। তাঁদের গানে যে আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জনের সুরটি পাওয়া যায়, বিরহাবেশজনিত দশার যে ছবি তাঁরা এঁকেছেন, সেটাই অনেকের মতে গৌড়ীয়দের রচনায় নবভাবে মূর্তি নিয়েছে। তবে তাঁদের ভাবভুবনে রাধা নেই, আছেন গোদাদেবী বা নাপ্পিনাই। এই শব্দটির অর্থ নাকি আরাধনাকারিণী; জানি না তা থেকেই গৌড়দেশে রাধা নামের উৎপত্তি কিনা। যাই হোক দক্ষিণী পণ্ডিতরা এঁদের একটা দার্শনিক অনুক্রমে বাঁধার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন এঁরা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে প্রেরণা হিসাবে অনুসরণ করেছেন, যেমন গৌড়ীয় তত্ত্বেরও বিচার করা হয়েছে এবং হয় অচিন্ত্যভেদাভেদের ছকে ফেলে। বস্তুত চৈতন্য নিজে দার্শনিক মনোভাবাপন্ন হলেও এবং অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব তাঁর হাত দিয়ে প্রবর্তিত হলেও, তাঁর দক্ষিণ হস্ত নিত্যানন্দ কিন্তু ছিলেন অবধূত এবং তাঁর পন্থা সন্তদের মতোই সহজপন্থা ছিল। আর তাঁর [নিত্যানন্দের] ছেলে বীরভদ্রই গৌড়ীয় সংস্কার আদি সংগঠক। নাড়ার শিষ্য নেড়ানেড়ী নামধেয় সহজিয়াদের নাকি তিনিই বৈষ্ণব গোষ্ঠীভুক্ত করেছিলেন। এই জন্যেই চৈতন্য-জীবনীতে নিত্যানন্দের স্থান এত উঁচু। বৈষ্ণব দুনিয়ায় তিনি সেণ্টপল স্বরূপ!

মধ্যযুগের এই মরমিয়া সাধকরা জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গে, উচ্চবর্ণ ও অনুচ্চবর্ণে, হিন্দু ও মুসলমানে একীকরণের যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন, যাকে আমি ভাবগত রেনেসাঁস বলব, তার পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং সে-মূল্য খুঁজতে হবে আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেই। বলাবাহুল্য সামাজিক স্তরেও এই চিন্তা-সমন্বয় কর্মের মধ্যে দিয়ে সার্থক হলে আমাদের জাতীয়তার গড়নই অন্য রকম হত। ছশো বছরব্যাপী মুসলিম শাসন ও দুশো বছরব্যাপী ইংরেজ শাসনের পর তাহলে কিন্তু এক ভারতবর্ষ তিনটে হত না এবং ভারতের সমাজজীবনে এমন ছুৎ-অচ্ছুতের সীমারেখা টানা থাকত না আজও। অবশ্য তা বলে এই সমন্বয়বাদ ষোল আনা নিষ্ফল হয়নি। সর্বধর্ম সমবায়ের সুন্দর একটি আদর্শের সঙ্গেই মানবতাবাদের এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা

রূপে তা আমাদের মর্মকে স্পর্শ করেছে। এই সেদিনও রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও নেহেরুর চিন্তারই মধ্যে আমরা এর প্রতিধ্বনি শুনেছি। শুনেছি হাদী হোসেন ও মৌলানা আজাদের কথার মধ্যেও। সেই মহৎ বাণীর আদি স্রষ্টা এবং বাহকদের অনেককেই চোখের সামনে তুলে ধরেছেন ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর ছোট সুন্দর বইয়ে। সংক্ষিপ্ততা, অসম্পূর্ণতা ও দু-একটি তথ্যগত ভ্রান্তি সত্ত্বেও বইটির উপযোগিতা তাই এত বছরেও কমেনি।

বইটি পড়তে পড়তে এই ভেবে অবাক লেগেছে যে যেদিন আধুনিক যানবাহন ছিল না, তীর্থযাত্রী বণিক ও ভ্রাম্যমাণ সাধুর বিরল আনাগোনা ছাড়া ভারতের এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের চেনাজানাও প্রায় ছিল না বললেই চলে, সেদিন সারা ভারতের প্রাণবীণা প্রায় এক সুরে বেজেছিল, সর্বত্র এক ধরণের সাধনভজন চলিত হয়েছিল, একই প্রাণধর্ম সম্বলিত গান রচিত হয়েছিল, এই অনুকূল লোকমানস তৈরি হয়েছিল কি করে? শুধু ভারতেই বা বলছি কেন? ইরানী সুফীদের এবং ক্যাথলিক খ্রীস্টানদের মধ্যেও ত এইরকম মরমিয়া রীতির সাধনা ও সাহিত্যের দেখা পাই। হাফিজ জামী রুমী ও শাবিস্তারীর অথবা সেণ্ট অগাস্তিন ও সেণ্ট তেরেসার রচনাবলীর কথা বলছি। রাগাত্মিকা মূর্তিতে মারী মাদলিনের আত্ম-সমর্পণের অথবা নয় কুমারীর বাসকসজ্জা, প্রতীক্ষা ও বিরহের মধ্যে সুরগত ঐক্য লক্ষ্য করেই কি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বৈষ্ণব ধর্মের উৎস হিসাবে খ্রীষ্টধর্মের নাম করেছিলেন? তা হোক বা না হোক, বোঝা যাচ্ছে সমগ্র পূর্বাঞ্চলীয় পৃথিবীতেই একদা চলিত ছিল একটা ভাবিক ঐক্য, যা ভূগোলের ব্যবধানের উপর জয়ী হয়েছিল।

□

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে যে সমন্বয়পন্থী সন্ত সাধকেরা জন্মেছিলেন, তাঁদের জীবন ও চিন্তার সঙ্গে বাঙালী পাঠককে অনেকটা পরিচিত করান ক্ষিতিমোহন সেন। তাঁর আগেও অবশ্য সাধুমোহান্তদের জীবন নিয়ে কিছু কিছু বই-পুঁথি লেখা হয়েছিল, গানের মাধ্যমে দোঁহা এবং ভজনের কিছু কিছু নিদর্শনও প্রচার লাভ করেছিল। কিন্তু সন্ত-সাধকদের রচনার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ব্যাখ্যার বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ও বাউলদের সঙ্গে তার প্রাণগত ঐক্য সন্ধানের বিশেষ চেষ্টা হয় নি। ক্ষিতিমোহন সেন সেদিক থেকে স্মরণীয় কাজ করেছেন, আর তাঁর সে কাজ রবীন্দ্রনাথকেও স্পর্শ করেছে।

কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেনের আলোচনা থেকে একটি বৃহৎ অধ্যায় সম্পূর্ণ বাদ পড়ে গিয়েছিল। সন্তপন্থার যাঁরা আদি, সেই তামিল ও কানাড়ী সন্তদের কথা তাঁর রচনায় গৃহীত হয় নি। গুজরাট মহারাষ্ট্র উড়িষ্যা ও আসামের সন্তদের সম্বন্ধেও তাঁর আলোচনা নিতান্তই প্রাথমিক ধরনের। আর বাঙালী বাউলদের রচনানিদর্শন রূপে তাঁর দ্বারা উদ্ধৃত পদাবলীর প্রাচীনতা ত সন্দেহাতীত মনে হয়ই না, এমন কি গৌড়ীয় পরকীয়া তত্ত্বের মর্ম তিনি কতটা উপলব্ধি করেছিলেন তাও আমি সঠিক বলতে পারি না। তবে এসব সত্ত্বেও সজ্ঞিৎসা ও রসবোধের জন্যে তিনি গণনীয়।

দক্ষিণী সন্তদের, বিশেষত তামিল আলোয়ারদের সম্বন্ধে বাংলায় প্রথম উল্লেখ্য আলোচনার সূত্রপাত করেন নলিনীমোহন সান্যাল শাস্ত্রী। তারপর যতীন্দ্রদাস রামানুজ দাস এই পথে যোগ্যতর কর্মীরূপে দেখা দিয়েছেন। গৌড়ীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে রাধাগোবিন্দ নাথ, বিমানবিহারী মজুমদার এই দুজনের কাজই বিশেষ নজর করার মত। তবে সমগ্র ভারতের পটভূমিতে রেখে সন্তসাধকদের মননধারার একটি খসড়া বানানোর প্রয়োজন এখনো রয়েছে এবং এই কাজ ঐতিহাসিক তথ্যজ্ঞান ও দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টি একসঙ্গে দুই-ই যাঁর আছে তিনিই সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন।

সুখের কথা যে নিখিল ভারত বেতার সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সর্দার প্যাটেল বক্তৃতামালার একটিতে এই খসড়া তৈরির চেষ্টা হয়েছে এবং তা করেছেন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ড. ভি, রাঘবন। The Great Integrators : The

Saint-Singers of India নামে তাঁর এই বক্তৃতা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি তামিলনাড়ু কর্ণাটক অন্ধ্র ও উত্তরপ্রদেশের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন, আর গুজরাট মহারাষ্ট্র বাংলা আসাম সিন্ধু ও কাশ্মীরের মরমিয়াদের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উপস্থিত করেছেন। উদ্যমটি অভিনন্দনীয়, কারণ এরকম কাজ ইতিপূর্বে হয় নি।

নাতিসংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি সারা ভারতের একটি মানসিক ঐক্য কিভাবে অন্তঃ-প্রবাহী স্রোতের মত কাজ করেছে তা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে শিব শক্তি নারায়ণ কৃষ্ণ রাম নানা উপাস্যে অনুরাগ-সম্পন্ন হলেও লক্ষ্যে সন্তেরা সকলেই এক এবং সেই লক্ষ্যে উন্নীত হবার জন্যে এক পন্থারই নির্দেশ দিয়েছেন। সে পন্থা হল সহজ ভক্তি ও অকপট আর্তির তথা বিভিন্ন মত পথ ও আদর্শের প্রতি সহনশীল প্রত্যয় ও ঔদার্যের অনুশীলন। তাই সন্তদের মধ্যে যেমন হিন্দু-মুসলমান দুইই ছিলেন, ছিলেন ব্রাহ্মণ-শূদ্র, তেমনি তাঁদের শিষ্যেরাও ছিলেন নানা গোষ্ঠী ও শ্রেণীর।

এই সূত্রে ড রাঘবন দুটি সাধারণ সিদ্ধান্তে হাজির হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সবাই সন্তরা হয়ত মহাপণ্ডিত ছিলেন না, কেউ কেউ নিরক্ষরও ছিলেন। কিন্তু দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব সবই তাঁদের অধিগত ছিল। প্রতিদিনের ঘরোয়া ভাষায় শিষ্য ও অনুগামীদের সামনে গান ও উপদেশ আকারে সেই তত্ত্বজ্ঞানই ব্যক্ত করেছেন তাঁরা এবং তা করেছেন নিতান্ত আটপৌরে উপমা ও অলঙ্কারের সাহায্যে। দেশের জনগণ যে কেতাবী শিক্ষা না পেয়েও জীবন-চিন্তায় একটা উচ্চ ও নৈতিক মূল্যমান আশ্রয় করতে পেরেছিলেন সে এই শিক্ষার ফলেই। অর্থাৎ দেশের সাধারণ মানুষরা নিরক্ষর হয়ত ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে অশিক্ষিত ছিলেন না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত তিনি করেছেন যে রাজনীতি অর্থনীতির বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে দেশের সামাজিক বাতাবরণ যদিও আমূল উল্টেপাল্টে গেছে বারবার, কিন্তু জীবনচর্যা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অদৃশ্য একটি একত্ব চিরদিন অক্ষুণ্ণ থেকেছে। এই একত্বই হচ্ছে আসল ভারতবর্ষের প্রাণ তা—সাম্যাশ্রিত এমন একটি সত্যদৃষ্টির উপর স্থাপিত যে কোনদিনই তার বিনাশ হবে না। সৎ-ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কর্তব্য হবে এই সত্য বস্তুটুকু খুঁজে বের করা, কারণ তার দেখা পেলেই আমাদের আজকের অনেক বিরোধ, বৈষম্য ও অনৈক্যের অবসান হয়ে যাবে। সত্যকার ঐক্য ফিরবে।

এই দুটি সিদ্ধান্তের কোনটাকেই পুরোপুরি গ্রহণ করা মুস্কিল। কেন বলছি। ব্রাহ্মণ্য-ভারতের ভেদবুদ্ধি যাঁদের কোণঠাসা করে সমস্ত সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল, সেই শূদ্রেরাই একদিন চিহ্নিত হয়েছেন অচ্ছুৎ রূপে। তারপর ১২শ শতকে ইসলাম এলে তাকে স্বাগত করেছিলেন কে বা কারা? এই অচ্ছুৎরাই ত দলে দলে মুসলমান হয়েছিলেন। সমাজের একত্ব যখন তার ফলে ভেঙে পড়ছে, তখনই দুই

ধর্মের মধ্যে সমন্বয়সূত্র খুঁজে একটা জোড়াতালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। উত্তর ভারতে কবীর এবং তাঁর শিষ্য নানক ও দাদূ, পূর্ব ভারতে চৈতন্য এবং তাঁর পরিকর গোস্বামীরা শঙ্করদেব মাধবদেব পশ্চিম ভারতে নামদেব তুকারাম ভক্ত নরসী, সবাই এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁদের বাণী ও চিন্তার মধ্যে একটা সমন্বয়ী দর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। মহৎ চেষ্টা এটা সন্দেহ নেই; এবং বিস্ময়করও, কারণ সেই ১৩শ, ১৭শ ও ১৫শ শতাব্দীতে ভারতের দূরদূরান্তবর্তী অঞ্চলগুলির মধ্যে এক-মনস্কতা জন্মান ষোল আনা আকস্মিক হতে পারে না।

কিন্তু এই সমন্বয়ের পন্থা কি বাস্তবে কার্যকর হয়েছে? তা হলে ত সমাজ-কাঠামো থেকে জাতিভেদ দূর হত, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ উন্মুলিত হত। শোষণপীড়ন ও ভেদনির্ভর এই সমাজ অন্ধ অদৃষ্টবাদ আঁকড়ে না থেকে শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার অধিকার স্বীকার করত। মনে রাখতে হবে আটশো বছর পরে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ছুরিতে ভারতবর্ষ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে এবং দুই অংশেই এখনও সাম্প্রদায়িক বৈরিতা কারণে অকারণে ফণা তুলছে। আর এখনো উচ্চনীচের মার্কা দিয়ে দুই অংশেই সমাজের বিন্যাসে বিভেদ জীইয়ে রাখা হয়েছে এবং শতকরা ৭৫ জন ভ্রষ্টাধিকার নরনারীই এখনো লেখাপড়ার আলো থেকে হাজার মাইল দূরে রয়েছেন।

কাজেই সন্তদের পন্থা যে সাফল্যে অভিষিক্ত হয়েছে এবং এ-ই আসল ভারতের রূপ একথা না বলে তাঁদের উদ্দেশ্য সাধু ছিল এইটুকু বললেই বোধ হয় খাঁটি কথা বলা হয়। আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে যে দক্ষিণ ভারতের সমন্বয় সাধনের চিন্তা মুসলিমদের আবির্ভাবের অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল। তামিলনাদের নায়নমার শৈবরা এবং আলোয়ার বৈষ্ণবরা বা কর্ণাটকের বীর শৈবরা বা হরিদাসপন্থী বৈষ্ণবরা সর্বধর্ম ও শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য প্রচার করেছিলেন খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দী থেকে এবং ১৭শ শতাব্দীতে অন্ধ্রের ত্যাগরাজ পর্যন্ত চলেছে এরই ধারা। কি এর তাৎপর্য বলে বুঝব?

আসলে বৌদ্ধ বিঘাতনের পর হিন্দু পুনরভ্যুত্থানের দ্বারা শঙ্কর যে ছুৎ-অচ্ছুতের সীমারেখা টেনে সমাজকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, এঁরা কি তারই প্রতিবাদকারী তথা প্রতিকারসন্ধানী নন? উত্তরের সন্তরা শ-চারেক বছর পরে মুসলিম অভ্যুদয় হলে বীণায় আর একটি তার চড়ান, তা হল হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ের। পূর্ব-পশ্চিমের ধারাও তাই। তবে লক্ষণীয় যে গৌড়ীয় গোস্বামীরা প্রধানত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বে এবং পদকর্তারা পরকীয়া তত্ত্বেই সমধিক আস্থাসম্পন্ন। তাঁদের চেয়ে তাই বাউলদের চিন্তা ও চর্যায় এদিকটার প্রাধান্য দেখি। সহজিয়া সিদ্ধাইদের অনুবর্তী বাউলপন্থায় এসেছিল সমন্বয়চিন্তার কথাটাই বড় হয়ে এবং কবীরাদির সঙ্গে মানসিক যোগসূত্র তাঁদের যতটা ঘনিষ্ঠ, গৌড়ীয় আচার্য বা পদকর্তাদের ততটা নয়।

ড. রাঘবনের ভূমিকায় এই ঐতিহাসিক পটভূমিটা স্বীকৃত হয় নি। তিনি সন্তপন্থাকে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত সনাতন ভারতীয় সাধনপন্থারই ক্রমপরিণতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত সনাতনী ধারার বিরুদ্ধে এ ছিল এক ধরনের বিদ্রোহ এবং সেই কারণেই রক্ষণশীল বর্ণাশ্রমীদের আওতার বাইরে থাকতে হয়েছে এই গুরুদের। আচার অভ্যাসের চেয়ে এঁরা আন্তরিক নিষ্ঠাকে বড় বলেছেন, একান্তরিত কৌলীন্যের চেয়ে ভেদাভেদহীন একত্বকে বড় বলেছেন। এ কি সনাতন রীতিতে স্বীকৃত পন্থা ? আল্লা ও কৃষ্ণে সমীকরণ, এও নিশ্চয় গ্রহণীয় বিবেচিত হয় নি সর্বজনের কাছে, যেহেতু সমাজ-কাঠামোতে আজও তা হয় নি দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ ব্যাখ্যাটা ধর্মভিত্তিক, ইতিহাসভিত্তিক নয়।

তাছাড়া বক্তৃতাটির আর একটা অসম্পূর্ণতা, এতে আসামের মহাপুরুষিয়া, উড়িষ্যার ভাগবত ও বাংলার গৌড়ীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনার অংশ প্রায় কিছুই নয়। আসামের শঙ্করদেব ও বাংলার রামপ্রসাদ সেন স্বীকৃতিমাত্র পেয়েছেন যদিও রামপ্রসাদের চেয়ে অবধূত বা কর্তাভজাদের উল্লেখ বেশী প্রাসঙ্গিক হত। আর পূর্বাঞ্চলের আলোচনায় উড়িষ্যার ত উল্লেখই নেই। যাই হোক বইয়ের দ্বিতীয় অংশে সেখানে পর্যায়ক্রমে পদাবলীর নিদর্শন অনুবাদ মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়েছে, সেখানে প্রীত হবার জিনিষ কম পাবেন না জিজ্ঞাসু পাঠকরা। সমগ্র ভারতের ভাষালোক মন্থন করে এতগুলি মনোরম কবিতা এক জায়গায় করাই নিজস্বভাবে একটা বড কাজ এবং এ কাজ ড. রাঘবনের মত গুণীরই উপযুক্ত। অনুবাদগুলিও প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছ, তবে পণ্ডিতী কলমের অনুবাদ ত, তাই প্রায়শ সাহিত্যরস বিবর্জিত।

শ্রীমতী সতী ঘোষের লেখা বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ এবং শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তীর ফিলজফিক্যাল ফাউণ্ডেশন অব বেঙ্গল বৈষ্ণভিজম্ বই দুটি পড়ে উপকৃত হলাম। শ্রীমতী ঘোষ বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাস ও বৈষ্ণব দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করে সেই পটভূমিতে জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, শেখর প্রমুখ প্রধান পদকর্তাদের রচনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ধারা তাঁর ১৯শ শতক এবং ২০শ শতকের গোড়ার অংশটিও ঈষৎ স্পর্শ করেছে। শ্রীচক্রবর্তীর বইটিতে আছে সমগ্রভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ। বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব থেকে কিভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে, গৌড়ীয় তত্ত্বের মর্মবাণী কি, কেন চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত-বিগ্রহ রূপে গৌড়দেশে পূজা পান, সব তিনি পর্যাপ্ত যুক্তিতর্ক সহকারে উপস্থিত করেছেন। খ্রীষ্টীয় মরমিয়াবাদ এবং আধুনিক অস্তিত্ববাদের সঙ্গে বৈষ্ণবতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন তিনি। দুটি বই একত্রে পড়লে সবাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, সাহিত্য ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করবেন। সবাই জানেন ১৯শ শতকে বাংলা দেশে যুক্তিবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রাদুর্ভাব হলে, তারই পাশাপাশি উঠেছিল ভক্তিবাদী শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মও। প্রথম শিবিরে ছিলেন পরমহংস, দ্বিতীয় শিবিরে বৈষ্ণববাদের প্রবক্তা বিজয়কৃষ্ণ। এই শেষোক্তদের উদ্যোগে কৃষ্ণলীলা, চৈতন্যলীলা ও গোপীতত্ত্ব নিয়ে প্রভূত বইপুঁথি লেখা হতে থাকে। সেই লেখার ধারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এটা লক্ষণীয় বিশেষভাবে।

নিষ্ঠাবানরা জানেন সনাতন হিন্দুধর্মে সৃষ্টিকর্তার অভিব্যক্তি তিন পৃথক রূপে। ব্রহ্মা-রূপে তিনি জনয়িতা, বিষ্ণুরূপে প্রতিপালক আর শিবরূপে সংহারক। এ তিনই কিন্তু আসলে এক পরমার্থের ত্রিরূপ। তা সত্ত্বেও লৌকিক পূজায়তনে এঁরা পৃথক দেবতার মর্যাদায় গৃহীত হয়েছেন। এর মধ্যে ব্রহ্মার ব্যাপক পূজা কোথাও হয় কিনা জানা নেই। অপর দুজন বিষ্ণু ও শিব কিন্তু কালক্রমে স্ব-স্ব প্রকৃতি লক্ষ্মী ও শক্তিসহ সারা ভারতেই পূজিত হন। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, পুরাণে এসে তিনি হয়েছেন লৌকিক দেবতা নারায়ণ এবং তখনই হয়েছেন লক্ষ্মীপতি। পশুপতি শিব প্রাগার্যদেরই দেবতা এবং

অম্বা ভবানী তাঁর প্রকৃতি। বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে কালে শিব এক হয়ে গেছেন। অর্থাৎ আর্যে-প্রাগার্যে সংমিশ্রণ হয়ে যখন হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়েছে, তখনই লক্ষ্মী-নারায়ণ ও শিবশক্তির পূজা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নারায়ণ অর্থাৎ বিষ্ণুর অবতাররূপেই গৃহীত হন রাম ও কৃষ্ণ এবং শিবশক্তি ও লক্ষ্মীনারায়ণের ছকে রামসীতা ও কৃষ্ণরাধার মিলিতরূপের পূজা সাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

সাংখ্য দর্শন বলেছেন, পুরুষ ও প্রকৃতি, বিজ্ঞান যাকে ম্যাটার ও এনার্জী বলে, মিলিত ভাবে এই সৃষ্টিপ্রপঞ্চ গড়েছে। পুরুষ-প্রকৃতির এই অনন্তনির্ভর একত্বকেই রূপকাকারে প্রতিফলিত করা হয়েছে যুগল আরাধনার মধ্যে, এমন কথা বলেছেন কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি। বস্তুতপক্ষে আগে দর্শনের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, পরে তাকেই লৌকিক প্রতীকে রূপায়িত করা হয়েছে, এ বললে বোধহয় ঠিক বলা হবে না। লৌকিক প্রতীককেই দার্শনিক প্রেক্ষিতে বাঁধা হয়েছে বললে সেটা বোধহয় বেশী সঙ্গত কথা হবে। তাছাড়া তান্ত্রিক ও শৈব দার্শনিকদের কেউ কেউ সাংখ্য দর্শনের আনুগত্য করলেও, কি শৈব আর কি বৈষ্ণব, দার্শনিকরা সবাই কিন্তু বেদান্তের দোহাই দিয়েছেন। অদ্বৈত বেদান্তের নির্বিশেষ তত্ত্বকে কি করে শিবশক্তি ও রাধাকৃষ্ণের যুগল-আরাধনার কাঠামোতে খাপ খাওযান হল তার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। বীরশৈব বা লকুলীশ পাশুপত দর্শন-ব্যাখ্যাতাদের কিংবা রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভ প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যদের বচনার ধারা অনুসরণ করলেই সে ইতিহাসের ক্রমপরিণতিটুকু ধরতে পারি আমরা। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা চোখ দেব শুধু বৈষ্ণব দর্শনেই এবং তাঁদের গৌড়ীয় শাখায়। সেটুকুই এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

একটা কথা তার আগে বলে রাখা দরকার যে বৈষ্ণব বলতে বিষ্ণুর উপাসক বোঝালেও কার্যত বিষ্ণুর এবং তাঁর সমস্ত অবতারের উপাসকই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। উত্তরের সন্তেরা, দক্ষিণের আলোয়ার বা আসামের মহাপুরুষিয়া, বাংলার গৌড়ীয়রা, গুর্জর ও মহারাষ্ট্রের ভক্তেরা, সবাই বৈষ্ণব নামে চিহ্নিত। নানক, দাদূ, মীরা, রজ্জবালি, কবীর, চৈতন্য, শঙ্করদেব, মাধবদেব, তুকারাম, নামদেব, নরসী ভগত, তিরুবল্লুবর, সবাই বৈষ্ণব। এঁদের কেউ গিরিধারী গোপালের, কেউ পীতমের, কেউ বা বিঠোবার নামে প্রেমভক্তি নিবেদন করেছেন। কারও আরাধ্য রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ, কারো বা পুরুষোত্তম ও নাপ্পীনায়ীর মিলিত বিগ্রহ। অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের পিছনে বৃহৎ একটা সর্বভারতীয় পরিমণ্ডল আছে, যদিও অঞ্চল ভেদে এক এক স্থানে তার রূপ এক এক রকম। রাধাকৃষ্ণভিত্তিক যুগল-আরাধনা বলাই বাহুল্য বাংলার এবং মিথিলা, উড়িষ্যা এবং আসামেরও। আর এই আরাধনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে যে দর্শন, তাই গৌড়ীয় দর্শন বলে অভিহিত। অবশ্য গৌড়ীয় দর্শন একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নূতন বা নিজস্ব দর্শন নয়। প্রেমভক্তি সমাশ্রিত দ্বৈতবাদী দর্শনেরই

একটা গণনীয় শাখা তা, যদিও তাতে বৈদগ্ধ্য ও মৌলিকতা আছে, আছে কিছু অভিনবত্বও।

তার আগে প্রশ্ন উঠবে রাধা কোথা থেকে এলেন? কৃষ্ণের প্রথম জীবন বর্ণিত হয়েছে ভাগবতে, মধ্য জীবন মহাভারতে, আর শেষ জীবন হরিবংশে। এর কোনটাতেই রাধার নাম নেই। ভাগবতে রাসলীলার কথা আছে, গোপীদের কথা আছে, কিন্তু রাধা অনুপস্থিত। বিষ্ণুপুরাণেও তিনি নেই। পদ্মপুরাণ বা এই রকম অর্বাচীন কোন কোন বইয়ে তাঁর দেখা মেলে। প্রকৃতপক্ষে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকে তাঁকে সাহিত্যে প্রথম দেখা যায়। অবশ্য তার শ-দুই বছর আগে পাহাড়পুরের মন্দিরে পোড়ামাটিতে খোদিত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি পাওয়া গেছে। এতে অনুমান করা যেতে পারে-যে রাধার বয়স হাজার বছরের বেশী নয় এবং আদি কৃষ্ণ বা দেবকীনন্দন বাসুদেব তাঁর চেয়ে অন্তত হাজার দুই বছরের বড়। কিন্তু যবেই এসে থাকুন আর যেখান থেকেই এসে থাকুন রাধা ঠাকুরাণী, বৈষ্ণব দুনিয়ায় আজ তাঁর যে মহিমান্বিত আসন, তা দেখে সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। জয়দেব, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত, সমস্ত মহান কবিই তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছেন। সনাতন, রূপ, জীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন পর্যন্ত মহামহাপণ্ডিত তাঁর প্রেমভক্তি-সমুজ্জ্বল কৃষ্ণানুরাগের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। এমন সার্বিকপূজা ও প্রেমারতি লাভ করেছেন পৃথিবীর আর কোন কাব্য বা ইতিহাসের নায়িকা? আসলে রাধাই গৌড়ীয় তত্ত্বের কেন্দ্রানুগ শক্তি। আর তিনি বাঙালীরই সৃষ্টি।

২.

বাংলাদেশে মহাপ্রভু চৈতন্য যদিও বৈষ্ণব ধর্মকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড করান, কিন্তু কৃষ্ণকাহিনী যে অনেক দিনের এবং তার যে একটা সর্বভারতীয় রূপ ছিল এ আমরা দেখেছি। বেদের বিষ্ণু উপনিষদে এসে হয়েছেন দেবকীনন্দন বাসুদেব এবং সেই বাসুদেবই ভাগবত ও মহাভারতে এসে হয়েছেন কৃষ্ণ বাসুদেব। ভাগবতে বৃন্দাবনলীলার ও মহাভারতে কুরুক্ষেত্রলীলার নায়ক রূপে তারপর তিনি ধর্মায়তনে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছেন এবং কৃষ্ণ-উপাসক সাত্বত ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। নারদপাঞ্চরাত্রীয় ভক্তি উপাসনা এরও পরের ধাপ। তার আবির্ভাব বোধহয় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতকে। ৯ম শতাব্দী নাগাদ দক্ষিণে যমুনাচার্য, রামানুজ, নিম্বার্ক পরের পর উঠেছেন এবং যথাক্রমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও ভেদাভেদবাদ প্রচার করেছেন শঙ্করীয় কট্টর অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হিসাবে। শঙ্কর বলেন, একমাত্র অবিচল সত্য ব্রহ্ম, অবিদ্যা বা মায়ার বশেই জগৎকে সত্য বলে মনে

হয় আমাদের। এই অবিদ্যার ছেদনেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। রামানুজ বললেন, জগৎও সত্য, ব্রহ্মও সত্য। জগৎ ব্রহ্মেরই ব্যক্ত রূপ এবং প্রেমের মন্ত্রে এরা পরস্পরযুক্ত। অতএব চাই প্রেমের উদ্বোধন। নিম্বার্ক ও মধ্ব পর্যন্ত এসে এই তত্ত্বই হযেছে প্রেম ভক্তি সমাশ্রিত কৃষ্ণারাধনায় রূপান্তরিত। চৈতন্য-প্রবর্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব এ থেকে বেশী দূরবর্তী নয়। কৃষ্ণ স্বরূপশক্তি এবং জগৎপ্রপঞ্চ তাঁরই জীবশক্তি, আর এ দুই আগুন ও দাহিকার মত একাত্ম, এই হল চৈতন্যবাদের মোদ্দা কথা।

বলা দরকার যে চৈতন্য কোন স্বরচিত গ্রন্থে এই তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করে যান নি। শিক্ষাষ্টক নামে আটটি মাত্র নীতিকথাজাতীয় শ্লোক তাঁর রচনা বলে চলিত আছে। তাঁর অনুগত শিষ্যদের মধ্যে সনাতন, রূপ আর তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবই বৈষ্ণব দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। করেছেন চৈতন্য জীবনীকার কৃষ্ণদাস কবিরাজও। এই দর্শনমতে প্রেমভক্তিই হল পরমার্থ এবং কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধাই হলেন সেই প্রেমের সাক্ষাৎ বিগ্রহ। কিন্তু রাধাভাব দেহীর পক্ষে অলভ্য, তা হল রাগাত্মিকা ভাব। গোপী বা সখীদের আনুগত্য করেই [রাগানুগা ভাবের পথ ধরেই] ভক্তকে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলায় অবলীন হতে হবে। তটস্থ বা মুমুক্ষু জীবকে এই মতানুসারে আত্মসমর্পিতা নারীর মানসিকতায় অধিষ্ঠিত হতে হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদের দার্শনিক ছাঁচের সঙ্গে এই আত্মবিস্মৃত ভক্তিবিহ্বলতার যোগসূত্র খুঁজে বের করা বেশ একটু কষ্টকল্পিত নয় কি? বলতে বাধা নেই যে আপাতভাবে জিনিষটা তাই। তবে গৌড়ীয় রসসাধনার আদি প্রেরণা দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছিল সেন রাজাদের আমলে, এ যদি সত্যি হয় তাহলে রহস্যটার নাগাল ধরা হয়ত কঠিন হবে না। দক্ষিণের আলোয়াররা তন্নিষ্ঠ একাগ্রতায় গোদাদেবী ও পুরুষোত্তমের মিলনকে ভাবরূপে সম্ভোগ করতেন। তাঁদের সেই দিব্যোন্মাদ অবস্থার যে সব বিবরণ আছে, তার অনেকটুকুরই হুবহু প্রতিফলন আমরা দেখি চৈতন্যের জীবনে। তাঁকে সেই জন্যেই বলা হয় রাধাভাবদ্যুতিস্বরূপ।

শ্রীমতী ঘোষ গৌড়ীয় দর্শনের এই গোড়ার কথাগুলো যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলেছেন। আর বিশদভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীচক্রবর্তী। কিন্তু প্রসঙ্গত বক্তব্য যে রোমান ক্যাথলিকদের ভাবসাধনার বা কিয়ের্কেগার্ড প্রবর্তিত অস্তিত্ববাদের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের মিল-অমিলের দিকগুলি সযত্নে উদঘাটিত করে দেখালেও তিনিও আলোয়ার ভাবসাধকদের কথা বিশেষ কিছু বলেন নি। অথচ দক্ষিণের দ্বৈতবাদী দর্শনের মতই বা তার চেয়ে বেশী করে বিম্বিত হয়েছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বে তাঁদের এবং সাধন-ভজনের রীতিপদ্ধতিগুলি। তাছাড়া উত্তরের সন্তসাধকদের এবং সুফী ভক্তসাধকদের সঙ্গেও গৌড়ীয় প্রেমভক্তিতত্ত্বের তুলনায় আলোচনা হতে পারে। এক সময় রোমান ক্যাথলিকদের যুগল-উপাসনা, নব কুমারীর প্রতীক্ষা, বিরহ, বাসকসজ্জা

ইত্যাদি থেকে এবং বুক অব সামস-এর প্রেমগাথাগুলি থেকে বৈষ্ণব ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে বলা হত। আবার মুঘল দরবার দিয়ে আগত আলহাজ, থুলমুন, হাফিজ, জালালুদ্দীন রুমী, জামী প্রমুখ ইরানী সুফীদের তত্ত্ব ও কাব্যসাহিত্য থেকে আহৃত প্রেরণাই কৃষ্ণ-রাধা কাহিনীতে প্রক্ষেপ করা হয়েছে, এও বলা হত। বস্তুত এ দুটো সিদ্ধান্তের মূল্য আজ আর স্বীকার্য না হলেও, আলোয়ারদের প্রসঙ্গটা এত সহজে বাতিলযোগ্য নয়। মনে রাখতে হবে স্বয়ং রামানুজ ও নিম্বার্কই আলোয়ার প্রভাব পেয়েছিলেন এবং দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে প্রেমের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তাঁরা সেই প্রভাবেই। তাছাড়া মনে রাখতে হবে চৈতন্য স্বয়ং দক্ষিণে গিয়েছিলেন এবং রায় রামানন্দ তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন।

বইয়ের সূচনায় শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন, তিনি শুধু দর্শনের প্রসঙ্গই উপস্থাপিত করছেন, ইতিহাসের কথায় যাচ্ছেন না। তাঁর কথা কি খুব সমীচীন মনে করা যায়? দর্শনের প্রতিপাদ্যকে কি ইতিহাসের মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায়? চৈতন্য ইতিহাসের পুরুষ। একদিকে বর্ণহিন্দুদেব নির্মম গোঁড়ামি, অন্যদিকে শাসকদের ধর্মান্তরণের জুলুম যখন নিম্নবর্গের মানুষকে বিব্রত করে তুলেছে, সেই সন্ধিক্ষণে তিনি প্রচার করেছিলেন সাম্যাশ্রিত বৈষ্ণব ধর্ম, যা আদ্বিজচণ্ডালে ঐক্যের বাণী শুনিয়েছিল, আবার ব্যাপক ধর্মান্তরণের স্রোতকেও ঠেকিয়েছিল। তাঁর এই নেতৃত্ব সমাজশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তি কেউই প্রীতির চোখে দেখেন নি। তার ফলেই দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে। এই বাস্তব পটভূমিটি বাদ দিয়ে চৈতন্যজীবন বা দর্শন কোনটারই পর্যালোচনা হতে পারে না। আসলে চৈতন্যের প্রেমধর্মও মানুষের উজ্জীবনের জন্যেই। সেইজন্যেই তা সঙ্গীত, কাব্যকলা, জীবনচর্যা, সকল দিকে প্রভাবিত করেছিল বাংলাকে, আবার বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে বাইরেও ব্যাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে শ্রীচক্রবর্তীই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ওপর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য বই লিখেছেন। তাঁর অধ্যয়নের পরিসর বিস্তৃত, বিষয়বিন্যাস সুচিন্তিত, যুক্তিতর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণের অবতারণাতেও তিনি প্রশংসনীয় নিপুণতা দেখিয়েছেন। এই কারণেই গৌড়ীয় দর্শন ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রমথনাথ তর্কভূষণ, রাধাগোবিন্দ নাথ, সুশীলকুমার দে ও বিমানবিহারী মজুমদারের সঙ্গে তাঁর নামও সমাসনভুক্ত হবে।

শ্রীমতী ঘোষের বই এতখানি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ রচনা নয়, যদিও তা বেশী সুখপাঠ্য এবং সংক্ষিপ্ত বলেই সর্বজনগ্রাহ্য। তবে বৈষ্ণবীয় তত্ত্বদর্শনের আলোতেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের আস্বাদ বোঝা ও বোঝানো উচিত, না তাকে লৌকিক প্রেমের কবিতারূপেও নেওয়া যেতে পারে, সে তর্ক আছেই। আসলে প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব কবিতায়, বিশেষত জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে আধ্যাত্মিকতা সন্ধানের প্রয়োজন কি? আর

চৈতন্যোত্তর কবিতার জন্যেই বা তা পদে পদে অপরিহার্য কি জন্যে? সরাসরি আত্মানুভূতির অভিব্যক্তি বেয়াদপি হবে ভেবেই কবিরা সময় সময় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর আড়াল খুঁজেছেন, এ ভাবলে ক্ষতি নেই ত। যাই হোক বৈষ্ণব জীবনী, সন্দর্ভ ও আচরণবিধি সংক্রান্ত বইগুলির কথা লেখিকা বলেন নি। বললে ভাল হত। ইদানীন্তন কালে কৃষ্ণতত্ত্বের পুনরুজ্জীবন প্রসঙ্গ তিনি তুলেছেন এবং মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনার কিছু কিছু টুকরো উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এখানেও উনিশ শতকে যে বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সেন, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিশিরকুমার ঘোষ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নেতৃত্বে নূতন করে দেশে কৃষ্ণভক্তির আবাদ হয়েছিল এবং হয়েছিল ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সনাতনী শিবিরের পক্ষ থেকে একটা পাল্টা ধারা দাঁড় করানর তাগিদে, সে কথাটা কিন্তু স্পষ্ট করে বলা দরকার ছিল।

□

॥ আট ॥ মুঘল কবিতার শিল্পবোধ

মধ্যযুগীয় ভারতের মর্জি ও মানুষ বোঝার সহায়ক একখানি মূল্যবান বই পড়ার সুযোগ হল। এটি হল গোলডেন ট্রেজারি অব পার্সিয়ান পোয়েট্রি, সম্পাদনা করেছেন ড. হাদী হোসেন। এতে আদি থেকে একবারে আজ পর্যন্ত ফারসী ভাষায় গজল ও গীতিকবিতা যা লেখা হয়েছে, তার সুনির্বাচিত নিদর্শনসমূহ সময়ানুক্রমে উপস্থিত করা হযেছে ইংরেজী গদ্যানুবাদে। সুরুতে কবিদের জন্ম মৃত্যুর তারিখ সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, যা কবিতাগুলির পটভূমি বুঝতে সহায়তা করবে জিজ্ঞাসু পাঠককে।

এর মধ্যে ফেরদৌসী, হাফিজ, সাদী, রুমী, জামী, শাবিস্তারী ও ওমর খৈয়ামের মতো প্রখ্যাত কবিদের রচনার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচয় বহুজনের আছে। নিকলসন, ম্যুর ও ফিটজেরাল্ডের অনুবাদ অনেকেই পড়েছেন ইংরেজীতে। মোজাম্মেল হক, এমদাদ আলী, নজরুল ইসলাম, হিতেন বসু ও কান্তিচন্দ্র ঘোষের বাংলা অনুবাদও অজানা নয় কারও। কাজেই ড. হোসেন তাঁদের জন্যে বইয়ের এই বিভাগে আরো কিছু নূতন ঐশ্বর্য হয়ত দিয়েছেন, কিন্তু একেবারে নূতন কোন অজানা মুল্লুকের দোর খুলে দেন নি। তিনি নতুন জিনিষ দিয়েছেন অন্য বিভাগে, সে হল মুঘল ভারতের পরিবেশে রচিত ফারসী কবিতার নিদর্শনগুলি। তা শুধু অভিনব নয়, অনেকেরই অজ্ঞাত।

বাবর, হুমায়ুন, তাঁর ছোট ভাই কামরান, আকবর, তাঁর সহকারী বৈরাম, জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও দারাশিকোহ-প্রমুখ মুঘল বাদশার ও বাদশাপুত্রদের কবিতা সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে সংকলনটিতে। হয়েছে নূরজাহান, মমতাজ ও জেবউন্নিসা প্রমুখ বেগম ও বাদশাজাদীদের কবিতা। তাছাড়া আমীর খসরু, ফৈজী, উরফী, নাজিরী প্রমুখ সভাসদ বা দরবারী কবিদের কবিতার নিদর্শনও স্থান পেয়েছে। শুধু হুমায়ুনপত্নী বেগম হামিদার এবং ফৈজীর সহোদর আবুল ফজলের কবিতার দেখা মিলল না, যদিও শ্রীমতী জোসেফাইন র‍্যানসম এঁদের কবিতারও কিছু টুকরো উপহার দিয়েছেন তাঁর মুঘল ইণ্ডিয়া বইতে।

বাদশাহী কবিতাগুলিতে সামন্ত যুগীয় স্বৈরশাসকদের মানসিকতা, তাঁদের বৈভব ও ক্ষমতার দম্ভ, সুরা ও মিথুনাসক্তির আতিশয্য, কিংবা বৈরনিপাতের ও আত্মমহিমা বিঘোষণের বাগাড়ম্বরই শুধু প্রতিফলিত হয় নি। জাগতিক নশ্বরতার উপলব্ধি, সত্যের জন্যে সন্ধিৎসা, অমৃতত্ব অর্জনের তৃষ্ণা এবং পাওয়ার ক্লান্তি ও না পাওয়ার ব্যথাও ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে। সভাসদ ও আমীর উমরাহদের কবিতায় শুধু প্রভু-পরিতোষক চাটুবাক্যই উচ্চারিত হয় নি, হয়েছে নিগূঢ় তত্ত্বকথা, নির্মুক্ত সত্যভাষণও ; এবং পৃথিবীর মহান শাসক যে কোনও পার্থিব শাসককেই রেয়াৎ করেন না, এমন অকপট সতর্কবাণী উচ্চারণেও ক্ষান্ত হন নি কবিরা সময় সময়।

অবশ্য গোলাপ, সুরা ও সাকী [মদ্যবহনকারী সুদর্শন বালক, যদিও বাংলা ভাষায় সাকী শব্দটা সখী শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই চলিত হয়েছে !], এই তিনের চিত্রপ্রতীক হাফিজ ও ওমর খৈয়াম থেকে কবিতাগুলির মধ্যে এসেছে কতকটা পরম্পরাগতভাবেই এবং জৈব মিলনই যে জীবনাতীত মহামিলনের সোপান, একথাও ইতস্তত উচ্চারিত হয়েছে ইরানী সূফীদের আদর্শে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুঘল কবিতায় আছে খানিকটা নূতন জীবনদর্শন, যে দর্শন রচয়িতারা আহরণ করেছিলেন ভারতের মাটি থেকে এবং এ জায়গায় শুধু কালের বিচারে না, ভাবের বিচারেও তাঁরা কিছুটা পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় সন্তসাধকদের সমধর্মী।

সুভাষিতের আকারে লেখা ছোট ছোট শ্লোকগুলির মধ্যে যেমন মনোরম কাব্যরস পরিবেষণ করা হয়েছে, তেমনি অনেক অমূল্য তত্ত্বকথাও তুলে ধরা হয়েছে, যাতে শ্লেষ ও যমকের বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দপ্রয়োগের আশ্চর্য কারিগরী অনুবাদের ধকল পাড়ি দিয়েও খোয়া যায়নি। কিন্তু তার চেয়ে প্রণিধানযোগ্য কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত দর্শন এবং মূল্যবোধ, যার গুণে এরা ভারতীয় সাহিত্যের ধনভাণ্ডারে সসম্মানে গৃহীত হবার অধিকারী। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সংস্কৃতের মত ফারসীতেও যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হয়েছিল এবং সে সাহিত্য যে বৈচিত্র্যে ও শিল্পগুণে নগণ্য নয়, এ জ্ঞান দেরীতে হলেও দেশবাসীর পাওয়া দরকার ছিল।

আমরা ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রধানত হিন্দু কবির কণ্ঠই শুনেছি, যে কণ্ঠ রাজশক্তি কর্তৃক অনুষ্ঠিত অধিকার ও স্বৈরাচারের প্রতিবাদে মুখর। শুনেছি মুসলমান দরবারী ইতিহাসকার ও উলেমাদের কণ্ঠ যা দার উল ইসলামকে শাশ্বত বলে সগর্বে ঘোষণা করেছে এবং কাফেরকে কোতলে আম করে পবিত্র স্থান নিষ্কণ্টক করার জন্যে জেহাদের জিগির দিয়েছে। আর শুনেছি সন্তসাধুদের কণ্ঠ, যা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাবে ও কর্মে ঐক্য স্থাপনের এবং সর্বধর্ম সমন্বয়িত বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেছে। কিন্তু সেই মুসলিম কণ্ঠ শোনার সুযোগ হয়নি আমাদের, যা সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনাকে ব্যক্ত করেছে, অরণ্যে ফোটা ফুলের মত বা রাত্রি শেষে

গেয়ে ওঠা পাখীর মত। সে কণ্ঠ যে ছিল, তাই শোনান হয়নি, যদিও কয়েক হাজার পৃষ্ঠায় ব্যাপ্ত মুঘল যুগের শ্রমসাধ্য ইতিহাস লিখেছেন অনেকে। হাদী হোসেনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন ভারতবাসী, এই কণ্ঠ তাঁদের বরাবর পৌঁছে দেবার জন্যে।

মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে আমার কোন উচ্ছ্বাস জাগে না। সাধারণ মানুষের গৌরব বা সুখ সৌভাগ্য কিছুই বাড়ে নি এ যুগে। হিন্দু সমাজের উঁচুমহল যেমন নিজ নিজ ধর্ম ও আচার সংস্কারের শুচিতা রক্ষার নামে সেদিন সীমাহীন রক্ষণশীলতার আশ্রয় নিয়েছেন, নীচুমহল তেমনি সমস্ত স্থিতমূল্য হারিয়ে দৈন্য ও অপমানের মধ্যেই দিন যাপনে বাধ্য হয়েছেন। বর্ণাশ্রমীদের হাতে ধাক্কা খেয়ে নিম্ন বর্ণের যে-হিন্দুরা ইসলাম নিয়েছেন তাঁদের বরাতও ফেরেনি। কারণ সেদিন সাধারণ মুসলমানের অবস্থাও কিছু মাত্র সুখের ছিল না। নিঃস্ব ভূমিদাস ও পেশাদার সিপাহী রূপে তাঁরা কায়ক্লেশে জীবন বহন করেছেন। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান কেউই শান্তিতে ছিলেন না। অথচ গোঁড়া ধর্মজ্ঞদের বাধায় একে অন্যের কাছে এগিয়ে আসতে পারেন নি। ভেদভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজবিন্যাসই তা হতে দেয়নি।

তাছাড়া সমাজজীবনও সেদিন ছিল নিরন্তর অশান্তি ও অনিশ্চয়তার লীলা-ভূমি। রাজধানী দিল্লী থেকে প্রদেশ [সুবা]-গুলি এত দূরে ছিল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল এমনই অপটু, যে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কোন আলোই বেশীর ভাগ জায়গায় এসে পৌঁছত না। এই সুযোগে বহু স্থানেই আঞ্চলিক শাসনকর্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসতেন এবং যথেচ্ছ কর আদায় ও নির্যাতনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রজার জীবন দুর্বহ করে তুলতেন। এর ওপর বিদ্রোহী প্রতিনিধিকে সায়েস্তা করার জন্যে মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারের ফৌজ এসে হানা দিত, যার আসল ধাক্কা সামলাতে হত গরীব জনসাধারণকে। রাজা-বদল ডেকে আনত প্রজার বিপর্যয়।

এই পটভূমি যে উন্নত বা প্রাণবন্ত সাহিত্যের খুব বেশী পরিপোষক হতে পারে না, এ আশা করি ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। বাস্তবেও দেখি গ্রাম্য দেবদেবীর মহিমা ও বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর কোঁদলই প্রধান আশ্রয় হয়েছে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের। তার চরিত্র হয় আঞ্চলিক, নয় সাম্প্রদায়িক। অবশ্য নৈষ্ঠিক সমাজের বাইরে চাষী ও বৃত্তিজীবী মানুষের হাতে তৈরি হয়েছে যে সব কাহিনী, কবিতা বা গান, তাতে একটা সহজ মানবতার সুর পাওয়া যায়, যা হিন্দুত্ব বা মুসলমানত্বের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা নয়, যা বাস্তবিকই অরণ্যে ফোটা ফুলের মত আপন সরলতায় সম্পূর্ণ। কিন্তু ভদ্রসমাজ এ সাহিত্যকে কোন দিনই সম্মানার্হ মনে করতেন না। এর আবেদনও ছিল না তাদের মনে কিছুমাত্র।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে মুঘল দরবারে বা মুঘলাই পৃষ্ঠপোষকতায় এই রকম বিমুক্ত মনের সাহিত্য জন্মায়নি। তার মধ্যে আছে অনিবার্য সীমার শাসন। তবু তা নিছক মুসলিম কবিতা নয়, বাদশাহী কাব্যবিলাস ত নয়ই: উচ্চাভিলাষী বাবর,

হৃতমান হুমায়ুন, কূটবুদ্ধি আকবর, অনমনীয় জাহাঙ্গীর, সৌন্দর্যবিলাসী শাজাহান, ভাগ্যবিড়ম্বিত দারা [শুধু আলমগীর এই তালিকায় নেই, বোধ হয় কবিতা বরদাস্ত হত না তাঁর ধাতে !], সকলেরই অন্তরের অন্দরমহল প্রতিফলিত হয়েছে কবিতাগুলির মধ্যে। তাতে আমরা দেখি সমস্ত আতিশয্য, আড়ম্বর ও ব্যসনের মধ্যেই একটি নিঃসঙ্গ একাকীত্ব, একটি অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা পাক খাচ্ছে। অর্থাৎ কবিতাগুলিতে পাই সেই কাছের মানুষের দেখা, যাঁরা সুখে দুঃখে আমাদেরই মতো।

ডা হাদী হোসেন ছিলেন উদ্ভিদতত্ত্বের অধ্যাপক। কিন্তু হৃদয়ে ছিল তাঁর শিল্পীর অনুরাগ, আর ফারসী ভাষায় অনুরাগ তিনি পেয়েছিলেন জন্মসূত্রে, কেননা তাঁর মা ছিলেন ইরানী। এই দুই অনুরাগই আকৃষ্ট করে তাঁকে ফারসী কাব্য-সাহিত্যের অফুরন্ত সম্পদের দিকে। তারই ফল এই অভিনব সংগ্রহ, যাতে প্রায় হাজার বছরের কাব্যসম্পদ সময়ানুক্রমে গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে মুঘল কবিতার সংগ্রহটি আগেই বলেছি, অনেকের কাছে অনাস্বাদিতপূর্ব। তাই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বিশেষভাবে তার কথা বললাম। নইলে সব অনুবাদই হৃদ্য এবং রীতিমত কাব্যরসসমৃদ্ধ, কেননা হাদী হোসেন শুধু পণ্ডিত ছিলেন না, ছিলেন কবিও এবং কবিতার অনুবাদ কবি ছাড়া কে সার্থক ভাবে করতে পারেন ?

। কথাসাজ ।

১৯শ শতকে ইউরোপীয় ছাঁচের শিক্ষাদীক্ষা এদেশে প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দেশে জেগেছিল গোটা তিনেক জিনিষ। প্রথমত এসেছিল তীব্র স্বাজাত্যবোধ, দ্বিতীয়ত নরনারীর সম্পর্ক বিচারে নূতন মূল্যবোধ, তৃতীয় বিজ্ঞান ও ইতিহাস চেতনা, যার ফলে পুরানো অপবিশ্বাস ও কুসংস্কার পরিহাবের চেষ্টা সক্রিয় হয়েছিল। এই প্রধান তিনটি পরিবর্তনের দিকে নজর রেখেই ঐ রূপান্তরকে নবজাগৃতি বা রেনেসাঁস বলি আমরা এবং ঐতিহাসিক কার্যকারণসূত্রে ইংরেজ শাসনই সেই জাগৃতি এনেছে, এ-কথাও বলি। কথাটা একটু যাচিয়ে দেখা দরকার।

ইউরোপের ইতিহাসে যে অধ্যায়টা রেনেসাঁস নামে অভিহিত, তার সঙ্গে আমাদের জাগৃতির মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইউরোপে রোমক সাম্রাজ্যের পতন হলে শার্লেমঁার নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের অনেকটা অংশকে পবিত্র রোমক সাম্রাজ্য নাম দিয়ে পুনর্গঠিত করার প্রয়াস হয়েছিল। কিন্তু জিনিষটা টিঁকল না। উত্তর থেকে ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ প্রভৃতি নানা বর্বর জাতি এসে ইউরোপকে ছারখার করে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে জন্মাল বিভিন্ন নগররাষ্ট্র এবং তাই শেষ পর্যন্ত রূপ দিল বর্তমান ইউরোপীয় রাষ্ট্রিক কাঠামোর। এই ইউরোপের সংস্কৃতি কি ছিল? প্রায় কিছুই না। সামন্তপ্রভু ও খ্রীস্টান গির্জার তাঁবেদার ভূমিদাস মাত্র ছিলেন সাধারণ মানুষরা।

তারপর ১৪শ শতক নাগাদ এল নবজাগৃতি এবং তা একা গ্রীকোরোমক সংস্কৃতির প্রাচীন স্তন্যরস প্রভাবেই। মানুষ জেগে উঠল পুঁথি ও পাদ্রীর সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব সরিয়ে দিয়ে এবং ভৌম ও বাণিজ্যিক প্রভুত্বের শৃঙ্খল ভেঙে। তার মধ্যে জাগল জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বাস্তব সন্ধিৎসা, জাগল দিগ্বিজয়ের নেশা, এল নূতন মূল্যবোধ। রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা, নানান বিদ্যা জন্ম নিল। দিকে দিকে জাহাজ ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ল মানুষ অজানাকে আবিষ্কার করতে। ছবিতে গানে কাব্যে শতমুখে ব্যাপ্ত হল তার সৃজনী মন। ইটালীতে প্রথম সুরু হল এর জয়যাত্রা। সেখান থেকে স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে ব্যাপ্ত হল। পুরো দুটো শতাব্দী চলল এর জোয়ার।

এই যে ইউরোপীয় রেনেসাঁস, এতে হয়েছিল ওঁদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যেরই পুনর্জাগরণ। আদি পেগান সংস্কৃতিকে দমিত করে তার ওপর চেপে বসেছিল খ্রীষ্টীয় নীতিবাদ, যার মূলে ছিল জন্মান্তরীণ এক পাপবোধ এবং এই বোধ কোনদিন অধিষ্ঠিত হতে দেয়নি মানুষকে ব্যক্তিক স্বাধীন ইচ্ছায়। রেনেসাঁস কেটে দিল তার এই বন্ধন। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কি হল? ছশো বছরব্যাপী মুসলিম শাসনে হিন্দুরা হয়েছিলেন রক্ষণশীল, বাস্তববিমুখ এবং ধর্মনিষ্ঠতার নামে কুতার্কিক। আর মুসলমানরা শিক্ষা সংস্কৃতিতে বঞ্চিত কৃষি ও কারুজীবী, অথবা চাকরানভোগী পেশাদার সিপাহী। দুই সম্প্রদায়ে ঐক্য ত হয়ই নি, কোন সম্প্রদায় নিজস্বভাবেও বড় হন নি।

১২শ থেকে ১৮শ শতক পর্যন্ত এইটাই চলেছে। তারপর এলেন ইংরেজরা এবং তাঁরা এদেশে নূতন শিক্ষা-দীক্ষা প্রবর্তন করলেন দেশের মানুষকে বড় করবেন বলে নয়, নিজেদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্যের কারবারে তাঁদের কর্মী বানাবেন বলে। কিন্তু রামমোহন রায় প্রমুখ ১৯শ শতকের নেতারা বুঝেও জিনিষটাকে স্বাগত করলেন তা থেকে দেশে নূতন স্পন্দন আসবে ভেবে। তা এল না। কিন্তু যে মানসিকতা জাগল তার ফলে মানুষের, তা আমাদের ঐতিহ্যপুত নয়। সতীদাহ নিবারণ, বহু বিবাহ বিলোপ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, জাতিভেদ অপসারণ, নারীর শিক্ষা ও স্বাধিকার অর্জন, যা-কিছু কালের চাহিদা রূপে প্রচারিত হল, তার একটাও আমাদের ইতিহাস ও জাতীয় প্রবণতাসম্মত ছিল না।

অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা সংস্কৃতি লাভ করলাম আমরা। তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁস থেকে এ আলাদা। এর অনেকটাই খ্রীষ্টীয় মানবতাবোধের প্রতিফলিত দ্যুতি। তবু এই জাগৃতি মধ্যযুগ থেকে আমাদের মনকে একালের আলোয় টেনে আনল তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রত্যাশিত প্রগতি কেন হল না দেশের? হল না রক্ষণশীলতার শিবির সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হল বলেই। নূতন রাজনীতিক ও সামাজিক চেতনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে দেখা দিল নূতন ধর্মচেতনাও এবং তাই গ্রাস করে নিল প্রগতি-চেষ্টার অনেকটা। ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণসমাজ, আর্যসমাজ, নব্য বৈষ্ণবসমাজ, নানা ছোট বড় সম্প্রদায় উঠে প্রতিরোধ বাহিনীর কবজি দৃঢ় করলেন।

এদের কারও কারও কার্যসূচীতে প্রগতির লক্ষ্য স্থান পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সমস্ত চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রে ধর্ম ও ঈশ্বরকে স্থাপন করেই এঁরা প্রতিক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ একটি ধর্মনিরপেক্ষতার জমি তৈরি করতে পারেন নি। ইউরোপের রেনেসাঁসকে যেভাবে জার্মানীর রিফরমেশন বা সংস্কার-আন্দোলন কাবু করেছিল, এও অনেকটা সেই রকম। এর ফলে কোন সংস্কারই পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভ করল না। জাতীয় আন্দোলন পর্যন্ত ব্যর্থ হল এর ধাক্কায়। বন্দেমাতরম,

-রাখীবন্ধন, ভবানী মন্দির ও বীরাষ্টমীর বাড়াবাড়িই উস্কে দিল মুসলিম স্বাধিকারের মনস্তত্ত্বকে। তাঁরা একজাতি রূপে একযাত্রায় বেশীর ভাগই আর হাত মেলালেন না হিন্দু মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সঙ্গে।

২০শ শতকের চার দশক পার করে এক ভারতবর্ষ দুই দেশ হয়ে গেল, প্রগতিকে চিন্তায় ও কর্মে আমরা সার্থক হতে দিই নি বলে। কাজেই জিনিষটাকে খুব বেশী দামে কেন জানি না আমার চিহ্নিত করতে আটকায়। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, জাগৃতিটা এসেছিল শুধু শিক্ষিত শহুরেদের মধ্যে। গ্রামের সাধারণ মানুষেরা ওর স্পর্শ অল্পই পেয়েছেন। অল্পই পেয়েছেন শহরের স্বল্পশিক্ষিতেরাও। তাই ২০শ শতকের শেষার্ধে আজও তাঁরা জাতিভেদ আঁকড়ে আছেন। আজও বিধবা-বিবাহ অচল। অশিক্ষা কুশিক্ষায আজও মানুষ আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ঝাড়ফুঁক তুকতাক ও মাদুলির প্রতিপত্তি আজও তাঁদের মধ্যে অসীম। পীর ফকির গুরু মোহান্ত আজও চেপে আছেন তাঁদের ওপর। আসলে তাঁরা রয়েছেন প্রায় মধ্যযুগেই।

এই মানুষদের জাগাতে হলে চাই নূতন আন্দোলন এবং তার পিছনে চাই নূতন একটি জীবনদর্শন। কিন্তু সমাজের সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তি চক্রান্ত করছে তার আবিভাবকে ঠেকানর জন্যে এবং লক্ষণীয় যে তাতে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন ধর্ম পুনরুজ্জীবনের ভাঁড়ারীরাই। সুতরাং উপায?

৮ম শতাব্দীতে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে, আর কোন সার্বভৌম প্রতিপত্তিসম্পন্ন হিন্দু শাসকই ভারতের রাজনীতিক মঞ্চে দেখা দেন নি। রাজশক্তির পোষকতা হারিয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধেরা অনিবার্যভাবেই বিচ্ছিন্ন ও হীনমন্যতাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই সুযোগে দক্ষিণ থেকে কুমারিল ভট্ট এবং শংকরের নেতৃত্বে অভ্যুদয় হয় সংঘাতশীল হিন্দু গোঁড়ামির। বৌদ্ধধর্মের ছত্রচ্ছায়ায় একদিন যাঁরা সাম্যের স্বাদ পেয়েছিলেন, সেই নিচু সোপানের হিন্দুরা কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ মুষ্টিমেয় ধনপতি, রণপতি ও সমাজ-পতির দাপটে আবার অস্পৃশ্য শূদ্রদাসে পরিণত হয়ে সমস্ত সামাজিক ও রাজনীতিক অধিকার হারান। ১২শ শতকে যখন ইসলামের আবির্ভাব হল তখন এই অসন্তুষ্ট হিন্দু জনতাই ধর্মান্তর গ্রহণ করে আত্মত্রাণের রাস্তা খোঁজেন। ত্রাণ তাতেও মেলেনি, কিন্তু এই হল ইতিহাস। তারপর ১৮শ শতকে এল ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ পর্তুগীজ এবং ভারতের ভৌমিক ও ব্যবসায়িক একাধিকার অর্জনের নামে তারা মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত টিঁকে গেল ইংরেজ এবং ষাট বছরের মধ্যেই গোটা ভারতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে বসল। ভারতবর্ষের এই বিপুল জনসংখ্যাকে ধর্মান্তরিত করার পরিকল্পনা ইংরেজের ছিল না, সে এখানে তৈরি করল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের পরিবেশ। বাষ্প ও বিদ্যুৎ এল এবং তা গতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে দেশের পুরাতন সামাজিক এবং আর্থনীতিক কাঠামোর

ছাঁচ পাল্টে দিল। কৃষি ও কুটিরশিল্প-নির্ভর সাবেকি জীবনযাত্রা ছিল মন্থর। তাতে এল দ্রুততা। কিন্তু এই পরিবর্তন হল শুধু নগর, বন্দর, বাণিজ্যকেন্দ্র ও শিল্প শহর-গুলিতে। তার আড়ালে সারা ভারতবর্ষ পড়ে রইল সেই মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা আঁকড়েই। ইংরেজ তার প্রশাসন ও ব্যবসা চালানোর প্রয়োজনে আধুনিক ধারার স্কুল কলেজ করল, দেশের মানুষকে নিজের লক্ষ্য অনুযায়ী গড়ে-পিটে নেবার জন্যে। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও বন্দী হয়ে রইল শহরের গণ্ডিতেই। অর্থাৎ গ্রাম ও শহরের, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল দুস্তর ব্যবধান। একই দেশের ও সমাজের মানুষ হয়েও যেন দুটি জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেলেন দেশবাসী। বৃহত্তম গোষ্ঠী যে-কৃষক কারিগর ব্যাপারী ও দেহশ্রমী মানুষরা, তাঁদের দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে বেড়ে উঠলেন শিক্ষিত নব্যসমাজ এবং এঁরাই গড়লেন আধুনিক সংস্কৃতি।

কাজ তাঁরা অনেক করেছেন। সাহিত্য শিল্প ও কলাকৃষ্টির রাজ্যে প্রভূত গণনীয় ঐশ্বর্য দিয়েছেন। সামাজিক অন্যায় অনাচার ও কুসংস্কার বিদূরণে সার্থক অগ্রনায়কতা করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও মানুষের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় করার কাজে সমুজ্জ্বল সংস্কৃতি-দৌত্য করেছেন। জগৎ, জীবন ও প্রকৃতির উপলব্ধিতে এনেছেন প্রভূত নতুন মূল্যবোধ। এসবের মিলিত প্রভাবে সুপ্রাচীন কাল থেকে যে সব প্রত্যয় রীতি ও অভ্যাসের জড়তা জগদ্দল পাথরের মত চেপে ছিল মানুষের ঘাড়ে, তা ঝেড়ে ফেলে যুগ ও জীবনের পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে অগ্রসর হবার প্রেরণা পেয়েছেন মানুষ। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় চলেছে এই বহুমুখী নেতৃত্বের প্রবাহ। আজকের ভারতবর্ষে যা হয়েছে বা যতটুকু হয়েছে তা এঁদেরই সম্মিলিত দান। সেদিক থেকে চিন্তা করেই ১৯শ শতকের জাগৃতিকে বলা হয় রেনেসাঁস বা নবজন্ম, তাতে আর সন্দেহ নেই। পুরাতনের জীর্ণ কলেবর দূরে ফেলে নতুন মন ও চোখ নিয়ে জেগে উঠেছে দেশ, পেয়েছে সামনে এগিয়ে যাবার প্রেরণা, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে শিল্পে বাণিজ্যে যুগপ্রগতির সঙ্গে পা ফেলে ফেলে চলার উদ্দীপনা। কিন্তু আবার আসছে সেই আগের প্রশ্ন। সমগ্র দেশ, জাতি ও মানুষ কি সমমাত্রায় পেয়েছে এ প্রভাব? সার্বিক জাগৃতি কি হয়েছে দেশের? না, এখনো সেই তেলের বাতি, গোরুর গাড়ি, হাল, পালের-নৌকো, লাঙল, তাঁত ও ঘানি আশ্রয় করে গ্রাম ভারত ধুঁকছে মধ্যযুগীয় অনগ্রসতার অন্ধকারে। এত বড় ও বিচিত্র যে একালের সাহিত্য তার ওয়ারিশান হতে পারেন নি তাঁরা, তার কারণ অক্ষরজ্ঞানেরই ব্যাপ্তি হয় নি সমষ্টি-মানুষের মধ্যে। এত সাংস্কৃতিক সামাজিক ও রাজনীতিক অগ্রবর্তী চিন্তা বলতে গেলে স্পর্শই করে নি তাঁদের। তাঁরা যাবতীয় প্রগতিহীন বকেয়া রুচি, চিন্তা ও ধারণার দাসত্বেই আবদ্ধ রয়েছেন। কাজেই এই সীমাবদ্ধ জাগৃতিকে কি প্রকৃত রেনেসাঁস বা নবজন্ম বলা যায়? সমষ্টি-মানুষ যেখানে

সেকালের বন্দীশালা থেকে একালের মুক্ত আলো-হাওয়ায় এসে পৌঁছাতেই পারলেন না, সেখানে দুধের ওপর সরের মত ভেসে থাকা অল্পসংখ্যক সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের উন্নতিকে কি খুব উচ্চমূল্যে চিহ্নিত করা যায়? তাছাড়া মধ্যযুগীয় ইউরোপের যে অধ্যায়কে আমরা রেনেসাঁস বলে জানি, তার সঙ্গে এর প্রাণগত পার্থক্যটিও ভুল করলে চলবে না। ইউরোপের মানুষ তার হারিয়ে ফেলা পুরুষানুক্রমিক গ্রীকোরোমক সংস্কৃতির প্রাণদায়ী প্রভাবকে নতুন করে আবিষ্কার করে, এর ফলে একদিকে পাদরি ও সামন্ত প্রভুদের দাপট কাটিয়ে নতুন জীবনদর্শনে অধিষ্ঠিত হয়, অন্যদিকে তার প্রতিভা বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলাকৃষ্টি ও দিগ্বিজয়ের নেশায় দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। তাঁদের ক্ষেত্রে তাই ওটা যথার্থই নবজন্ম। কিন্তু আমরা পেয়েছি সম্পূর্ণ বিদেশী একটা শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রেরণা এবং তা আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদই ঘটিয়েছে। তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আমরা শিক্ষিত শহুরেরা একটা নতুন জাতিতে পরিণত হয়েছি, যার সঙ্গে দেশের বৃহত্তম জনশক্তির আত্মিক যোগ প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই এ জাগরণ যে সামগ্রিকও নয়, ষোল আনা সার্থকও নয়, তা স্বীকার করতেই হবে। তবে আমাদের স্বকীয় উদ্যমেই হোক, আর আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ঘাতে-প্রতিঘাতেই হোক, দেশ বিদেশী-শাসন মুক্ত হয়েছে। সুতরাং কোনদিন নতুন আর্থনীতিক পরিকল্পনায় দেশকে পুনর্গঠিত করার এবং সমষ্টি-মানুষকে কালের হাওয়ায় জাগিয়ে তোলার অবকাশ হবেই। অন্তত সে আশা পোষণ করাই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক।

কি পথে ও কোন আদর্শে এই রূপান্তর সাধন সম্ভব, তা বলে দেওয়া হল অগ্রগামী দেশনায়কের কাজ, লেখকের নয়। শুধু এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে শিক্ষা, চিকিৎসা, জীবিকা ও অন্নবস্ত্রের সাবিক অধিকার মানুষের মধ্যে ব্যাপ্ত করে স্বল্পসংখ্যক অস্তিবান ও লক্ষ লক্ষ নাস্তিবানে বিভক্ত এই শোষণভিত্তিক সমাজ-বিন্যাসের ছক সম্পূর্ণ পাল্টাতে হবে। আনতে হবে সাম্যাশ্রিত নতুন জীবনের অনুপ্রেরণা। শান্তি সদ্বুদ্ধির মন নিয়েই অবশ্য করতে হবে সর্বাত্মক প্রয়াস। নিষ্ফল হলে ত আছেই ভিন্নতর পথ, যার ব্যাকরণ রাজনীতিবিদরা বলতে পারেন। প্রয়োজনে সে পথও খুঁজতে হবে বৈকি